# প্রতিদিনের কথা

অশোক মিত্র

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলি-৬

প্রকাশ : নববর্ষ ১৩৬৯

প্রকাশক

সুনীলকুমার ঘোষ এম. এ.

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫/১বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী

প্রবীর সেন

মুদ্রক

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

ক্যালকাটা সিটি প্রেস

৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৬

গ্রামে-গঞ্জে শহরে-শহরতলিতে যে-বন্ধুরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে এই লেখাগুলি পড়েছেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন, কখনো হয়তো বা চিঠি দিয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন রেখেছেন আমার কাছে, পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের জন্য

## লেখকের নিবেদন

বিগত বছর দেড়েক ধ'রে 'গণশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা থেকে বাছাই ক'রে 'প্রতিদিনের কথা' সংকলিত হলো। রাজনীতির আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, এই লেখাগুলির মধ্যে বার-বার ঘুরে-ফিরে সেই রাজনীতির প্রসঙ্গ তাই এসেছে। বাচন-ভঙ্গির তীক্ষ্ণতা হয়তো কারো-কারো অস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্রেক করবে, কিন্তু, আমার বিবেচনায়, দেশের যে-হাল, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বক্তব্যপ্রকাশের ঋতু শেষ হয়ে এসেছে, যা বলার, তা স্পষ্ট ক'রে বলাই ভালো ; কোনো-কোনো মুহূর্তে রূঢ়তারও তো সামাজিক উপযোগিতা আছে।

গল্পকার-ঔপন্যাসিক অমলেন্দু চক্রবর্তী বহুমুখী প্রতিভাধর, তিনি 'প্রতিদিনের কথা'র প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৬২

অশোক মিত্র

| | |
|---|---|
| এ কোথায় দেশকে টেনে নামানো হয়েছে | ৯ |
| কমরেড বাচ্চা মুন্সীর ভূগোলের বই | ১৩ |
| দেশপ্রেমের ইতিকথা | ১৮ |
| কুঁদঘাট বা বাগুইহাটির সেই বৃদ্ধা | ২৮ |
| পুড়ে মরা আর পুড়িয়ে মারা | ৩৩ |
| দুরাত্মার ছল | ৩৭ |
| অপব্যয় রুখতে হবে | ৪২ |
| ঘটিবাটি বন্ধ ক'রে দেবেন ? | ৪৭ |
| জ্বালানির মতো জ্বলুন ! | ৫২ |
| অনন্তকাল যা চলতে পারে না | ৫৭ |
| মানুষ কেন খঞ্জ হয় | ৬২ |
| জাতীয় সংহতির কী ও কেন | ৬৭ |
| ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস ? | ৭৩ |
| 'নিলামে তেল বেচো, দাম কমবে' | ৭৮ |
| সর্বভূতেষু | ৮৩ |
| ভারতভাগ্যবিধাতা | ৮৮ |
| ষড়যন্ত্রী মশাইদের লীলাখেলা | ৯৩ |
| ধর্মে আছে, জিরাফেও আছে | ৯৯ |
| মেরেছো কলসীর কানা, তা ব'লে কি | ১০৪ |
| কবরে-চাপা ইতিহাস | ১০৯ |
| আমরা মারা পড়ছি, কিন্তু কেন | ১১৪ |
| শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে | ১২০ |
| খাল কেটে কুমির | ১২৫ |
| সংকট, টোটকা, বৃন্দা করাতের হাতে লাঠির বাড়ি | ১৩১ |
| তাকে কী তাতে কী কাহিনী | ১৩৬ |
| আমার যৌবন-বাগানে হাওয়া লেগেছে ফুল-জাগানে | ১৪২ |
| মহাভারত একটু অশুদ্ধ হোক | ১৪৭ |
| আমাদের লড়াই, আমাদেরই লড়াই | ১৫২ |
| দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে | ১৫৭ |

# এ কোথায় দেশকে টেনে নামানো হয়েছে

ধরুন আপনাদের রাজ্যের এক মন্ত্রী কোনো চৌমাথায় পৌঁছে দেখতে পেলেন ওখানে দাঁড়ানো ট্র্যাফিক কনস্টেবল বেপরোয়া লরিট্রাকচালকদের কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছে। মন্ত্রী তাঁর গাড়িতে কনস্টেবলটিকে তুলে কাছাকাছি থানায় জমা ক'রে দিয়ে এলেন, এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালেন আইন-অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। পরদিন মান্যগণ্য খবরের কাগজে ফলাও ক'রে বেরোলো: কর্তব্যরত পুলিসকে কর্তব্যস্থান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অধিকার মন্ত্রীকে কে দিল? পুলিসপ্রবর কোন্ মহান কর্তব্যে রত ছিলেন, না ঘুষ নিচ্ছিলেন। কিন্তু তা হ'লে কী হবে, মন্ত্রীর নামে ঢিঢিক্কার পড়ে গেল।

এ-ধরনের মান্যগণ্য সংবাদপত্রে হঠাৎ কিস্তিতে-কিস্তিতে জীবনী বের হ'তে শুরু করলো। কাঁদের জীবনী? কলকাতা শহরের মান্যগণ্য মাস্তান-সমাজ-বিরোধীদের জীবনী। আমাদের ছেলেবেলায় স্কুলের পাঠক্রমে জীবনী পাঠ্য ছিল, আমরা পড়তাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনী, রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা, নয়তো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অথবা হাজী মহম্মদ মোহ্‌সিনের। কালের ধারা পাল্‌টায়, মহাজ্ঞানী-মহাজন-মহাপুরুষের সংজ্ঞাও, সুতরাং মান্যগণ্য সংবাদপত্রাদি দ্বারা যদি সমাজবিরোধীদের জীবনকথা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে-আবেগে ডুবিয়ে প্রকাশ করাই সমীচীন মনে করা হয়, নতমস্তকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমার-আপনার অন্য কী উপায় আছে? আমরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে তা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ব'লেও বিবেচিত হওয়ার আশঙ্কা। তবে ঐ যে কিংবদন্তী আছে, ধর্ম না অধর্মের কল, বাতাসে নড়ে, হঠাৎ গৌরীবাড়ি আন্দোলনের প্রকোপে মান্যগণ্য সংবাদপত্রাদির কর্তৃপক্ষ হয়তো দোনোমনা হয়ে গেলেন, মহামহিম মাস্তান বাহাদুরদের জীবনী বেরোনো আপাতত স্থগিত রইলো।

অথচ এ-সমস্ত সংবাদপত্রের কর্তাব্যক্তিদের সমাজ-সংস্কৃতির পুরোধা ব'লে মেনে নেওয়া হয়, তাঁদের বাদ দিয়ে পঁচিশে বৈশাখ-বাইশে শ্রাবণের কোনো অনুষ্ঠানের কথা ভাবা যায় না। রজনীগন্ধার ঝাড়ে উন্মোচিত চন্দনচর্চিত সন্ধ্যা, রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি, বেদ থেকে শ্লোকোচ্চারণ, সুবেশ-

সুচিক্কণ ভদ্রমহোদয়মহোদয়াদের অভিজাত ভিড়, সব-মিলিয়ে এক প্রায়-অপার্থিব পরিবেশ, তার মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছেন খবরের কাগজের প্রধান পুরোহিতরা, যাঁরা অসাধু রাজকর্মচারীকে হাতে-নাতে মন্ত্রী ধ'রে ফেললে তা গভীর অপছন্দ করেন, এবং সমাজবিরোধীদের কী ক'রে মহাপুরুষের সম্মান প্রদান করা যায়, সে-ভাবনায় যাঁদের প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়।

কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদকদের উপর অভিমান ক'রে কী লাভ? জনৈকা মহিলা, তিনি আপাতত সংসদ সদস্যা, কিছুদিন দাপিয়ে দাবি ক'রে বেড়ালেন, তিনি মহাবিদুষী, অমুক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তমুক বিষয়ের উপর গবেষণা ক'রে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। কিছুদিন বাদে আবিষ্কৃত হলো, যদিও মার্কিন দেশে অনেক মায়াবী জিনিশই ঘ'টে থাকে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটেনি। অমুক নামে মার্কিন দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই নেই, সুতরাং তমুক বিষয়ে উক্ত মহিলার গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার প্রসঙ্গ, তথা পি এইচ ডি প্রাপ্তিযোগ, অলীক-অবান্তর, পুরো ব্যাপারটিই বানানো, সংসদীয় ভাষায় হয়তো মায়া কিংবা মতিভ্রম, লোকায়ত ভাষায় বলা হবে নিছক প্রতারণা, আরো একটু স'রে এসে, দেশজ ভাষায়, জুয়াচুরি। ঐ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ই নেই, সুতরাং ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভদ্রমহিলার পি এইচ ডি পাওয়ার প্রশ্নই নেই, মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। সরল সাধারণ মানুষ, মার্কিন দেশ তাঁদের কাছে সুদূর স্বপ্নের মতো, সেই দেশের মহান্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই মহিলা মস্ত পড়াশুনো ক'রে মস্ত ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন, খবরকাগজে ছাপা হয়েছে সেই ডিগ্রির কথা, শ্রদ্ধায়-বিস্ময়ে-ভক্তিতে সাধারণ মানুষের মাথা নত হয়ে এসেছে; তাঁদের মধ্যে অনেকে সংসদ নির্বাচনে এই মহিলাকে গদগদ অনু-প্রেরণায় ভোট দিয়ে এসেছেন। তাঁদের এটা কল্পনার বাইরে যে লেখাপড়ার ব্যাপার নিয়েও এ-ধরনের পুকুরচুরি সম্ভব, বিশেষ ক'রে কোনো মহিলার পক্ষে।

কিন্তু সংবিধানে কিংবা দেশের অন্য আইনে তো কোথাও লেখা নেই যে অনৃতভাষিণী হ'লে সংসদের সদস্যা থাকা যাবে না। সুতরাং মহিলাটি সংসদে আছেন, প্রতারণা ধরা প'ড়ে যাওয়ার ফলে যে তেমন লজ্জিত-ফজ্জিত তা-ও, আচরণ-বিচরণ দেখে অন্তত, মনে হয় না। বরঞ্চ বলা চলে, তিনি সগৌরবে বিরাজ করছেন। এবং, প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশে, উপস্থিত তিনি বিশ্বভারতী কর্মসমিতির সদস্যা। প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং বিশ্বভারতীর আচার্য। আচার্য হবার মতো তাঁর কী-কী আর্য গুণ আছে, সে-প্রসঙ্গ আপাতত উহ্য থাক, তবে মহিলাটির গুণাবলী আমাদের কাছে অপ্রকাশ্য নয়।

এ হেন আচার্য-প্রধান মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতি-আপ্লুত শান্তিনিকেতনে এলেন বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উপলক্ষে, স্বভাবতই উক্ত মহিলাও উপস্থিত। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পর আচার্য-প্রধান মন্ত্রী কতিপয় ছাত্রীর সঙ্গে মধ্যাহ্ন আহারে সম্মত হলেন। তাঁর দু'পাশে দু'জন ছাত্রী, আচার্য-প্রধান মন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে আহারের ফাঁকে-ফাঁকে একটু-আধটু সৌজন্যসম্মত বিশ্রম্ভালাপ করছেন, তাঁর মুখোমুখি আসনে আমাদের ছদ্মডিগ্রিধারিণী মহিলাটিও আহাররতা। আচার্য-প্রধান মন্ত্রী তাঁর সহোপবিষ্টা ছাত্রী দু'টিকে, আহারান্তে, স্নেহাভিনন্দন জানালেন, এবং গাত্রোত্থান করার মুহূর্তে মহিলাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'জীবনে উন্নতি করতে হ'লে আদর্শ বেছে নিতে হয়, আমার শুভেচ্ছা-আশীর্বাদ রইলো, তোমরা যেন ওঁর মতো হ'তে পারো'।

অতিরঞ্জন নয়, গণ্যমান্য খবরকাগজে এই উপাখ্যান প্রকাশিত হয়েছে, ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী, যিনি সেই সুবাদে বিশ্বভারতীর আচার্য, রবীন্দ্রনাথের মানস-তপোবন বিশ্বভারতীর আচার্য, তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করছেন যেন তাঁরা ঐ ভুয়ো-ডিগ্রি-জাহির-করতে-গিয়ে-ধরা-পড়া মহিলাকে জীবনের আদর্শ হিশেবে বরণ ক'রে নেন।

না, সম্ভবত ধরণী-দ্বিধা-হও বলার দিনও অপগত। গুরুবাদী দেশ আমাদের, শিশুকাল থেকে আমাদের শেখানো হয় দেশনায়কদের বন্দনা করতে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। অথচ দেশের যাঁরা হাল ধ'রে আছেন, তাঁরা নিজেরাই নৈতিকতার বাইরে চ'লে গেছেন। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে আর আড়াআড়ি নেই, সাধুতা এবং প্রতারণার ওজন সমান হয়ে গেছে, এখন গলা ফুলিয়ে বলা হচ্ছে চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা যদিও পড়ে ধরা। সুতরাং ছাপোষা সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ ক'রে লাভ নেই, তাঁরাও কালের পুতুল, দেশকে-জাতিকে শীর্ষপুরুষরা যে-নৈতিকতায় টেনে নামিয়েছেন, সম্পাদকরাও সেই নীতিব্যাকরণ প্রাণের দায়ে রপ্ত করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই মুহূর্তে দেশের রাজধানী নতুন দিল্লিতে মহা শোরগোল, গেল, গেল। সব গেল, দেশের-জাতির মহা সর্বনাশ, ঘোর ষড়যন্ত্র, আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে সিংহাসনচ্যুত করার কুটিল অভিসন্ধি। এত শোরগোলের কী কারণ? দেখুন না কেন, কত বড়ো অন্যায়, কিছু লোক কালাতিপাত ক'রে কিছু কালো টাকা রোজগার করেছে, ফন্দিফিকির খাটিয়ে সরকারকে কর ফাঁকি দিয়েছে, সেই টাকা তারপর বিদেশে পাচার করার পবিত্র উদ্দেশ্যে কিছু আঁটঘাঁটের ব্যবস্থা শুরু

করেছে মাত্র, এই সময় একটা উটকো বোকাসোকা মন্ত্রী এ-সমস্ত অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে অনুসন্ধানের মতলব ভাঁজতে গিয়েছিল, দেশকে টুকরো-টুকরো করার এর চেয়ে বড়ো চক্রান্ত আর কী হ'তে পারে। আরো দেখুন না কেন, আমরা যারা দেশের দায়িত্বে আছি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সরকার চালাচ্ছি, আমরা এবং আমাদের প্রিয়জনেরা সরকারের কেনা-কাটা থেকে, সেই কেনা-কাটা দেশেই হোক আর বিদেশেই হোক, একটা দস্তুরি পেয়ে থাকি। ঐ অতি-অপদার্থ মন্ত্রী বলছে কিনা এই দস্তুরির ব্যাপারও অনুসন্ধান ক'রে দেখতে হবে, তাহ'লে আর অন্য-কী বড়ো প্রমাণ চাই যে মহাষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, জাতি বিপন্ন। এই সংকটমুহূর্তে তস্করসাধুদস্যুবীরসৎঅসৎসরলখলমহাপুরুষলম্পট, ভেদাভেদহীন, প্রতিটি দেশবাসীর কর্তব্য প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করা, এই কর্তব্যে অন্যথা ঘটলে নিরাপদে চৌর্যবৃত্তি সম্পন্ন করা অসম্ভব হবে, উৎকোচদাতা ও উৎকোচগ্রহীতা উভয়েরই সর্বনাশ ঘটবে, প্রতারকবৃন্দ মাথা উঁচু করে সমাজে ঘুরে বেড়াতে অপারগ হবে। সত্যভাষণ-মিথ্যাচরণের যে-বৈষম্য আস্তে-ধীরে ঘুচিয়ে দেওয়া হচ্ছিল অতীব সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায়, সেই বৈষম্যের পুনরুত্থানের আশঙ্কা দেখা দেবে। তাড়াও, তাড়াও ঐ কুচুটে মন্ত্রীকে অচিরে তাড়াও।

যাঁরা এখনো মাঝে-মাঝে মহাত্মা গান্ধির নাম ভজনা করেন, 'সত্যমেব জয়তে'-র উপনিষদধৌত নিগূঢ় দর্শন নিয়ে বড়াই করেন, এ কোথায় দেশকে টেনে নামিয়েছেন তাঁরা? দেশ সত্যিই বিপন্ন, এটা নির্ভুল সত্য দেশের অনেক অনিষ্টকামী আশেপাশে ঘুর-ঘুর করছে। দেশের ভিতরে ও বাইরে, তারা সুযোগ খুঁজছে, কী ক'রে ভারতবর্ষকে শতচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া যায়। তাদের সব চেয়ে বড়ো সহায় দেশের শাসককুল। এই শাসককুল সমস্ত নৈতিক মানদণ্ড বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা লোভাতুর-কামাতুর, গোটা দেশের সরল সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁর জাতির সম্পদ নিয়ে, জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।

যে ক'রেই হোক, নীতিহীনতা থেকে আমাদের নীতির বৃত্তে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে হ'লে নিঃসন্দেহে এটাই প্রথম-প্রধান কর্তব্য, পবিত্রতম কর্তব্য। নীতি বাদ দিয়ে তো জাতি বাঁচতে পারে না।

## কমরেড বাচ্চা মুন্সীর ভূগোলের বই

ছোটোখাটো মানুষটি ছিলেন কমরেড মহম্মদ বাচ্চা মুন্সী। ভুগছিলেন অনেক দিন থেকে, গত মাসে প্রয়াত হয়েছেন।

কয়েক বছর অগেকার কথা। কমরেড বাচ্চা মুন্সী অসুস্থ, হাসপাতালে আছেন, এক বিকেলে দেখা করতে গেছেন কেউ। গিয়ে দেখেন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বই পড়ছেন বাচ্চা মুন্সী। ষষ্ঠ শ্রেণীর কিশোর-কিশোরীদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ভূগোলের বই, পৃথিবীর নানা দেশের কথা আছে যে-বইতে, সে-সব দেশের জলবায়ুর কথা, নদীশহরবন্দরের কথা, কৃষিকাজের কথা, খনিজশিল্পবাণিজ্যের কথা। যিনি দেখা করতে গেছেন, কমরেড বাচ্চা মুন্সী সাগ্রহে তাঁকে ভূগোল বইয়ের পাতা উল্টে দেখাচ্ছেন। গাঁয়ের গরিব ঘরে জন্ম, ছেলেবেলায় লেখাপড়ার সুযোগ পাননি, দারিদ্র্যে-কৃচ্ছ্রে-সংগ্রামে সারা জীবন কেটেছে, এখন প্রবীণ বয়সে বইপত্র জোগাড় ক'রে, পার্টির আর আন্দোলনের কাজের ফাঁকে-ফাঁকে, পড়াশুনো করার চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন প্রতিদিন পৃথিবী সম্পর্কে নতুন-কিছু জানবার। আমাদের প্রত্যেককে তো নিজেদের আরো উন্নত করতে হবে, আরো শিক্ষিত; যত বেশি আরো আরো জানতে-বুঝতে পারবো পৃথিবীতে কোথায় কী আছে, কোথায় কী ঘটছে, তত বেশি নিজেদের অবস্থান নিয়ে ধ্যানধারণা আমাদের স্পষ্টতর হবে, তত বেশি আমরা আন্দোলনকে আরো সুন্দর ক'রে গঠন করতে পারবো, আমাদের সংগঠনের শক্তি তত বেশি জোরালো হবে: হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে-থাকা কমরেড বাচ্চা মুন্সীর ভূগোল বইটি নিয়ে আনন্দ তথা গর্ববোধ উপচে পড়ছিল। যিনি দেখতে গিয়েছিলেন তাঁকে, তাঁরও এক নতুন অভিজ্ঞান হলো সেই সন্ধ্যাবেলা। কমরেড বাচ্চা মুন্সী দীর্ঘদিন ধ'রে আন্দোলনের শরিক, তাঁর অঞ্চলে নেতৃপর্যায়ের কর্মী, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে শিক্ষিত করেছেন, প্রথাগত লেখাপড়ার সুযোগ পাননি, কিন্তু মানুষের জ্ঞানপিপাসা তো বয়ঃসীমার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে কোথায় কী ঘটছে তা যে-কোনো বয়সের যে-কোনো অবস্থার মানুষের জানবার অধিকার আছে, সংগ্রামশীল জনসাধারণের আন্দোলনের স্বার্থেই এই

জ্ঞান-আহরণের প্রয়োজন। চুপচাপ বিনীত-নম্র মানুষ ছিলেন কমরেড বাচ্চা মুন্সী। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে ভালোবাসতেন, গর্ব-করার বাইরে ছিলেন বরাবর, অথচ সেই সন্ধ্যাবেলা তাঁর শীর্ণ-অসুস্থ মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সরল অহংকারের হাসি, ইশকুলের ছেলেমেয়েদের ভূগোল বই কুড়িয়ে তিনি পৃথিবীর কথা জানছেন।

কমরেড বাচ্চা মুন্সী বৃদ্ধ বয়সে নিজের জন্য সুযোগ সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন, আমাদের গোটা দেশে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কোটি-কোটি মানুষ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও বঞ্চিত। ইতিহাস-ভূগোল প'ড়ে পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের কথা ছেড়েই দিলাম, শাদামাটা পাটিগণিত, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, তা-ও ছেড়ে দিলাম, নিজের ভাষায় সাধারণ অক্ষরজ্ঞান, যাকে আমরা বলি সাক্ষরতা, কষ্টেসৃষ্টে নিজের নামটি সই করবার মতো বিদ্যা, তা থেকে পর্যন্ত প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দেশবাসী আজ পর্যন্ত বঞ্চিত। সরকার বা বিরোধী পক্ষের কোন্ সিদ্ধান্ত বা আচার-আচরণ সংবিধানসম্মত অথবা সংবিধান-পরিপন্থী তা নিয়ে মস্ত তর্ক জুড়ে দিই প্রায়-ই আমরা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোর সংবিধান-বিরোধী আচরণ নিয়ে তেমন-কোনো প্রতিবাদ অথবা ধিক্কারের ঝড় উঠতে দেখা যায় না। অথচ সংবিধানের ৪৫ সংখ্যক ধারা পড়ুন: সংবিধান প্রবর্তিত হবার দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি শিশুকে তার চতুর্দশ বছর অতিক্রম করা না-পর্যন্ত বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব রাষ্ট্র কর্তৃক বহন করতে হবে। ১৯৫০ সালে সংবিধান চালু হয়েছে, অতএব ১৯৬০ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি শিশুর জন্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব ছিল সরকারের। সেই দায়িত্ব পালনের দিকে ফিরেও তাকানো হয়নি, সংবিধানের ধারা সংবিধানের পাতাতেই আবদ্ধ থেকেছে। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা লেখা-পড়ার সুযোগ পায়নি স্বাধীনতার পর চল্লিশ বছর ধ'রে স্বাধীন ভারতবর্ষে, কারণ সরকার কর্তৃক সেই সুযোগ সৃষ্টি ক'রে দেওয়ার জন্য আদৌ নিষ্ঠাবান কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ধনী-উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্তরা শিক্ষার সুযোগ পেয়ে এসেছে, সামর্থ্য তাদের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, দাঁড়াবেও না। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থা ছাড়া গ্রামের-শহরের গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া অসম্ভব। সংবিধানের নির্দেশ আছে, রাষ্ট্রকর্তৃক সেই ব্যবস্থার বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়ার। সেই নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে। যদিও বা একটি-দু'টি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কোমর বেঁধে সে-সব রাজ্যের নিন্দায় নেমেছেন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

একটু জলপানের ব্যবস্থা অথবা এক বেলা আহারের ব্যবস্থা করতে পারলে দরিদ্র-পরিবারভুক্ত ছেলেমেয়েদের আগলে রাখার একটু সুবিধা হয়, তেমনি সুবিধা হয় যদি বছরে একবার অন্তত তাদের একটা ক'রে জামা বা শাড়ি ধ'রে দেওয়া যায়, যদি বিনামূল্যে তাদের মধ্যে বই-স্লেট-খাতা বিতরণ করা যায়। কিন্তু যখনই কোনো রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এ-ধরনের অতি-সাধারণ, অতি-স্বাভাবিক, অতি-প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, দিল্লির সরকার সব গেল-সব গেল ব'লে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছেন : অপব্যয়, অপব্যয়, রাজ্য সরকারগুলি নাকি গরিব দেশের গরিব মানুষজনের কষ্টার্জিত টাকা, যা সরকারকে ট্যাক্সো হিশেবে দেওয়া হয়েছে, লেখাপড়া শেখানোর অজুহাতে অপচয় করছেন। বিদেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ ক'রে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেনার নামে হাজার-হাজার কোটি টাকা সরকারি খাতে খরচ করা অপব্যয় নয়, কিন্তু গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগ্রহ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যদি দু'দশ কোটি টাকা খরচ করা হয়, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় তা হ'লে, নিন্দা করার ভাষা পর্যন্ত খুঁজে পান না নতুন দিল্লির মহামান্য কেন্দ্রীয় সরকার।

স্থূলে ভুল নেই, কমরেড বাচ্চা মুন্সী যে-কারণে মস্ত উৎসাহ নিয়ে পরিণত বয়সে নিজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে আগ্রহবান ছিলেন, ঐ একই কারণে দিল্লির শ্রেণীস্বার্থান্ধ সরকার গরিবদের লেখাপড়া শেখানো ঘোর অপছন্দ করেন। অক্ষর-পরিচয় হ'লে, একটু-আধটু পাটিগণিত শিখলে, পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোল নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করলে, শহরের-গ্রামের বিত্তহীন ঘরের ছেলেমেয়েদের আস্তে-আস্তে বোধোদয় ঘটবে, কী সামাজিক-আর্থিক সংস্থানের মধ্যে তারা আছে সে-বিষয়ে তাদের চেতনা জাগতে শুরু করবে, যে-কুসংস্কারভয়ভীতিভ্রান্তির গহ্বরে তারা মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে, তা পেরিয়ে যে চ'লে আসা সম্ভব, সে-সম্পর্কে, আপাতত অর্ধস্ফুট হ'লেও, কিছু-কিছু ধ্যানধারণা তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে। বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে কোটি-কোটি গরিব মানুষ এখনো প্রস্তর বা লৌহযুগে বিরাজ করছে, শাসকশ্রেণীর মস্ত সুবিধা এই অবস্থায়, লক্ষ-কোটি এই গরিব মানুষগুলিকে নিষ্পেষণ ক'রে বছরের-পর-বছর ধ'রে নিজেদের আখের গুছিয়ে যাওয়া যাচ্ছে, যাদের শোষণ করা হচ্ছে তাদের প্রতিবাদের ভাষা নেই, এমনকি তারা যে শোষিত-বঞ্চিত সেই অনুভূতির বোধ পর্যন্ত হয়তো নেই, এমনি ক'রেই যায় যদি দিন যাক না। শিক্ষার সুযোগহীন এই হতভাগ্য দরিদ্রকুলকে ভয়ের মধ্যে রাখা যাচ্ছে সব সময়, সংবিধান বলে ধনী-

দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকের একটি ক'রে ভোট, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তাই এই ভয়গ্রস্ত মানুষগুলিকে ভেড়ার পালের মতো ভোটের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় কোন্ চিহ্নের উপর সীলমোহর মারতে হবে, গৃহপালিত পশুর মতো নিঃশব্দ আনুগত্যে গরিব মানুষগুলি নির্দেশ পালন করে, শাসকদলের মৌরসি পাট্টা আরো পাঁচ বছরের জন্য কায়েম হয়।

'লিখিবে-পড়িবে-মরিবে দুখে মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে', এই ব্যঙ্গাত্ম প্রবচনের একটি নতুন ব্যাখ্যায় অতএব পৌঁছুনো গেছে স্বাধীন ভারতবর্ষে: গরিব-গুরবোদের লেখাপড়া শিখিয়েছো তো মারা পড়বে, নির্ঝঞ্ঝাট ভালো খাওয়া-দাওয়া যদি চালিয়ে যেতে চাও, গরিবদের নিরক্ষর ক'রে রেখে দাও, শাসককুলের কোনো ঝামেলা থাকবে না তা হ'লে। সংবিধানে গরিবদেরও প্রত্যেককে একটা ক'রে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে; সংবিধানের সেই ধারাটি মানা হচ্ছে, কারণ আর্যাবর্তের একটি বড়ো অঞ্চল জুড়ে গরিবদের ভোটগুলি কোন্ বাক্সে পড়বে সেটা বড়োলোকেরাই নির্ধারণ ক'রে দিতে পারছেন। কিন্তু সংবিধানের ঐ অন্য ধারাটি মান্য ক'রে যদি সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হতো, এমনকি হতচ্ছাড়া গরিবদের জন্যও, তা হ'লে হয়তো পাখা গজাতো তাদের, তাদের চোখ-কান খুলতো, বড়োলোকদের নির্দেশ মেনে ভোটের বাক্সে ছাপ মারতে আর হয়তো তারা রাজি হতো না। সেই সর্বনাশের আশঙ্কা চিন্তা ক'রেই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে বাধা দিয়ে এসেছেন। শাসকশ্রেণীর পক্ষে সত্যিই বাঁচা-মরার লড়াই এটা; যদি শিক্ষা বিস্তারের সূত্রে গরিবদের সাহস বাড়ে, প্রতিবাদের ভাষা শেখে তারা, সংঘবদ্ধ হ'তে শেখে তারা, তা হ'লে, কে জানে, বিহারের গ্রামে এখন থেকে আর খেতমজুরদের পুড়িয়ে মারা সম্ভব হবে না, উত্তর প্রদেশে রামজন্মভূমিউদ্ধারের অন্ধ উন্মাদনায় সরল-নিরেট দেহাতী লোকজনগুলিকে সাম্প্রদায়িকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না, রাজস্থানে সতীদাহরূপ বালিকাবধূ হত্যা অব্যাহত রাখা মুশকিল হবে, একটি বিশেষ দল বা বিশেষ পরিবারের বিহনে ভারতবর্ষ চোখে অন্ধকার দেখবে সেই ধর্মবিশ্বাসেও হয়তো ঘুণ ধরতে শুরু করবে। এত বড়ো-বড়ো বিপদের আশঙ্কা নিহিত সংবিধানের ঐ ৪৫ সংখ্যক ধারা প্রয়োগের সম্ভাব্য পরিণামের মধ্যে, ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। সংবিধান প্রবর্তনের পর প্রায় আটতিরিশ বছর অতিক্রান্ত, শাসকশ্রেণী কোনো ঝুঁকি নেননি। ১৯৪৭ সালে, স্বাধীনতার বছরে, ভারতবর্ষে সাক্ষরতার অনুপাত ছিল শতকরা ২৭ ভাগ, ১৯৮৭ সালে তা মেরে-কেটে শতকরা ৩৪ ভাগ।

তবে যেহেতু আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সমস্ত নিরপেক্ষ দেশগুলির নায়কত্ব দিয়ে থাকি, সর্ব ঋতুতে অন্যদের উপদেশের উপহারমালা বিলোই, কিছু ঠমক বজায় রাখতে হয় আমাদের, কিছু ভড়ং না ক'রে উপায় নেই। মাঝে-মাঝে তাই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার-প্রসঙ্গে তদ্গত বক্তৃতাদি দেওয়া হয় নতুন দিল্লিতে, গত সপ্তাহে যেমন কেন্দ্রের মানবসম্পদ মন্ত্রী ঘোষণা ক'রে বসলেন আগামী কয়েক বছরে নাকি তাঁরা সব-মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ শো কোটি টাকা ব্যয় করবেন প্রথা-বহির্ভূত পদ্ধতিতে দেশের প্রাপ্তবয়স্ক এখনো-নিরক্ষর ব্যক্তিদের প্রাথমিক শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে। আধ মণ তেল পুড়বে ঠিকই, সাড়ে পাঁচশো কোটি টাকা এই অছিলায় খরচ হবে ঠিকই, কিন্তু শহর-গ্রামের গরিব মানুষদের তাতে শিক্ষার কোনো সুরাহা হবে ব'লে মনে হয় না, এই টাকার বড়ো অংশ হয়তো ব্যয় হবে রঙিন টেলিভিশন কিনতে, অথবা বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পিছনে, অথবা প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যসাধনার্থ শহরে-শহরে যে নতুন-নতুন সরকারি দপ্তর খোলার দরকার দেখা দেবে, সে-সব দপ্তরের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করতে, তারপর সেই ঘরবাড়ি বাতানুকূল করতে। রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী'তে যা-যা বর্ণিত আছে, ঠিক সে-রকমই ঘটবে ; অক্ষরপরিচয়হীন দরিদ্র সম্প্রদায় যে-তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকে যাবেন।

কমরেড বাচ্চা মুন্সী প্রয়াত হয়েছেন, ইতিহাসের সার কথা বুঝে নিয়েছিলেন তিনি। পৃথিবীটাকে বদলাতে হলে পৃথিবীর ভূগোল-ইতিহাস জানা দরকার, তা জানতে হবে আমাদের নিজেদের চেষ্টায়, যখন-যে-অবস্থায় থাকি না কেন আমরা। কমরেড বাচ্চা মুন্সী তাঁর সেই ভূগোলের বইটি ভারি ভালোবাসতেন, মানুষকে ভালোবাসার সমার্থক ছিল তাঁর সেই ভালোবাসা।

## দেশপ্রেমের ইতিকথা

হয়তো কোনো বিদেশী গল্পের আভাস ছিল, তা হ'লেও আমরা অনেকেই শিবরাম চক্রবর্তী মশাইর একটি গল্প থেকে ছেলেবেলায় প্রচুর আমোদ পেতাম। গল্পটি 'বাজার করার হাজার ঠ্যালা'। বাচ্চা ছেলে জিনিশ কিনতে বাজারে এসেছে, বাড়ি থেকে তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দোকানি যা দাম চাইবে, ঠিক তার অর্ধেকের বেশি দিতে কিছুতেই রাজি না হ'তে। বাড়ির নির্দেশ, বাচ্চা ছেলে সেই নির্দেশ থেকে এক চুলও স'রে আসবে না। জিনিশের দাম, দোকানি বললো, দশ টাকা, ছেলেটি সঙ্গে-সঙ্গে জানালো, উঁহু, পাঁচ টাকার বেশি একটি পয়সাও সে দিতে রাজি নয়। দোকানি রফা করতে চাইলো : আচ্ছা, সাড়ে সাত টাকা। ছেলেটির সঙ্গে-সঙ্গে জবাব : আজ্ঞে না, পৌনে চার টাকা। দোকানি ভড়কে গিয়ে এবার বললো : ছ'টাকা। বাচ্চা ছেলের প্রত্যুৎপন্নমতির অভাব নেই, সোজা অঙ্কের হিশেব তার, মা ব'লে দিয়েছেন দোকানি যা চাইবে বলতে হবে তার অর্ধেক, সুতরাং এবার তার জবাব : তিন টাকা। দোকানি অতঃপর চার টাকায় নামলো, ছেলেটি অতএব দু'টাকায়। এমনি ক'রে দরাদরির জের চলতে-চলতে যখন দাম দোকানির হাঁকে চার পয়সায় গিয়ে ঠেকেছে, এবং ছেলেটি দু'পয়সার বেশি কিছুতেই দেবে না, উদ্‌ভ্রান্ত দোকানি হঠাৎ 'দুত্তোর' ব'লে বিনামূল্যে জিনিশটি বাচ্চা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে দোকানের ঝাঁপি তুলে পলায়ণপর হলো।

রূপকথার গল্প, রূপক গল্প। প'ড়ে মজা পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা জানি এ-ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে ঘটবার নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনো বাচ্চা ছেলেরই দরাদরির এমন জাদুকৌশল জানা নেই যা প্রয়োগ ক'রে বাজারে সমস্ত জিনিশপত্রের দাম শূন্যের কাছাকাছি নামিয়ে আনা সম্ভব হয়, সংসারনির্বাহের খরচও কমতে-কমতে শেষ পর্যন্ত প্রায় নামমাত্র হয়ে যায়। দাম বা খরচ ক্রমশ ক'মে আসার কাহিনী তাই রূপকথা, খরচ বল্‌গাহীন বেড়ে যাওয়ার কাহিনী অথচ কিন্তু নয়। ধরুন দু'টি পাশাপাশি রাষ্ট্র, অতি দরিদ্র, বহু শতাব্দী ধ'রে তারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শোষিত হয়েছে, কয়েক বছর হলো তারা স্বাধীনতা পেয়েছে,

কিন্তু হতদরিদ্র, দেশের বেশির ভাগ মানুষ দু'বেলা ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে না, কৃষি অনুন্নত, সেচের প্রসার ঘটেনি, কিছু-কিছু ক্ষুদ্র-তথা-কুটিরশিল্পের বাইরে শিল্পোন্নয়ন হয়নি, সড়কঘাট-যানবাহন মধ্য যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিদ্যুতের উৎপাদন অতি সীমিত, দেশের বেশির ভাগ মানুষ নিরক্ষর। এখন উভয় দেশেই বৈদেশিক শৃঙ্খলমুক্ত, রাষ্ট্রনায়করা দুই রাষ্ট্রেই জনসাধারণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ যে দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন যেহেতু একমাত্র জাতীয় লক্ষ্য, জাতির সমস্ত সামর্থ্য জড়ো ক'রে শিল্প-বিদ্যুৎ-যোগাযোগব্যবস্থা-শিল্প-সেচ ইত্যাদির বিকাশ ক্ষিপ্রতম করার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। 'ক' দেশে আর 'খ' দেশ, পাশাপাশি রাষ্ট্র, কাছাকাছি সমস্যা, দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্যা। এমন সময় 'ক' দেশের রাষ্ট্রনায়কের কানে কেউ পরামর্শ দিলেন, দেশ বাঁচলে তবে তো দেশের আর্থিক উন্নতি, 'খ' রাষ্ট্রের মতলব ভালো নয়, ঐ রাষ্ট্র বিদেশ থেকে পাঁচশো কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করেছে, আমাদের সুতরাং অন্তত এক হাজার কোটি টাকা প্রতিরক্ষার খাতে সরিয়ে রাখতে হবে, দেশ টিঁকলে তো তবে দেশের আর্থিক বিকাশ। 'ক' রাষ্ট্র প্রতি-রক্ষাখাতে এক হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে: সেই খবর অচিরে 'খ' রাষ্ট্রে জানাজানি হয়ে গেল, ওখানেও মন্ত্রণাদাতাদের অভাব নেই, তাঁদের প্রভাবেরও খামতি নেই, দ্রুত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, কুছ পরোয়া নেই, 'ক' রাজ্য যদি প্রতি-রক্ষার নামে এক হাজার কোটি টাকা খরচ ক'রে থাকে, আমরা তবে খরচ করবো দু'হাজার কোটি টাকা। 'খ' রাষ্ট্র দু'হাজার কোটি টাকা অস্ত্রশস্ত্র কিনতে ব্যয় করেছে জেনে 'ক' রাষ্ট্র এবার সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো নিতান্ত চার হাজার কোটি টাকা প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় না করলেই নয়। 'ক'-র চার হাজার কোটি টাকা খরচের জবাবে 'খ' রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাব্যয় অতঃপর আট হাজার কোটি টাকায় পৌঁছুলো। কিন্তু এখন তো পরিস্থিতি সেই 'তোমার হাসি হইছে বাঁকা আমার হাসি সন্দমাখা' স্তরে উত্তীর্ণ, যেহেতু 'ক' রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাবরাদ্দ ষোলো হাজার কোটি টাকা নির্দিষ্ট হলো, অতএব পরের বছর 'খ'-র প্রতিরক্ষা ব্যয় বত্রিশ হাজার, সুতরাং 'ক'-র চৌষট্টি হাজার, তাই 'খ'-র এক লক্ষ বত্রিশ হাজার, কিন্তু এই প্রতিযোগিতার তো শেষ নেই, অন্তহীন এই ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের পাটিগণিত। দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্য এই অবস্থায় এক পাশে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকবে। রাষ্ট্রকে চক্রান্তকারী বহিঃশত্রুর শ্যেনদৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারলেই আর্থিক বিকাশের প্রশ্ন, আপাতত অন্য-সমস্ত প্রসঙ্গ অবান্তর, একমাত্র প্রতিরক্ষা সত্য, প্রতিরক্ষাব্যয় কমানোর কথা যে বলবে, অথবা প্রতিরক্ষার নামে যা খরচপাতি হচ্ছে তা ভালো ক'রে পরীক্ষা

ক'রে দেখতে যে বলবে, তার স্বদেশপ্রেম নেই। সে হয়তো এমনকি বৈদেশিক চর। সে 'ক' রাষ্ট্রের নাগরিক হ'লে নিশ্চয়ই 'খ'-র টাকা খেয়েছে, 'খ' রাষ্ট্রের অধিবাসী হ'লে, 'ক'-র টাকা, শূলে চড়াও তাকে।

'বাজার করার হাজার ঠ্যালা' গল্পের বাচ্চা ছেলে ও দোকানি দাম-কমানোর অন্তহীন প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, আমাদের বাস্তব রূঢ় পৃথিবীতে প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রও অন্তহীন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ, তবে তা কী ক'রে প্রতিরক্ষার নামে খরচ বছরের পর বছর অবিশ্রান্ত বাড়ানো যায়। অন্তহীন প্রতিযোগিতা, অর্থহীন প্রতি-যোগিতা। কারণ শেষ পর্যন্ত সত্যিসত্যিই 'ক' কিংবা 'খ' কেউ-ই কিন্তু অপর রাষ্ট্রের তুলনায় নিজেদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কখনো 'ক' এগিয়ে থাকবে, কিন্তু পর মুহূর্তে 'খ' ধ'রে ফেলবে তাকে, 'খ' কখনো এগিয়ে যাবে, কিন্তু অচিরে 'ক' ধ'রে ফেলবে তাকে, শিকেয় তোলা থাকবে শিক্ষাকর্মসূচী, শিল্পবিদ্যুৎকর্মসূচী, কৃষিসেচকর্মসূচী। প্রতিরক্ষা-ব্যয় ও দেশপ্রেম সমার্থক হয়ে যাবে, দেশপ্রেমের দুর্দম অন্ধ বন্যায় গোটা জাতির যুক্তি-বুদ্ধি কুটোর মতো ভেসে যাবে।

যাচ্ছেও। এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা থেকে ভূরি-ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, দেশে দুর্ভিক্ষ, নিরক্ষরতা, শিল্পোদ্যোগের অভাব, সর্বব্যাপী কর্মসংস্থানহীনতা, কিন্তু দেশনায়করা এ-সমস্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন, দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে, দেশের সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর করার দিকেই তাঁরা প্রাণমন ঢেলে দিয়েছেন। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রীয় বাজেটের অর্ধেক কি তারও বেশি প্রতিরক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত। এই অনুপাত বাড়ছে বই কমছে না, প্রতিযোগিতার পাটিগণিত অমোঘ নিয়মে নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছে। দেশের মানুষগুলি অভুক্ত, শিক্ষাহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, সার্বিক আর্থিক সংকটে দেশ হাঁসফাঁস করছে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি আছে। দেশের মানুষগুলি না খেয়ে মারা যাবে হয়তো, কিন্তু আচমকা বিদেশী শত্রু এসে তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে আদৌ সফল হবে না, এটুকু তৃপ্তি নিয়ে তারা অন্তত মরতে পারবে।

তবে বাস্তব পৃথিবীর কাহিনী আমাদের বাচ্চাছেলে-দোকানদারের পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় দাম-কমানোর রূপকথার মতো অত সরল নয়। এই বাস্তব কাহিনীতে তৃতীয় পুরুষের ছায়া পড়ে, কখনো তা নেপথ্য ছায়া, কখনো তা প্রকাশ্য। 'ক' এবং 'খ' উভয় রাষ্ট্রকে প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় সম্প্রসারণ করতে, এবং সেই সঙ্গে

বিদেশ থেকে অঢেল অস্ত্র আমদানি করতে, পাশ থেকে অহরহ উৎসাহ দান করেন এই তৃতীয় পুরুষ। ইনি বিদেশী অস্ত্রসদাগর। পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কাঠামোগত সংকটে দীর্ণ, আর্থিক বিকাশ তাদের শ্লথগতি, লক্ষ-লক্ষ বেকার, কিন্তু কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়, কাঠামো পাল্‌টানো মানে তো ধনতন্ত্রকেই বর্জন, তা কী ক'রে হয়। অর্থব্যবস্থাকে টি'কিয়ে রাখার জন্য পশ্চিমের এ-সমস্ত অতি সুসভ্য দেশে তাই অস্ত্রোৎপাদনশিল্পের উপর বাড়তি জোর দেওয়া হয়েছে। দেশে বেকার থাকুক না ক্ষতি নেই, ওদের জন্য কাজের সংস্থান না ক'রেও পুঁজিপতিরা নিজেদের মুনাফা বাড়িয়ে যেতে পারবেন, তাঁরা নানা ধরনের বহুবৈচিত্র্যমণ্ডিত অস্ত্র উৎপাদন করবেন, তারপর সেই অস্ত্র অনুন্নত দেশগুলিতে রপ্তানি করবেন, প্রচুর অর্থোদ্গম ঘটবে, লাভের পরিমাপ বাড়বে। পশ্চিমের দেশগুলির পুঁজিপতিসম্প্রদায় আঁটঘাট বেঁধে ব্যবসায় এগোন, তাঁরা 'ক' রাষ্ট্রে অনুচর পাঠান, সেই সঙ্গে 'খ' রাষ্ট্রেও, 'ক'-কে বোঝান 'খ' রাষ্ট্র অস্ত্রশস্ত্র-সম্ভারে অনেক এগিয়ে গেছে, আপনারা যদি এবার পর্যাপ্ত কেনাকাটা না করেন, যুদ্ধ বাধলে কচু-কাট্টা হয়ে যাবেন। ত্রস্ত হয়ে 'ক' রাষ্ট্রের দেশনায়করা এই বিদেশী অনুচরকে পুষ্পার্ঘ্যসহ বরণ করেন, তাঁর পরামর্শ-অনুযায়ী বিদেশ থেকে অঢেল অস্ত্র কেনবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তড়িঘড়ি তখন বিদেশী অনুচর গিয়ে উপস্থিত হন 'খ' রাষ্ট্রের শাসককুলের সমীপে: গেল, গেল, সর্বনাশ হলো, 'ক' এই-এই অস্ত্র কিনেছে বিদেশ থেকে, এখন দেশকে যদি বাঁচাতে হয়, তা হ'লে আপনাদেরও এবার আরো অস্ত্র কিনতে হবে, মহার্ঘতর অস্ত্র, উৎকৃষ্টতর অস্ত্র। প্রতিরক্ষাখাতে অতএব খরচ বাড়বে, উন্নয়নের টাকায় কম পড়বে, দেশের আর্থিক উন্নতি আপাতত ব্যাহত হবে, কিন্তু দেশকে বাঁচাতে হ'লে অন্য বিকল্প তো নেই। দুই রাষ্ট্রই অতএব এখন থেকে ব্যয়ের পাটিগণিতের অন্তহীন কুম্ভিপাকে জড়াবে। বড়োলোক দেশ-গুলিতে পরিণামে অস্ত্রশিল্প ফুলে-ফেঁপে উঠবে, পুঁজিপতিদের, সদাগরদের মুনাফার পাহাড় আরো উঁচু হবে, গরিব দেশগুলি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার ঠেলায় মারা পড়বে। কিন্তু উপায় কী, বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিপদ থেকে দেশকে সুরক্ষিত করাই রাষ্ট্রনায়কদের প্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য।

কখনো-কখনো একজন-দু'জন অবোধ রাষ্ট্রনায়ক থাকেন, তাঁরা চট ক'রে বুঝতে চান না বা বুঝতে পারেন না এত ডাঁই-ডাঁই অস্ত্র বিদেশ থেকে অহরহ কেনবার এমন কী যৌক্তিকতা বা সার্থকতা আছে। কাঠখড় পোড়াতে হয় তাই, সোজা আঙুলে যে-ঘি না ওঠে তার জন্য বাঁকা আঙুলের ব্যবস্থা করতে হয়।

বিদেশী অস্ত্রপ্রস্তুতকারকদের নিজস্ব-একান্ত প্রতিনিধি যদি কাজ হাসিল করতে না পারেন, দালাল লাগাতে হয় তখন। দালালরা গিয়ে রাষ্ট্রনায়কদের বোঝান, মন্ত্রীদের বোঝান, সেনাপতিদের বোঝান, দিনের-পর-দিন ধ'রে বোঝান বিদেশ থেকে মহার্ঘ থেকে মহার্ঘতর অস্ত্রশস্ত্র বিনা জিজ্ঞাসায় কেনার চেয়ে মহত্তর দেশপ্রেম কিছু নেই। অচিরে মন্ত্রীরা-সেনপতিরা-রাষ্ট্রনায়করা বোঝেন, দালাল মহোদয় কৃত-কৃতার্থ বোধ করেন, বিদেশী অস্ত্রোৎপাদকরা তাঁর কাজের মহিমার স্বীকৃতি-স্বরূপ তাঁর জন্য মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করেন। এই পারিশ্রমিকের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়ে থাকে, কখনো বলা হয় কমিশন, কখনো দস্তুরি, কখনো প্রতি-উপহার, কখনো অন্য-কিছু। নামে কী এসে যায়, শেক্‌সপীয়র সেই কবে লিখে গেছেন, গোলাপকে যে-নামেই ডাকো, সে সমান সুরভিমণ্ডিত থাকবে।

তবে মাঝে-মধ্যে মুশকিল দেখা দেয়, রাষ্ট্রনায়ক-মন্ত্রীসেনাপতি-অমাত্যবর্গ অস্ত্র-প্রতিযোগিতার অমোঘ পাটিগণিতের উপযোগিতা বুঝেও বুঝতে চান না, না-বোঝার ভাণ করেন। তা ছাড়া বিদেশী পুঁজিপতিদের মধ্যেও এক ধরনের রেষারেষি শুরু হয়, 'অ' ধনতান্ত্রিক দেশের অস্ত্রোৎপাদকের সঙ্গে 'উ' ধনতান্ত্রিক দেশের অস্ত্রোৎপাদকের লাঠালাঠি বেধে যায় 'ক'-'খ' রাষ্ট্রে। তুমি নয়, আমি অস্ত্র বেচবো, তুমি অন্যত্র দেখো: এবংবিধ কলহবিবাদে আবহাওয়া আরক্ত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় প্রতিনিধি-কিংবা-দালালশ্রেণীর লোকদের দিয়ে আর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কমিশন-দস্তুরিতেও কুলোয় না, অন্য প্রকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রতি বছর, দরকার থাকুক না-থাকুক, অজস্র অস্ত্র যাতে কেনা হয়, এবং সে-সমস্ত অস্ত্র যাতে 'অ' দেশের অমুক উৎপাদকের কাছ থেকেই কেনা হয়, 'উ' দেশের কিংবা 'ঔ' দেশের কারো কাছ থেকে নয়, তার জন্য শেষ পর্যন্ত তাই উৎকোচ প্রদান করতে হয়, অর্থাৎ কিনা ঘুষ দিতে হয়! যাঁরা অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করেন, তাঁরা দেন, 'ক' অথবা 'খ' রাষ্ট্রের নায়ক-মন্ত্রী-সেনাপতি অমাত্যকুল গ্রহণ করেন। উৎকোচের টাকা রাষ্ট্রনায়ক-মন্ত্রী-সেনাপতি-অমাত্য এঁদের মধ্যে কে কতটা পেলেন, কিংবা সবাই পেলেন কিনা, কে কী অনুপাতে পেলেন, বিদেশী মুদ্রায় কতটা পেলেন দেশী মুদ্রায় কত, সেই বিদেশী মুদ্রা সুইৎজারল্যাণ্ডে না হঙকঙে না বাহামার কোন্ ব্যাঙ্কের গোপন খাতায় জমা পড়েছে, এ-সব বড়ো জটিল প্রশ্ন। কে জানে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের হয়তো এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়ার অধিকারই নেই। কে জানে, এ-সব প্রশ্ন করা মানেই দেশদ্রোহিতা।

আমাদের তো দেশপ্রেমিক হ'তে হবে।

# আমরা তো তিমিরবিনাশী হ'তে চাই

টালমাটাল অবস্থা দেশে। টালমাটাল অবস্থা শাসকদলে, গোটা দেশ তার ভুক্ত-ভোগী। খরার আগুনে উত্তর ভারত জ্বলছে, উড়িষ্যায়-রাজস্থানে-মহারাষ্ট্রে গ্রামের গরিব মানুষ অনাহারে ধুঁকছে, কোটি-কোটি টন খাদ্যশস্য সরকারি গুদামে মজুত, কিন্তু সামান্য কিছু চাল-গম গুদাম থেকে বের ক'রে খরাপীড়িত মানুষদের মধ্যে বিতরণ করার কথা ভাববার মতো সময় দিল্লির দয়ালু সরকারের নেই। জিনিশপত্রের দাম লাফিয়ে-লাফিয়ে প্রতি সপ্তাহে বাড়ছে, সাধারণ মানুষের কী সর্বনাশ হচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা করার মতো অবসর বা মানসিকতা বর্তমান অবস্থায় সরকারি ব্যক্তিদের কোথায়, রাজ্যে-রাজ্যে এ-বছর বৃষ্টির পরিমাণ এখন পর্যন্ত অত্যন্ত কম, ফলে ফসল ভীষণরকম মার খাওয়ার আশঙ্কা, দেশের উপস্থিত এটাই চরম সমস্যা বলে বিবেচনা হওয়া উচিত, কিন্তু এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবে কে, সর্বশক্তির আকর কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসকদল খাবি খাচ্ছে, কেমন ক'রে কোনোক্রমে টিঁকে থাকবে তা নিয়েই সমস্ত সামর্থ্য আপাতত নিয়োগ করতে হচ্ছে, দেশ মরলো কি বাঁচলো কিছু যায় আসে না, দেশের মানুষ অভুক্ত রইলো কি এক মুঠো দু-মুঠো খেতে পেল তাতেও কিছু যায় আসে না। দেশ, দেশের মানুষ, তারা তো দলের চেয়ে, নেতার চেয়ে বড়ো নয়। নেতাসর্বস্ব দল, নেতা বাঁচলেই নাকি দল বাঁচবে, নেতার শুভাশুভই নাকি দেশের শুভাশুভ, নেতাকে সিংহাসনচ্যুত করার যে-কোনো উদ্যোগ নাকি দেশকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্রের পূর্বপ্রস্তুতি। একনায়কত্বই নাকি গণতন্ত্র, একনায়কত্বই নাকি সমাজতন্ত্র, জাতীয় সংহতিরও তাই নাকি সমার্থক।

মাসের-পর-মাস ধ'রে যেই নেতা, যেই নেতার সরকার, দেশের আর্থিক স্বার্থ পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে বিকিয়ে দিচ্ছেন, বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কথায় উঠছেন-বসছেন, দেশের কোটি-কোটি শ্রমজীবী মানুষের বর্তমান-ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিতে যাঁর হাত সামান্য একটুও কাঁপছে না, যে-নেতার প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অকুতোভয়ে ব'লে বেড়াচ্ছেন দেশের গরিব মানুষ আর খিদের খাবার চাইছে না, চাইছে রঙিন টেলিভিশন, যে-নেতা বৃহৎ পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির উপর সকল নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে উদ্‌গ্রীব, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানাদির কর্ম-

দক্ষতা সম্পর্কে নিন্দাব্যঙ্গ করতে যিনি ঋতু-অঋতুতে অতি পটিয়সী, পাঞ্জাব থেকে দার্জিলিঙ সর্বত্র যিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ নানা উৎসাহ বেশ কয়েক বছর ধ'রে জুগিয়ে এসেছেন, তিনি দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবেন, দেশের দরিদ্রতর শ্রেণীর দৈন্যদুর্দশা ঘোচাবেন, জাতির সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবেন. এ-ধরনের গালগল্পে ঢোঁক গিলতে হয়। অন্য পক্ষে, প্রধান মন্ত্রীর অন্তরঙ্গ বেশ কয়েকজন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে টাকা পাচারে তাঁরা কেরামতি দেখিয়েছেন, প্রতিরক্ষাসামগ্রী কেনার সূত্রে তাঁরা দালালি হিশেবে হোক, ঘুষ হিশেবে হোক, বহু কোটি-কোটি টাকা অসৎভাবে উপায় করেছেন, এ-সমস্ত অভিযোগ এখন তো আর ঠিক গুজবের স্তরে থাকছে না, কিছু-কিছু অভিযোগের সত্যতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত, অন্য-কিছু অভিযোগ সম্পর্কে যাতে অনুসন্ধান মাত্র নাম-কা-ওয়াস্তে হয় তার জন্য প্রধান মন্ত্রীর উৎসাহও অপ্রমাণিত নয়। অসদাচরণের সংস্থানে দাঁড়িয়ে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না, কোনো অনাচারআশ্রয়ী প্রধান মন্ত্রী দেশের স্থিতি রক্ষা করতে পারেন না, কারণ অনাচার থেকেই অস্থিতি ছড়াতে বাধ্য। এখন যা অবস্থা, দলের মধ্যেই প্রতিদিন নিত্য-নতুন বিদ্রোহ ছড়াচ্ছে। নিত্য-নতুন কেলেঙ্কারির খবর বেরোচ্ছে, প্রশাসন প্রায় অচল। তাঁর সরকারের বিধিগত মেয়াদ যা-ই হোক না কেন, এই অবস্থায় অবিলম্বে পুনর্বার লোকমত যাচাই করতে প্রধান মন্ত্রী সম্মত না হলে অস্থিরতা বেড়েই চলবে। নতুন নির্বাচনে একনায়কতন্ত্রী শাসক দলই হয়তো ফিরে আসবে, হয়তো সে দল গো-হারা হারবে। কিন্তু গণতন্ত্রের গর্ব করি আমরা, নির্বাচনের ফল প্রশান্ত মনে মেনে নিতে বাধা কোথায়, দেশের মানুষ কাদের চাইছেন এটা স্পষ্ট হয়ে গেলে প্রশাসনে কোথাও-কোথাও যে-অস্থিতি, কোথাও-কোথাও যে-দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা দিয়েছে, তার অবসান ঘটবে।

কিন্তু কারো-কারো মনে সম্ভবত এই ঝুঁকি নিতেও অনীহা। তাঁদের অনীহাকে তাঁরা তত্ত্বকথার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত ক'রে থাকেন। কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ রীতি-নীতি কিংবা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যতই প্রতিক্রিয়াশীল হোক না কেন, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু প্রগতিশীলতা অব্যাহত থেকেছে। এই প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতির পুরো কৃতিত্ব, তাঁরা দাবি করবেন, একটি বিশেষ পরিবারের, যে-পরিবার তিন পুরুষ ধ'রে ভারতবর্ষের হাল ধ'রে আছে। শাসকদলের অভ্যন্তরে অনেক বিচ্যুতি, বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বসংঘাত, নানা ধরনের খলনায়কের নর্তনকুর্দন। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে আমাদের বৈদেশিক নীতিতে

ধারাবাহিকতা বজায় আছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা যে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে যাঁরা যে-যেখানে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের পাশাপাশি যে আমরা আছি, এটা নাকি সম্ভব হয়েছে ঐ বিশেষ পরিবারভুক্ত কেউ-না-কেউ দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আছেন ব'লেই। জাতিকে তাঁরা দিগ্-নির্দেশ দিয়েছেন, এখনো দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা না থাকলে আমাদের পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-থাইল্যাণ্ডের মতো দশা হতো, প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে কোনোক্রমেই নাকি নিজেদের বাঁচাতে পারতাম না আমরা।

এক তত্ত্বের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে আরো-এক তত্ত্ব। গরিব, অনুন্নত দেশে শ্রেণী-চেতনা বিকাশ পেতে সময় লাগে। সাধারণ মানুষের সত্তার গভীরে সাম্যসুষমা-নন্দিত সমাজব্যবস্থার জন্য আকৃতি, সাম্রাজ্যবাদ তথা উপনিবেশবাদ সম্পর্কে ঘৃণা, কিন্তু এই অনুভূতিগুলি ব্যক্ত হ'তে পারে না, প্রকাশের পলিভূমি তৈরি হয়নি এখনো, সংগঠন দুর্বল। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রবাহে প্রধান ভূমিকা অবশ্যই শ্রেণী-বিভাজনের, শ্রেণীদ্বন্দ্বের। তা হ'লেও এ-সমস্ত দেশের প্রেক্ষিতে, ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা স্বীকার না ক'রে নাকি উপায় নেই, ব্যক্তি বিশেষই জাতির অব্যক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়ান, ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যান, প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে সংহার করেন, সারথীরূপে প্রগতির রথকে হাজার বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়ে নিয়ে যান। ভারতবর্ষেও নাকি তাই হয়েছে। একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যবর্তিতায় আমাদের দেশে ইতিহাসের যে-অভিনব অধ্যায় শুরু, সমগ্র পরিবারকর্তৃক সেই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে; এই পরিবার জাতীয় চেতনার মূলে নিহিত উজ্জ্বল-প্রোজ্জ্বল নানা প্রগতিশীল ভাবনাচিন্তা-ধ্যানধারণার প্রতীক এবং প্রতিভূ; এই পরিবার বিপন্ন হ'লে ভারতবর্ষের ইতিহাসধারা বিপন্ন, প্রগতিশীলতা বিপন্ন। সুতরাং আমাদের এমন-কিছু করা বা এমন-কোনো পদক্ষেপের প্রস্তাব রাখা নাকি উচিত নয় যা এই পরিবারকে বিপন্ন করতে পারে, এই পরিবারের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়া মানেই, ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থায়, প্রগতির ঘনঘটা ঘনিয়ে আসা।

চমকপ্রদ তত্ত্ব, কিছু দিন আগে পর্যন্তও একটু রেখে-ঢেকে বলা হতো, এখন কিন্তু প্রায় উচ্চগ্রামে। প্রথমেই একটি ছোটো ব্যবহারিক সমস্যার কথা বলা প্রয়োজন। যদি সরকারের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে প্রতিক্রিয়ার ছায়া পড়ে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থে প্রশাসনকে কাজে লাগানো হয়, বহুজাতিক সংস্থাগুলি দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের উপস্থিতি কায়েম করে, সত্যি-সত্যিই কি

আমরা তাহ'লে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অবৈকল্য খুব বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারব ? স্বয়ংভরতার লক্ষ্য বিসর্জন দিয়ে এখন যে-উদ্দাম উৎসাহে বিদেশী পুঁজির ভজনপূজন চলছে, যে-গতিতে দেশকে বৈদেশিক ঋণের ভারে জর্জর ক'রে তোলা হচ্ছে, নতুন দিল্লির মসনদে সমাসীন যাঁরা তাঁরা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থা চালু রাখতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখবেন, পরিত্রাণের পথ খুঁজে না পেয়ে পশ্চিমের দেশগুলির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ শুরু করবেন। সেই ক্ষেত্রে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নও বড়ো আকারে দেখা দেবে। ঐ বিশেষ পরিবারভুক্তরা শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গির উপরে উঠতে পেরেছেন কিনা জানা নেই, কিন্তু পরিবারটির আশেপাশে যাঁরা আছেন, শাসনযন্ত্রের প্রধান নির্ধারক-পরিচালক যাঁরা, তাঁরা কায়মনোবাক্যে পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অনুরাগী আদর্শ-অনুসরণকারী। তা সত্ত্বেও যদি এই এতগুলি বছর ধ'রে আমাদেব পররাষ্ট্রনীতির অন্তঃস্থিত ভাবনা অকম্প থেকেছে, তার কারণ ভারতবর্ষের মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্য, আমাদের চেতনায়-ধমনীতে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা, স্বদেশী-বিদেশী কারো সাধ্য নেই রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে কোনো বিচ্যুতি অনুপ্রবেশ করাবার। ভারতবর্ষের কোটি-কোটি মানুষ, তাঁরা সংঘবদ্ধ হোন-না-হোন যায়-আসে না, তাঁদের চেতনার মান কতটা উন্নত কতটা অবরুদ্ধ সেই যুক্তিও এখানে অসার। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তাঁদের মৈত্রীবন্ধন কিছুতেই শিথিল হবার নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য ন্যূনতম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, ভারতবর্ষের মানুষ তাঁদের সঙ্গে সখ্যতার নিগড়ে বন্দী আছেন, থাকবেন, কোনো পরিবারবিশেষের তত্ত্বাবধান বা নির্দেশনার প্রয়োজন হবে না তাঁদের।

প্রধান প্রশ্ন অবশ্য অন্যত্র। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মুক্তির সংগ্রাম, তা তো ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সামন্ততন্ত্রেব বিরুদ্ধে অভিযান। এখানে-ওখানে, যেখানে ঈষৎ শিল্পায়ন ঘটেছে, ধনতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রে শোষণের ষোলো কলায় নিজেকে বিকশিত করতে উদ্যত, কৃষিক্ষেত্রে তার ভূমিকা এখনো কিন্তু যৎসামান্য, দেশের মাত্র কয়েকটি প্রান্তে কৃষিতে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই সামন্ততন্ত্রের, এবং তার বিভিন্ন রকমফেরের, সর্বসমাচ্ছন্ন প্রভাব। বিহার-উত্তর প্রদেশ-মধ্য প্রদেশ-রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যে গেলে মনে হবে মধ্যযুগে প'ড়ে আছি আমরা। জমিদার-জোতদার-মহাজনদের অখণ্ড প্রতাপ, বর্ণভেদের ক্লেদাক্ত কাহিনী, নারীদের প্রতি অসম্মান, সাম্প্রদায়িকতাবোধ,

সামাজিক-আচরিক কুসংস্কারের পুঞ্জীভূত পাহাড়। এমন নয় যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ ন্যায়-অন্যায়ের মোটা সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত নয়, ক্রান্তির মুহূর্তে কোনো গভীর অবমাননার মুখোমুখি হ'লে তাঁরা তাঁদের ভয়-দ্বিধা-জড়তার নির্মোক থেকে মুক্ত হয়ে অবশ্যই বেরিয়ে পড়বেন, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারাক্রমে অন্ধকারের ছায়া আলম্ব ঝুলে থাকবে আরো বেশ কিছুকাল। আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক যুদ্ধ এই অন্ধকারের বিরুদ্ধে, একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও মধ্যযুগের কুজ্ঝটিকায় অধিকাংশ দেশবাসীর চেতনা ঢাকা প'ড়ে আছে, আমাদের যূথবদ্ধ প্রতিবাদ এই অসংগতির বিরুদ্ধে।

এখন তত্ত্বকথার প্রসাধনে যে-পরিবারতন্ত্রের মহিমা পরিবেশিত হচ্ছে, তা তো সামন্ততন্ত্রেরই অন্যতম প্রকাশ। কী বলা হচ্ছে আমাদের, এই তাত্ত্বিকরা কী শেখাতে চাইছেন আমাদের? সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামন্ততন্ত্রই আমাদের পরম সহায়, মধ্যযুগীয় পরিবারতন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করলে আমরা দেশে প্রগতি সংঘটন করতে অসমর্থ হবো, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ ধ্বংস করতে পারবো না, বিদেশী পুঁজির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে অসফল হবো? কী জবাব দেবো আমরা এই প্রলাপোক্তির? পরিবারতন্ত্রের উপর নির্ভর ক'রে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়, কারণ পরিবারতন্ত্রও সামন্ততন্ত্র, পরিবারতন্ত্রও মধ্যযুগের অন্ধকার আকাশের বিভীষিকা।

আমরা তো মধ্যযুগকে দূর করতে চাই, মধ্যযুগে প্রবেশ করতে চাই না: বাঙালি কবির সেই এলোমেলো পংক্তিগুলি মনে না ক'রে উপায় থাকে না: 'তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে / আমরা কি তিমিরবিলাসী? / আমরা তো তিমির-বিনাশী / হ'তে চাই। / আমরা তো তিমিরবিনাশী'। কোনো বিভ্রান্তির তো অবকাশ নেই, আমরা তো অন্ধকার শিকার করতে চাই, অন্ধকারের শিকার হ'তে চাই না। তাত্ত্বিকরা তাঁদের তিমিরবিলাস নিয়ে থাকুন, আমাদের তিমিরবিনাশী ভূমিকা থেকে আমরা, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ, অন্তত স্খলিত হবো না।

## কুঁদঘাট বা বাগুইহাটির সেই বৃদ্ধা

ভর দুপুরের রোদে পুরো দুটো বাস বদলে, হয়তো কুঁদঘাট থেকে এসেছেন, কিংবা, কে জানে, বাগুইহাটি থেকে ; সত্তরের কাছাকাছি নিশ্চয়ই বয়স হবে রুগ্না মহিলার, শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হয়তো আশেপাশে কেউ নেই যাকে দিয়ে খোঁজ নিতে পারেন, অথবা ফর্মটি সংগ্রহ করতে পারেন। শুনতে পেয়েছেন সরকার থেকে বিধবা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে, অথবা দুঃস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য বার্ধক্য ভাতার, যথাযথ ফর্মে আবেদন করতে হবে এঁর-ওঁর-তাঁর সইসমেত। আশেপাশে পরিচিত-আপনজন কেউ নেই যাকে দিয়ে বৃদ্ধাটি ফর্ম আনাতে পারেন, লোকমুখে শুনেছেন অমুক রাস্তায় অমুক সরকারি দপ্তরে প্রয়োজনীয় ফর্মটি পাওয়া যায়। ভর দুপুরে, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে, অসমর্থ শরীরকে টেনে-হিঁচড়ে, দুটো বাস বদলে, দপ্তরটিতে গিয়ে পৌঁছেছেন তিনি। ইতি-উতি তাকাচ্ছেন, কোথায় যাবেন-কার কাছে খোঁজ করবেন ভরসা ক'রে এগিয়ে কাউকে বলতে পারছেন না তা, অসহায় বৃদ্ধা, এক পা এগোচ্ছেন দু'পা পিছোচ্ছেন, শেষ পর্যন্ত সাহস ক'রে যা-ও বা একজনের কাছে গিয়ে নিজের সমস্যাটি পাড়বার চেষ্টা করলেন, উদ্দিষ্ট ভদ্রলোক ভালো ক'রে শুনলেনও না কথাটা, অন্যমনস্ক হাত তুলে অন্য একদিক দেখিয়ে দিলেন। এই ঘর থেকে ঐ ঘর, এ-টেবিল থেকে ও-টেবিল, সবাই ব্যস্ত, অথবা ব্যস্ততার ভাণে নিমগ্ন। ত্রাণের লক্ষ্য নিয়ে খোলা হয়েছে সরকারি দপ্তর, দপ্তরে যাঁরা বসছেন তাঁদের ঘোষিত কর্তব্য নিম্নবিত্ত-অসহায় সাধারণ মানুষদের হিতসাধন। কিন্তু গরিব মহিলাটি ঠিক কোথায় গেলে সরকারি ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন, তা ব'লে দেওয়ার মতো মানসিকতা কেন যেন অনুপস্থিত। আমার-আপনার যে-কারো পিসিমা বা মাসিমা হ'তে পারতেন এই বৃদ্ধা, কিন্তু এক ভয়ংকর হৃদয়হীনতার শিকার আমরা সবাই, বৃদ্ধাটিকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়, ঐ একই দপ্তরে কয়েকদিন বাদে ফের আসেন, দু'দিন, তিন-দিন, চার-দিন, তারপরে হয়তো কেউ দয়াপরবশ হয়ে ফর্মটি পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেন। প্রথম দিনই যা ইচ্ছা করলেই দপ্তরের মানুষগুলি তাঁকে দিতে পারতেন, তিনদিন-চারদিন ঘুরিয়ে তারপর তা বৃদ্ধাকে দেওয়া হলো, করুণা করা হলো যেন।

এমন নয় যে প্রতিটি দপ্তরেই এমনধারা ঘটছে, কিংবা যে-কেউই সরকারি দপ্তরে এ-ধরনের ব্যবহার পাচ্ছেন। কিন্তু কুঁদঘাট বা বাগুইহাটির এই বৃদ্ধার অভিজ্ঞতা ঠিক কচিৎ-কদাচিতের ব্যাপারও তো নয়। অনুরূপ ঘটনা ঘটছে ব্যাঙ্কে, ডাকখানায়, বীমা দপ্তরে, রেল স্টেশনে, যত্রতত্র। আমার দপ্তরে আপনি একটা কাজ নিয়ে এলেন, আমি আপনার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করলাম। পরের সপ্তাহে আমার কোনো কাজের ঠেকায় আপনার দপ্তরে গেলাম আমি, আমিও অনুরূপ আচরণ পেলাম আপনার কাছ থেকে। একই সমাজব্যবস্থার অনাচার-অবিচারের শিকার আমি-আপনি, রাজনৈতিক লড়াইয়ে আমরা সমগোত্রীয়, একই মিছিলে একই ঝাণ্ডার আশ্রয়ে একই দাবির উচ্চারণে এক সঙ্গে গলা মেলাই আমি-আপনি। অথচ আমাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনের আরক্ত কোলাহলে এই সার কথাটি ভুলে থাকি আমরা, আমার দপ্তরে সামান্য একটা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে এসে আপনাকে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আপনার দপ্তরে আমার নিজের কাজে গিয়ে তেমনি ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা মাথা খুঁড়ে মরতে হয় আমাকে। আমার-আপনার যে-কারো দপ্তরে ঐ বাগুইহাটি বা কুঁদঘাট থেকে আসা সেই অসহায় বৃদ্ধাটিকে--যিনি আপনার পিসিমা হ'তে পারতেন, অথবা আমার মাসিমা —সামান্য-একটি ফর্ম সংগ্রহ করতে এ-ঘর ও-ঘর হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়।

আসলে আমাদের প্রত্যেকের মন তিক্ততায় সমাচ্ছন্ন। জীবন থেকে যা মনে করেছি আমাদের প্রাপ্য, কেউ আমরা পাইনি তা। সামাজিক-আর্থিক ব্যবস্থার জাঁতাকলে আমরা পিষ্ট হচ্ছি প্রতিদিন। জিনিশপত্রের দাম হু-হু ক'রে চড়ছে, অথচ মজুরি-বেতন-ভাতা সেই হারে বাড়ছে না, সংসারে গভীর অনটন। ছেলে বা ভাইপো বেকার ব'সে আছে, কোনো চাকরি হবার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, কিংবা মেয়েটি সকাল-বিকেল মাকে সাহায্য করবার ফাঁকে-ফাঁকে সামান্য-একটু বাড়তি উপার্জনের ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু তা থেকে আপনার আনন্দের চেয়ে গ্লানিবোধ বেশি। সমাজের চেহারা খুব চট ক'রে পাল্‌টে যাচ্ছে, পুরোনো ধ্যানধারণা-মূল্যবোধ খ'সে-খ'সে পড়ছে, এই উথালপাথাল টালমাটাল পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমরা সবাই হাঁপিয়ে উঠছি। বিরক্তিতে ঠাসা আমাদের সমগ্র অন্তঃকরণ। নিজের উপর রাগ, পরিপার্শ্বের উপর রাগ, যে-সমাজ ব্যবস্থা আমাদের নাস্তানাবুদ ক'রে দিচ্ছে তার সম্পর্কে পুঞ্জীভূত ক্রোধ। ইতিহাসের নিয়মকলায় দুর্বিপাকগুলি ঘটছে, ইতিহাসের নিয়মকলা এড়াবার উপায় নেই কারো, ঐ নিয়মকলা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই

আমাদের সামাজিক-পারিবারিক-ব্যক্তিগত মুক্তির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা নিহিত। যখন সভাসমিতিতে যাই, কোনো অনুকম্পায়ী বক্তার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনি, সেই মুহূর্তে বুঝতে পারি সে-সব সত্যের সারাৎসার। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনধারণের চাপের মধ্যে প'ড়ে ঐ মহৎ কথাগুলি ভুলে থাকি, তিক্ততায় ভেসে যাই, হাটে-বাজারে সেই তিক্ততার প্রকাশ ঘটে, দপ্তরের কাজেও ঘটে। যেখানে জীবিকা নির্বাহের তাড়নায় জিভ লম্বা হয়ে যায়, স্ব-স্ব কর্তব্য কর্মে নিষ্ঠা বজায় রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে সেখানে, আমার দপ্তরে এলে আপনি অপমানিত হন, আপনার দপ্তরে গেলে আমি বিমুখ হই, কুঁদঘাট বা বাগুইহাটির অসহায়-অসমর্থ বৃদ্ধা মহিলাটির কাতর নিবেদন শোনবার মতো সময় হয় না আমার-আপনার। যে-সমাজ আমাকে-আপনাকে আমাদের প্রাপ্য দিচ্ছে না, শোষণ করছে প্রতিনিয়ত, সে-সমাজের প্রতি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই, এই মানসিকতায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছি আমরা, সুতরাং ঐ বৃদ্ধা তাঁর ফর্মটি পেলেন কি না পেলেন তাতে কী এসে গেল আমাদের।

এখানেই কিন্তু আসল সমস্যা। অভ্যাসের বশে আমরা বামপন্থী দলের সভা-সমিতিতে যোগ দিচ্ছি, মিছিলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্লোগান আওড়াচ্ছি, ভোটের বাক্সে বামপন্থী দলকে সমর্থন করছি, বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হ'লে সেই সরকারের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও সেই সরকারকে চোখের মণির মতো রক্ষা করবার অঙ্গীকার নিচ্ছি, কিন্তু অভ্যাসের সঙ্গে চিন্তার অন্বয় না-ঘটাতে পারলে আপাতত যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকেও পশ্চাদপসরণে বাধ্য হবো, এগোনো তো দূরের কথা। সমাজের উপরতলায় যাঁরা আছেন—শিল্পপতিরা, জমিদাররা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে দেখেন, তাঁদের সামগ্রিক শ্রেণীস্বার্থ কোন্-কোন্ উপায়ে-পদ্ধতিতে প্রসারিত হবে তা নিয়ে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা সেই সিদ্ধান্তের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হচ্ছে। সেই শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম না ক'রে নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন মানুষদের বাঁচার কোনো উপায় নেই। হৃদয়ের তিক্ততা দিয়ে ইতিহাসের গতিকে ক্ষিপ্রতর করা যায় না, তিক্ততা থেকে নিস্পৃহতা, নিস্পৃহতা থেকে ঔদাসীন্য, ঔদাসীন্যের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়ানো আন্দোলনের মৃত্যুর অঙ্কুর। এবং তা হ'লে তো বর্তমান সামাজিক-আর্থিক ব্যবস্থায় যেখানে অন্তত কোনোক্রমে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এত বড়ো দেশের একটা-দুটো জায়গায় শ্রেণীশত্রুদের কিছুটা হটিয়ে দিয়ে নিজেদের ব্যূহ রচনা করতে পেরেছি, যে-ব্যূহের উপর নির্ভর ক'রে অচিরে অন্যত্র সংগ্রাম বিস্তার করার

পরিকল্পনা-খসড়া তৈরি করছি, সব-কিছুই তো মিথ্যে হয়ে যাবে। কাদের ভরসায় আন্দোলন, কাদের নিয়ে আন্দোলন, কাদের স্বার্থে আন্দোলন ?

এই অন্যায়-অবিচারে-ঠাসা সামাজিক-আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যেও আমরা এখানে-ওখানে, আন্দোলন-সংগ্রাম ক'রে, নিজেদের জন্য একটু সুবিধার সম্ভাবনা রচনা করতে পেরেছি, সেই সম্ভাবনার যদি যথার্থ ব্যবহার করা যায়, তা হ'লে আমাদের অনেকেরই একটু টি'কে থাকার রসদ বাড়ে, আগামী দিনের যুদ্ধের জন্য আরো-একটু বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারি আমরা। আমার-আপনার সমস্যা আমাদের পড়শির সমস্যা, আমাদের পড়শির সমস্যা আমাদের সমস্যা। পড়শির সমস্যা লাঘব হ'লে, আমাদের সৌজন্যে-চেষ্টায় সেই সমস্যা অন্তত খানিকটা হাল্কা করা গেলে, পড়শি আমাদের দিকে ঝুঁকবেন, তিনিও বুঝতে পারবেন কে মারে, কে বাঁচায়। আমাদের হাতে সময় বড়ো কম, এই সীমাবদ্ধ সময় যতটা সম্ভব আন্দোলনে আরো দৃঢ়তা-ঋজুতা-সংঘবদ্ধতা আনবার জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন, সুতরাং আমার সময়ের অপব্যয় রোধ করা আপনার কর্তব্য, আপনার সময়ের অপব্যয় রোধ করা আমার, আমার দপ্তরে তাই আপনাকে অযথা দাঁড় করিয়ে রাখা রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা, আপনার দপ্তরে গিয়ে আমার বিফলমনোরথ হয়ে ফেরাও আমাদের আন্দোলনের প্রতি সমান কৃতঘ্নতা। আমাদের অতিদুঃস্থ বৃদ্ধা মাসিমা-পিসিমাদের বাদ দিয়েও তো আমাদের আন্দোলন এগোতে পারে না, তাঁদের জন্যই তো আন্দোলন, তাঁদের হেলাফেলা করলে নিজেদের বিবেকের কাছে মুখ দেখাবো কী ক'রে ?

পল রোবসনের সেই পুরোনো গান, গণনাট্য আন্দোলনের তুঙ্গ মুহূর্তে ভূপেন হাজারিকা এবং অন্য কেউ-কেউ অনুবাদ ক'রে এক সময় প্রচণ্ড ওজস্‌-সহকারে গাইতেন, এখন আবার নতুন ক'রে শোনা যাচ্ছে সেই গান : ভাইয়েরা, বোনেরা, আমরা তো একই নায়ের যাত্রী, সুখে-দুঃখে আনন্দে-অভিমানে আন্দোলনে-অভিযানে পরস্পরকে আগলে থাকবো আমরা। তিক্ততা দিয়ে তো ইতিহাস রচনা করা যায় না, পারস্পরিক হৃদয়হীনতা তো ইতিহাসের নিয়মকলার পরিপন্থী। আমি ব্যাঙ্কের ভিতরে আছি, বাইরে যে-বেকার ছেলেগুলি ঘুরছে, তাদের ব্যাঙ্ক থেকে কী ক'রে একটু টাকা পাইয়ে দেওয়া সম্ভব নিয়মশৃঙ্খলার আঁটঘাট সমস্ত বজায় রেখে তা তো আমি জানি, সুতরাং একটু উদ্যোগ নিয়ে ছেলেগুলির কাছে সেই কথাগুলি বলা আমার নিকষ কর্তব্য শুধু নয়, সামাজিক দায়িত্ব। কিংবা যে-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক চেক ভাঙাতে এসেছেন ব্যাঙ্কে, দেড় ঘণ্টা অকারণে বসিয়ে না

রেখে যদি সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে টাকাটা দেওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিই, খানিকটা বাড়তি প্রসন্নতার বীজ বপন করতে পারি তা হ'লে, যে-প্রসন্নতা হয়তো আগামী দিনের শ্রেণীযুদ্ধে আমাদের সহায়ক হবে।

কুঁদঘাট অথবা বাগুইহাটি, যেখান থেকেই এসে থাকুন সেই বৃদ্ধাটি, এই সমাজব্যবস্থায় তিনি আমাদের সহযোদ্ধা, কোন্ সাহসে তাঁর সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবো আমরা ? তিনি তো আমাদের বিবেক, তিনি আমাদের আদর্শ, আমাদের নিয়তি। তাঁকে অবজ্ঞা করার অর্থ আদর্শের প্রতি আমাদের ব্রাত্য হওয়া।

আমাদের প্রতিদিন পরিশুদ্ধতর হ'তে হবে। নিজেদের প্রয়োজনে, ইতিহাসের প্রয়োজনে।

## পুড়ে মরা আর পুড়িয়ে মারা

জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ / পরান সঁপিবে বিধবা বালা। যার যা ধর্ম, সুতরাং আগুনের ইন্ধনে চিতা জলবেই, দেওয়ালা গাঁওয়ের রূপ কাঁওয়ারের মতো পুড়িয়ে মারা হবে সদ্য-বিধবা-হওয়া হাজার-হাজার বালিকাবধূদের ভারতবর্ষের যত্রতত্র, কখনো সেই খবর সংবাদপত্রে ছাপা হবে, কখনো হবে না। একবিংশ শতাব্দীর আর বেশি বাকি নেই, একেবারে হালের দক্ষতম প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি, শৌখিন শহরে খেলার মাঠে ক্রিকেটের সমারোহ, কিন্তু, অসম বিকাশ. মহান্ ভারতবর্ষে, পাশাপাশি, অন্ধকার মধ্যযুগের আস্ফালন, বাচ্চা মেয়েদের পুড়িয়ে মেরে সতীতে পরিণত করা হয়। চিতাভস্ম নিয়ে তারপর মাতন-উৎসব, লক্ষ-লক্ষ মানুষের, দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে দূর থেকে-কাছে থেকে জড়ো হওয়া, সতীস্থলে মস্ত মন্দির অচিরে নির্মাণের শপথগ্রহণ। প্রশাসন অথচ হাত গুটিয়ে দৃশ্য নিরীক্ষণে রত হন। এক মাঝারি পুলিশ কর্তা ব্যাখ্যা ক'রে বলেন, সতীদাহ, সতীস্থল ভ্রমণ, ইত্যাদি ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে হস্তক্ষেপ করা পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষে অকর্তব্য, আমাদের সংবিধানে প্রত্যেকটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে, পুলিশের ঘাড়ে সুতরাং ক'টা মাথা যে সতীদাহে বাধা প্রধান করবে, অতএব জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।

অসম বিকাশ। মধ্যযুগীয় অন্ধকার, ধর্মের নামে হত্যালীলা। পবিত্র অশ্রুহাতে, আত্মার মুক্তি সুনিশ্চয় করার নিবিড় উদ্দেশ্যে বাচ্চা মেয়েদের বীভৎস উল্লাসে পুড়িয়ে মারা হবে, উপচে পড়া ভিড় দাঁড়িয়ে-ব'সে, যেন অভিনয় বা ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা, সেই দৃশ্য দেখবে। প্রশাসন থেকে বলা হবে কিছু করার নেই, মানুষের ধর্মবিশ্বাসে হাত দেওয়া বিপজ্জনক, আরো মস্ত অঘটন ঘ'টে যেতে পারে তা হ'লে। একটা-দুটো মিছিল বেরোবে ধিক্কার জানাতে, একটা-দুটো প্রতিবাদ সভা এ-শহর ও-শহরে, হয়তো একজন-দু'জনকে গ্রেপ্তারও করা হবে, কর্তব্যে গাফিলতির জন্য একটি-দু'টি কনস্টেবলকেও সাময়িক বরখাস্ত করার আদেশ বেরোবে। জঙ্গী গণ-সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে আরো কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি অবশ্য অব্যাহত থাকবে, তাঁরা হয়তো বেশ কিছুদিন ধ'রে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, যে-যে

অঞ্চলে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের সমাচ্ছন্ন প্রভাব, সে-সব জায়গায় সামাজিক চেতনা উন্মীলনের জন্য নতুন ক রে উদ্যোগ নেবেন। কিন্তু যাঁরা সমাজবিপ্লব ঘটাতে চান, তাঁদের তো বাস্তববাদী হ'তে হয়। সুতরাং এটা মেনে নেওয়া ভালো, অদূর ভবিষ্যতে বড়োরকম কোন চমক ঘটবার সম্ভাবনা নেই, আরো বেশ কিছুদিন পেস্তা-চেরা চোখ মেলে খবরের কাগজে আমাদের ইতস্তত সতীর চিতারোহণের কাহিনী পড়তে হবে, কত লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয় ক'রে সতীস্থলে চৈত্য নির্মাণের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, পড়তে হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

এমন নয় যে মধ্যযুগকে ভারতবর্ষ থেকে হটানো অসম্ভব। কিন্তু মধ্যযুগ একটি অখণ্ড মানসিকতা। সামন্ততন্ত্র, প্রজাপীড়ন, গরিবদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার, সমস্ত-কিছুই তো মধ্যযুগের প্রতীক ও প্রকাশ, সতীকে চিতায় চড়ানোর মতো। যাঁরা দেশের হাল ধ'রে আছেন, তাঁরা বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার শৌখিনতায় গা ভাসাতে সদা-উৎসুক, তাঁদের পরিমণ্ডলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল সমারোহ, দেশের সাধারণ মানুষের কী হাল তা নিয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্র মাথা-ঘামানো নেই, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থযুক্ত আখের সুষ্ঠু গোছানো হ'লেই হলো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পক্ষে তাঁরা, কৃষি-শিল্পের দ্রুত বিকাশে আগ্রহ তাঁদের, ক্রীড়াসংগীতনৃত্যকলা ইত্যাদির প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্য সমস্ত দেশকে হারিয়ে দিক তাঁদের এই ইচ্ছায় বিন্দুতম খাদ নেই। কিন্তু, পাশাপাশি, তাঁরা এটাও চান যে বড়োলোকরা আরো বড়োলোক হোক, ভূমিসংস্কারের মতো বাজে ব্যাপার তুলে দেওয়া হোক, শ্রমিক-মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে বাড়াবাড়ি না-করুক, দেশের সাধারণ মানুষ নীরবে সমাজতন্ত্রের নামে সমাজের উচ্চবিত্তদের অধিকতর প্রাধান্য বিস্তার মেনে নিক, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি পরিবারের বংশানুক্রমিক শাসন যে অশোভন বা অযৌক্তিক নয় তা কায়মনোবাক্যে স্বীকার ক'রে নিক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভালো, কিন্তু মধ্যযুগীয় অন্ধকার আরো ভালো, মধ্যযুগীয় অন্ধকার অব্যাহত না-থাকলে তাঁদের সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে, জনসাধারণ দেশের সর্বত্র ভূমিসংস্কারের জন্য লড়াই করবে, জমিদার-জোতদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংহত প্রতিবাদের ব্যূহ রচনা করবে, কলকারখানা-সদাগরি-সরকারি দপ্তরে শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হবে, কর্মসংস্থানহীন যুবকযুবতীরা কাজের দাবিতে মিছিল ক'রে রাজপথ-জনপথ কাঁপিয়ে তুলবেন, শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য গ্রামের-শহরের কোটি-কোটি সাধারণ মানুষ প্রশাসনের উপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি ক'রে যাবেন।

মধ্যযুগীয় অন্ধকার অপসৃত হ'লে এমনকি রাজস্থান-মধ্য প্রদেশ-উত্তর প্রদেশের গহনতম পল্লীর অধিবাসীরাও বুঝে নেবেন প্রথাগত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সমান, সুযোগের অধিকারও সমান, অথচ তা মানা হচ্ছে না ভারতবর্ষে। এই উপলব্ধি থেকে প্রতিবাদ সংগঠনের উপযোগিতায় পৌঁছে যাবেন যাবেন তাঁরা। কাঠামোর পরিবর্তন না-ঘটাতে পারলে জনগণের মুক্তি পরাহত, দীক্ষিত হবেন এই প্রতীতিতে। তা হ'লে তো শাসকশ্রেণীর সর্বনাশ।

সোনার পাথরবাটির স্বপ্ন মেলানো যায় না, অথচ মেলাতে হয়। যতদিন আর্যাবর্তের সরলমতি সাধারণ মানুষকে মধ্যযুগের অন্ধকারে ফেলে রাখা যাচ্ছে, ততদিন নিশ্চিন্ত সাম্রাজ্যভোগ, যে অত্যাচার করছে, দমন চালাচ্ছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, জমি থেকে উৎখাত করছে, মজুরি দিতে ঠকাচ্ছে, তাকেই এই সরল সাধারণ মানুষগুলি গভীর ধর্মবিশ্বাসে ভোট দিয়ে যাবেন, কারণ তাঁদের শেখানো হয়েছে রাজার ধর্মই প্রজাপীড়ন, এবং প্রজার ধর্ম রাজাকে চিরন্তন আনুগত্যপ্রদর্শন। মধ্যযুগকে জীইয়ে রাখা শাসকশ্রেণীর তাই একান্ত প্রয়োজন, তাঁদের পক্ষেও এই লড়াই বাঁচার লড়াই। মুখে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলা হবে, সমাজতন্ত্রের কথা বলা হবে, সংবিধানে নির্দেশ লেখা থাকবে দেশের প্রত্যেকটি শিশুকে লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে, সংবিধানে এটাও লেখা থাকবে সম্পত্তিব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে আর্থিক অসাম্য দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু এই তালিকাভুক্ত প্রত্যেকটি অভীষ্টই শাসককুলের শ্রেণীস্বার্থের পরিপন্থী। কারণ এ-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে লোকের চোখকান আরো খুলবে, তাঁরা সামাজিক-আর্থিক কাঠামো পুরোপুরি পাল্টাবার লক্ষ্য নিয়ে আরো বেশি সংঘবদ্ধ-সংগঠিত হ'তে ব্যস্ত হবেন। অতএব মধ্যযুগীয় অন্ধকারই শ্রেয়।

এবং সেজন্যই বালিকাবধূকে পুড়িয়ে মারাও মেনে নিতে হয়। অন্ধকারের কতকগুলি নিজস্ব পরিভাষা আছে, পারস্পরিক বন্ধনযুক্ত সংজ্ঞা। এমনটি বলা চলবে না ভূমিসংস্কার ভালো, কিন্তু সতীদাহ খারাপ, অথবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেয়, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত গরিব মানুষের উপর হামলা চালানো অনুচিত। মধ্যযুগকে যদি বরণ করতে হয়, মধ্যযুগীয় অন্ধকারের আশ্রয়ে যদি নিজেদের শ্রেণীস্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহ'লে মধ্যযুগের প্রতিটি গুণাবলী মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। বংশানুক্রমিক সিংহাসন-আরোহণ যেহেতু মান্য করা হচ্ছে, পাশাপাশি সুতরাং রামজন্মভূমি নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকেও প্রকৃতির নিয়ম হিশেবে মেনে নিতে হবে, এক তরফের মৌলবাদীদের খুশি রাখবার জন্য তাঁদের নির্দেশ-

অনুযায়ী তালাক-দেওয়া মুসলমান বিধবাদের নাগরিক অধিকার যেমন খর্ব করা হবে, তেমনি দুটো-দশটি রূপ কাঁওয়ারকে চিতায় চড়িয়ে পুড়িয়ে মারা হবে, ভাবের ঘোরে চুরি ক'রে ইচ্ছাকৃত একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেতে হবে।

তাই যাঁরা বলবেন দেওয়ালা গ্রামে যা ঘটল তা পুরুষশাসিত সমাজের অপফল, তাঁদের কাছে সকাতর আবেদন জানাতে হয়, ব্যাখ্যার গভীরে গভীরতর ব্যাখ্যার অন্বেষণ, দোহাই, বন্ধ ক'রে দেবেন না। আমাদের আধা-খ্যাঁচড়া সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীনির্যাতন অনেক ধরনের আকার নিয়ে দেখা দেয়, যেখানে-যেখানে সামন্ততন্ত্র এখনো অপ্রতিহত, মহিলাদের উপর হামলা-অত্যাচার সে-সব জায়গায় পরিচিত অভ্যাসের মতো। কিন্তু উৎসের সন্ধানে না গিয়ে যদি প্রতিবাদের মুখরতা স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেয়, তেমন লাভ হবে না তাতে। সমস্যাটি সামগ্রিক সমাজবিন্যাসের, কারা কীসের স্বার্থের অন্ধকারকে লালন করছেন সেই রহস্যের সঙ্গে জড়ানো রূপ কাঁওয়ারের চিতারোহণের প্রসঙ্গ।

রূপ কাঁওয়ার পুড়ে মরেনি, তাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ-ধরনের হাজার হত্যাকাহিনী ভারতবর্ষের গ্রামে-প্রান্তরে ঘটছে, আমাদের কাছে খবর পৌঁছয় না। রূপের শ্বশুরকুলের একজন-দু'জনকে হয়তো গ্রেপ্তার করা হবে, একজন-দু'জন পুলিস-প্রশাসনের কর্তাকে হয়তো মৃদু ভর্ৎসনা জানানো হবে, কিন্তু এসব তো লোক-দেখানো লোক-ঠকানো প্রহসন। কোনো ব্যক্তিগত হত্যাকাহিনী নয়, শ্রেণীদ্বন্দ্বজড়িত সামাজিক হত্যা এটা। একটি বিশেষ গোষ্ঠী যাতে রাষ্ট্রক্ষমতায় অপ্রতিহত টিঁকে থাকতে পারেন, সেই হেতু ভারতবর্ষে মধ্যযুগকে প্রলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এবং মধ্যযুগের বশ্যতা স্বীকার করতে হ'লে সতীদাহকে সমাজের স্বাভাবিক নিয়মকলার অঙ্গ হিশেবে বিবেচনা না ক'রে উপায় থাকে না। মধ্যযুগীয় অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাই ইতিহাসের অনুশাসন-নির্দেশিত শ্রেণীসংঘর্ষ থেকে আলাদা নয়, দুটো একই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সর্বদলীয় সমঝোতা সম্ভব নয় : যারা পুড়ে মরে কীসের ভিত্তিতে তারা হাত মেলাবে যারা পুড়িয়ে মারে তাদের সঙ্গে?

# দুরাত্মার ছল

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। রাজ্যে-রাজ্যে ভূমিসংস্কার ত্বরিত করার চিন্তায় নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের রাত্তিরে ঘুম হয় না ; মাঝে-মধ্যে অনেক বাগাড়ম্বর করা হয় কোথায় কীভাবে কেন্দ্রের উদ্যোগে ভূমিহীন কৃষককে জমি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে সেই বৃত্তান্তসংবলিত। অথচ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে চল্লিশ বছর গড়িয়ে গেছে, গোটা দেশে সরকারি হিশেব অনুযায়ী কৃষিযোগ্য জমির পরিমাপ যেখানে চল্লিশ কোটি একরের মতো, এমন কি চল্লিশ লক্ষ একরও ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হয়নি, এবং সমগ্র ভারতবর্ষে সাকুল্যে যত জমি বণ্টন করা হয়েছে এই চার দশক জুড়ে, তার অন্তত অর্ধেক হয়েছে পশ্চিম বঙ্গে, প্রথমে যুক্তফ্রণ্টের, পরে বামফ্রণ্টের, নায়কত্বে ও তত্ত্বাবধানে।

কিন্তু দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। ১৯৮১ সালে পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভায় একটি ভূমিসংস্কার সংশোধনী আইন পাশ করা হলো। আমাদের এমনই কিম্ভূত রসে টইটম্বুর সংবিধান, এমন কি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়-সম্পর্কিত কোনো আইনও, বিধানসভায় গৃহীত হ'লেও, সঙ্গে-সঙ্গে চালু করা যাবে না। ভূমিবিন্যাস, ভূমিব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি সংবিধানের সপ্তম তফসিলে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। শাদামাটা যুক্তিতে মনে হবে তা হ'লে আর সমস্যা কী, রাজ্য সরকার বিধানসভায় যে-কোনো ভূমিসংস্কার বিধি মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তা বলবৎ করতে পারেন। না, পারেন না। কারণ সংবিধান এক হাতে রাজ্যগুলিকে অধিকার দিচ্ছে, আরেক হাতে নিচ্ছে। সংবিধানে অন্য-একটি ধারা আছে, যা বলছে সম্পত্তি অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত কোনো আইন কোনো রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হ'লে তা বলবৎ করার আগে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি মানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্মতি। কৃষিভূমিও যেহেতু ব্যাকরণের বিচারে সম্পত্তি, অতএব কৃষিভূমি অধিগ্রহণ করতে গেলেও রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করলেই চলবে না, কেন্দ্রের সম্মতির দরকার পড়বে। যেহেতু ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়া ভূমি সংস্কার সম্ভব নয়, প্রত্যেকটি ভূমিসংস্কার বিধিই তাই, রাজ্য তালিকা যা-ই বলুক না কেন, শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সম্মতির উপর। পশ্চিম বঙ্গের ১৯৮১ সালের সংশোধনী

আইনেরও সেই দশা হলো। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল লুকোনো জমি আরো বেশি-বেশি ক'রে উদ্ধার। পুরোনো আইনে ফাঁকি ছিল, মেছো ভেড়ী জমির ঊর্ধ্ব-সীমা নিরূপণের হিশেবে ধরা হতো না, যেমন ধরা হতো না আমবাগান-কাঁঠাল-বাগান-লিচুবাগান ধরনের যে-কোনো বাগান। ধূর্ত জমিদার-জোতদাররা তাই ধানজমিতে আল কেটে দু'দিনের জন্য জল ঢুকিয়ে দাবি করতেন মেছো ভেড়ী, অতএব হিশেবের বাইরে রাখো; কিংবা ধান-কাটা মাঠে একটি লেবু গাছের চারা পুঁতে ঘোষণা করতেন লেবুবাগান, সুতরাং ছাড় যাবে। ১৯৬৯ সালের সংশোধনী আইনে জমির হিশেব নিয়ে এই জাতীয় পুকুরচুরি বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হলো, বলা হলো এখন থেকে মেছো ভেড়ী হোক, কি আমবাগান-জাম-বাগান হোক, জমির ঊর্ধ্বসীমার হিশেবে কোনো ছাড় থাকবে না, সমস্ত জমিই হিশেবের মধ্যে ধরা হবে। বিধানসভায় গৃহীত হবার পর সেই আইন চ'লে গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমতির জন্য দিল্লিতে। ভূমিসংস্কার ত্বরান্বিত করার জন্য নাকি দিল্লির সরকারের হৃদয়মন আঁকুপাঁকু করছে, অথচ তাঁরা পুরো পাঁচ বছর ঝুলিয়ে রাখলেন এই সংশোধনীটিকে। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, বছরের পর বছর যায়, পশ্চিম বঙ্গের ভূমিসংস্কার সংশোধনী আইনে কেন্দ্রের সম্মতি আর আসে না। শ্রেণীর টান আসলে নাড়ির টান, বুকে ধ'রে কেন্দ্রীয় সরকার কী ক'রে এমন আইনে রাজি হবেন যার পরিণামে জমিদার-জোতদারদের হাত থেকে জমি চ'লে যাবে, যে-জমি বণ্টিত হবে ছোটো চাষী বা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে? তাই পাঁচ বছরের উপর সংশোধনীটিকে ঝুলিয়ে রাখা হলো। আজ এই ওজর, কাল ঐ ওজর। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না, এরই মধ্যে একদিন দিল্লি থেকে কলকাতায় চিঠি এলো, রাজ্য সরকার দয়া ক'রে সংশোধনী আইনটি পুনর্বিবেচনা করুন, পশ্চিম বঙ্গ থেকে প্রতি বছর পঁচিশ কোটি বা তিরিশ কোটি টাকার পরিমাণ চিংড়ি মাছ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে, এই রপ্তানি থেকে দেশ ঐ পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছেন, সংশোধনীটি চালু হ'লে পশ্চিম বঙ্গে মেছো ভেড়ীর পর মেছো ভেড়ীর চাষ লাটে উঠবে, চিংড়ি মাছ আর রপ্তানি হবে না, ফি বছর পঁচিশ-তিরিশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে। দেশের এত বড়ো ক্ষতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার আশা করি সাধন করবেন না, আর-একবার ভেবে দেখবেন তাঁরা।

ভারতীয় সংবিধানটি পেড়ে ভালো ক'রে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখুন। মৌলিক অধিকারাদির মধ্যে কোথাও উল্লেখ করা নেই যে যে-কোনো ভারতীয় নাগরিকের 'বিদেশে রপ্তানি করবার অখণ্ড অধিকার থাকবে, তা চিংড়ি মাছই হোক কি অন্য

যে-কোনো জিনিশেরই হোক। ইন্দিরা গান্ধি মহোদয়া জরুরি অবস্থার সময় মহা উৎসাহে সংবিধানে মৌলিক দায়িত্ব-বিষয়ক একটি নতুন অধ্যায় যোগ করেছিলেন; এই অধ্যায়েও কিন্তু লেখা নেই চিংড়ি মাছ—কিংবা আলু, পটল, ধনে শাক—রপ্তানি করা প্রত্যেকটি ভারতীয় নাগরিকের প্রধান কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। অথচ সংবিধানে রাষ্ট্রীর রীতিনীতির যে-দিগ্‌নির্দেশ দেওয়া, তাতে পরিষ্কার বলা আছে, সম্পত্তির ও উপার্জনের বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে। সংবিধানে এই নির্দেশও দেওয়া আছে যে সামাজিক উৎপাদনের ঔৎসিক ক্ষমতার বণ্টনে যে-বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, তা দূর করা সরকারেরর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। ভূমিসংস্কার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ নির্দেশ না-থাকলেও, পরোক্ষ নির্দেশ অন্তত সংবিধানে অনুপস্থিত তাই নয়। দুরাত্মার ছলের অভাব নেই, কিন্তু রপ্তানি ক'রে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন না করলে গলা কেটে নেওয়া হবে, ভারতীয় সংবিধান সেই কথা বলে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যদি কেউ বলেন বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রশ্নটি আগে বিচার্য, ভূমিসংস্কার শিকেয় তোলা থাক, তিনি সংবিধানের অবমাননা করছেন। অর্থাৎ কিনা কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে চিংড়ি ভেড়ীর মালিকদের স্বার্থে ভূমিসংস্কার সংশোধনী আইন পুনর্বিবেচনার উপরোধ ক'রে আসলে সংবিধানের বিরুদ্ধাচারণই করছিলেন।

অবশ্য, সারা দেশ জুড়ে রাজ্য 'সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় তোলার পরে, অবশেষে ১৯৮৬ সালে দিল্লি থেকে ঐ সংশোধনীটির ব্যাপারে সম্মতিপত্র আসে। তবে প্রধান দু'টি জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। প্রথম জিজ্ঞাসা, ভূমিসংস্কার যদি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত, তা হ'লে তাঁদের মতো ক'রে, তাঁদের ধ্যানধারণা-আদর্শ-বিশ্বাস অনুযায়ী, ভূমি পুনর্বিন্যাসের অধিকার রাজ্যগুলির কেন থাকবে না, কেন তাঁদের প্রতিটি ভূমিসংক্রান্ত আইনের সম্মতির জন্য নতুন দিল্লিতে দৌড়ঝাঁপ করতে হবে? দিল্লির মসনদে অসাধু-প্রবঞ্চক-অত্যাচারী-শোষণকারী জমিদার-জোতদারদের প্রতিনিধিবর্গ ব'সে আছেন, পশ্চিম বঙ্গের প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ তাঁদের হটিয়ে বিদায় করেছেন, ভূমিহীন কৃষক-ছোটো চাষী-ভাগচাষী এবং তাঁদের সহমর্মীদের সরকার রাজ্যে গঠিত হয়েছে, অথচ রাজ্য সরকার পূর্বপ্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান জানিয়ে ভূমিসংস্কারের ব্যবস্থা করতে পারবেন না, যাদের হটানো হলো তাদের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত খাটবে, এটা অসম্ভব প্রস্তাব। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক কেন খোল-নল্‌চে পাল্‌টানো প্রয়োজন তা আলাদা ক'রে ব্যাখ্যার আর তাই দরকার পড়ে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। সন্দেহ হয় একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, যে-কোনো অপকীর্তিই বিদেশ-থেকে-মুদ্রা-উপার্জনের দাবির আড়ালে ঢাকার অপপ্রয়াস চলছে, কোন্ সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ থেকে কে কতটা উপকৃত হলেন, কার কতটা অসুবিধা হলো, ঠিক যেন তলিয়ে দেখা হচ্ছে না। রপ্তানিতে অর্জিত উপার্জনের কত অংশ বড়ো রপ্তানিকাররা পেয়েছে, কত অংশ ফড়েরা পেয়েছে, কতটা পৌঁছেছে ভেড়ীর মালিকদের পকেটে, গরিব মৎস্যজীবীর উপার্জন কতটা বেড়েছে এই রপ্তানি থেকে? যদি বাড়তি লাভ পুরোটাই ব্যবসাদার আর ভেড়ীর মালিকদের কুক্ষিগত হয়ে থাকে, মাঝি-মেঝেনদের আয় এক রত্তিও বাড়েনি, তা হ'লে আমরা কেন বৈদেশিক মুদ্রা বাড়তি অর্জিত হয়েছে ব'লে আনন্দে দু'হাত তুলে নৃত্য করবো? বরঞ্চ যদি রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যদি দেখি দেশের অভ্যন্তরে মাছের ঘাটতি দেখা দিয়েছে, মাছের দাম ভীষণ চড়েছে, যা থেকে ফের আরো লাভ হয়েছে ফড়েদের-ঠিকাদারদের-ভেড়ীর মালিকদের, লাভ হয়নি মাঝি-মেঝেনদের, মাছের অসঙ্কুলান ঘটেছে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের, তা হ'লে মাছ রপ্তানি থেকে সামগ্রিক বিচারে আমাদের কী লাভ?

এখানে অবশ্য মস্ত-মস্ত সারগর্ভ কথা শোনানোর চেষ্টা হবে, দেশের আর্থিক বিকাশের হার ক্ষিপ্রতর করতে হ'লে, এমন কি একটা জায়গায় ধ'রে রাখতে হ'লেও, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন একান্ত প্রয়োজন, হাতে বিদেশী মুদ্রা না থাকলে আর্থিক উন্নতির জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি আমরা আমদানি করতে পারবো না, পেট্রোলজাত সামগ্রী আমদানি করতে পারবো না, পারবো না প্রয়োজনীয় কাঁচা-মাল অথবা তৈলবীজের ব্যবস্থা করতে। রপ্তানি অতএব জাতীয় কর্তব্য, তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে এমন কি আমাদের না-খেয়েও রপ্তানির ব্যবস্থা করতে হবে, অধিক রপ্তানির উপরে জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করছে, যাঁরা রপ্তানি বা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের বিরুদ্ধাচরণ করছেন তাঁরা দেশদ্রোহী, আরো বেশি ক'রে চিংড়ি মাছ রপ্তানি করুন, আপনাকে নিবর্তন আইনে তা হ'লে আর কয়েদ করা হবে না।

এ-ধরনের সদোপদেশদায়ীদের সামনে দাঁড় করিয়ে একটু জেরা করার লোভ হয়। বলুন তো, আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের গতর খাটিয়ে যে-যে সামগ্রী উৎপাদন করেন, সে-সব বাইরে রপ্তানি ক'রে যে-বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করা হয়, তা কীভাবে ব্যয়িত হয়? বিদেশ থেকে সুজুকি কোম্পানির গাড়ি বা গাড়ির যন্ত্রাংশ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ ক'রে আমদানি করা হচ্ছে, কারা চড়েন সেই সব গাড়ি? গরিব মানুষেরা? বিদেশ থেকে রঙিন টেলিভিশন বা রঙিন টেলিভিশনের

যন্ত্রপাতি ডলার-মার্ক-ইয়েন খরচ ক'রে কেনা হচ্ছে, কাদের ঘরে শোভা পায় সেই সব টেলিভিশন? কাঁড়ি-কাঁড়ি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় ক'রে শৌখিন অতি-আধুনিক বিমান কেনা হচ্ছে এয়ার ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের জন্য। কোন্ গরিব-গুরবো এ-সমস্ত বিমানে চ'ড়ে বেড়াবার সৌভাগ্যে নন্দিত হবেন? না কি আমাদের ভূমিসংস্কার বন্ধ রাখতে হবে, ভেড়ী মালিকদের রাতের ঘুম নিরুদ্বিগ্ন করতে হবে, তাঁরা যাতে আরো বেশি ক'রে চিংড়ি মাছ রপ্তানি করেন সেদিকে নজর দিতে হবে, বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন আরো বাড়িয়ে যেতে হবে, যাতে বচ্চন সম্প্রদায় সেই বিদেশী টাকায় সুইৎজারল্যাণ্ডে আরো ঘরবাড়িসম্পত্তি করতে পারেন, কিংবা প্রধান মন্ত্রীর অন্য-কোনো আপনজন বৈদেশিক মুদ্রায় উৎকোচ অথবা গোপন উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারেন?

চল্লিশ বছর ধ'রে এ-সব মৌলিক প্রশ্ন মুলতুবি থেকেছে। কিন্তু এই প্রশ্নগুলি এখন উত্থাপন করতেই হয়। দেশটা কাদের?

## অপব্যয় রুখতে হবে

কেন্দ্রে যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন, তাঁরা বেশিরভাগই বড়োলোকের ঘরের সন্তান, ঐশ্বর্যে লালিত হয়েছেন, বিলাসের ঘেরাটোপে তাঁদের দিনযাপন। জমিদার-শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের দ্বারা সমাচ্ছন্ন পরিমণ্ডলে তাঁদের ওঠাবসা-চলাফেরা, তাঁদের একান্ত ধ্যানধারণাও তাই এই শ্রেণীভুক্তদের মানসিকতার সমগ্রোত্রীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এঁদের আদর্শ। সেই দেশে পুঁজিওয়ালাদের পোয়াবারো, সেই দেশের সরকার ধনী সম্প্রদায়ের নির্দেশ সাধারণভাবে মেনে চলে, ধনতন্ত্রের অপ্রতিহত অগ্রগতির পথ সর্বদা সুগম ক'রে দেয়। যেখানে-যেখানে লাভের বহর বেশি, সরকার সে-সমস্ত আর্থিক ক্ষেত্রে নাক গলাবে না, বেসরকারি মালিকদের মুনাফা লোটবার রাস্তায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, তা হ'লেই নাকি সামাজিক সর্ব শুভ, পুঁজিবাদী দেশগুলির সমাজদর্শন এই কথাই বলে। গরিব মানুষ বাঁচুক-মরুক, সাধারণ মানুষ খেতে পাক কি না-পাক, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা তাদের জন্য থাকুক কি না-থাকুক, কর্মসংস্থানের সুযোগ তাদের হোক না-হোক, সরকার যেন ভাবিত না হয়, সরকার যেন কুঁকড়ে থাকে, সরকার যেন বেসরকারি উদ্যোগের হাতে এ-সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেয়: প্রখ্যাত সব মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাদিগ্‌গজ অধ্যাপকেরা নাকি প্রমাণ ক'রে দিতে পারেন যে-দেশে সরকার নিজেকে সব চেয়ে বেশি গুটিয়ে রাখে সেই দেশে নাকি মানুষ সব চেয়ে সুখে থাকে। এ-ব্যাপারে এ-ধরনের বিদ্যাদিগ্‌গজদের সঙ্গে তেমন তর্ক জুড়ে লাভ নেই। যেখানে ধর্মবিশ্বাস বা শ্রেণীস্বার্থ জড়িত, যুক্তির সেখানে আদৌ ঠাঁই নেই, ভূরি-ভূরি তথ্য পেশ ক'রেও সেখানে মত বা ধারণার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়।

মুশকিল হলো, আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য এই মার্কিন রাষ্ট্রদর্শনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, তাঁদের জীবনধারার আষ্টেপৃষ্ঠে জুড়ে ধনতন্ত্র সম্পর্কে আবিষ্ট মোহান্ধতা। এ হেন ব্যক্তিরা ইন্দিরা গান্ধির হত্যার অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ভীষণভাবে জিতে সরকারে সমাসীন হলেন। নির্বাচনে জেতাটা সেই বিশেষ অবস্থায় অত্যন্ত সহজে ঘটেছিল। এঁরা ভাবলেন, রাষ্ট্র চালানোও ঠিক অতটাই সহজ হবে। ১৯৮৪

লালের নির্বাচন সাফল্য জবাহরলাল নেহরু বা ইন্দিরা গান্ধির সাফল্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সুতরাং বিজয়ী মন্ত্রীরা ভাবলেন তাঁরা জবাহরলাল বা ইন্দিরার চেয়েও বড়ো নেতা, তাঁরা যা বলবেন, গোটা দেশের মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা-ই মেনে নেবে। মার্কিন রাষ্ট্রদর্শনে আবাল্য তাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁরা ভাবলেন মার্কিনি ধাঁচে এখন থেকে ভারতবর্ষকে গ'ড়ে-পিটে তুলবেন। বড়ো-বড়ো শিল্পপতি-ব্যবসায়ী-জমিদারদের শলা-পরামর্শ বাড়তি গুরুত্ব পেতে শুরু করলো, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শীর্ষে এই শ্রেণীর লোকদের এনে বসানো হলো, শ্রমিকদলন শুরু হলো নতুন উৎসাহে, শ্রীযুক্ত প্রধান মন্ত্রী স্থানে-অস্থানে ব'লে বেড়াতে শুরু করলেন যে-সব সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ভালো লাভ দেখাতে পারবে না, তাদের অচিরে হয় বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে, নয় তো কোনো বেসরকারি মালিকের কাছে বিক্রি ক'রে দেওয়া হবে। ধরাকে-সরা-জ্ঞান-করা প্রধান মন্ত্রীর হয়তো ঘটে বুদ্ধি একটু কম, তিনি সমাজতন্ত্র নিয়ে নানা তির্যক ব্যঙ্গবিস্তার আরম্ভ করলেন, ভাবটা এরকম, একবার কোনোক্রমে একবিংশতি শতাব্দীতে পৌঁছুই না কেন আমার সখাসহচর পরিবৃত হয়ে, ততদিনে তো দেশের আদল পাল্‌টে দেবো, যে-সব ভণ্ড সমাজতন্ত্র-ফমাজতন্ত্র গোছের তুকতাকের কথা বলে, তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো তখন।

গত কয়েক বছর ধ'রে এই উন্নাসিকতায় ভর ক'রে বড়োলোকের ঘরের সন্তানেরা দেশ শাসন করেছেন। স্বশ্রেণীভুক্তদের জন্য বাড়তি নানা সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন, গরিব-মধ্যবিত্তদের উপর বাড়তি নানা বোঝা চাপিয়েছেন। তাঁরা ভেবেই নিয়েছিলেন এমনি ক'রেই বাকি দিনগুলিও যাবে, তাঁরা নিশ্চিন্তে অনন্তকাল ধ'রে ভারতবর্ষের জনগণের উপর ডাণ্ডা ঘুরিয়ে যাবেন, মার্কিনি কায়দায় দেশের অর্থব্যবস্থাকে চালনা করবেন, বহু-বছরের-অধ্যবসায়ে-তিতিক্ষায়-গ'ড়ে-ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সর্বনাশ সাধন করবেন, সমাজতন্ত্রের ভূত চিরতরে দূর করবেন সাধারণ মানুষের মন থেকে। কিন্তু এ-বছরের গোড়া থেকে হিশেবে ভুল হ'তে শুরু হলো। রাজ্যের পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে দেশের অবুঝ নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত গ্রাম-শহরের মানুষগুলি প্রতিবাদের ঝড় তুললেন, কুটোর মতো ভেসে গেল শাসক দলের প্রার্থীরা। গোদের উপর বিষফোঁড়া, এখন নানা প্রমাণিত দুর্নীতির কলঙ্কে মসীলিপ্ত কেন্দ্রের মন্ত্রিসভা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হালে পানি পাচ্ছেন না। যে-সমাজতন্ত্র নিয়ে পুরো দুই বছর ধ'রে কৌতুকব্যঙ্গের অন্ত ছিল না, ভূতের মুখে রাম নামের মতো, হঠাৎ সেই সমাজতন্ত্রের স্তবগান আরম্ভ হয়েছে, তাতে যদি লোককে ভোলানো যায়। সাধ ক'রে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা

বলায়। শ্রীযুক্ত প্রধান মন্ত্রী এখন ফের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কৃতিত্বের-প্রশংসার আদিখ্যেতায় নেমে পড়েছেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য ইনিয়ে-বিনিয়ে ব্যক্ত করতে লেগেছেন, এমনই গুঁতোর মাহাত্ম্য।

কিন্তু এ-সব কিছুই তো ভড়ং, বিপদে প'ড়ে সাধারণ মানুষের পায়ে গিয়ে পড়া, তোমাদের ভুলিনি, ভুলবো না, তোমাদের জন্য সমাজতন্ত্র এনে হাজির করবো। আসল মানসিকতার তো কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়, তা হবে প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার, শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জনের সমার্থক। প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁর পারিষদবর্গ কখনোই তা হ'তে দিতে পারেন না। তা যে হ'তে দিতে পারেন না তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ মেলে নবম অর্থ কমিশনকে যে-নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে, তা থেকে। মন আর মুখে যে কত দুস্তর ব্যবধান, এই নির্দেশাবলী তার প্রমাণ বহন করছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সরকারি খাতে বিবিধ অপব্যয় নিয়ে ভাবিত। বাজে খরচ হ'তে দেওয়া নেই। তাই অর্থমন্ত্রক অর্থ কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন, সরকারি খাতে অপব্যয় কী ক'রে প্রশমিত হয় সে-সম্পর্কে যথাযোগ্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ যেন কমিশনের সিদ্ধান্তগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং কমিশন যাতে ঠিক-ঠিক সুপারিশ করে, বেলাইনে না চ'লে যায়, অর্থ মন্ত্রক একটি বাড়তি নির্দেশিকাও পাঠিয়েছেন বাজে খরচ কমাবার উপায় হিশেবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে, রাজ্যে-রাজ্যে মানুষ বন্যায় বিপন্ন হয়, গরিবের ঘরবাড়ি কুটোর মতো ভেসে যায়, ভেসে যায় পশুপ্রাণী, শস্যাদি প'চে যায়, মড়কের সম্ভাবনা দেখা দেয়, অথবা ভয়ংকরী খরায় রাজ্যের-পর-রাজ্য জ্ব'লে যায়, মাসের-পর-মাস ধ'রে অনাবৃষ্টি, সেচের অভাবে লক্ষ-কোটি বিঘা জমি অনাবাদী থাকে, পানীয় জলের জন্য হাহাকার, গরিবেরা অভুক্ত, দুর্ভিক্ষের উপান্তে, গবাদি পশুদের কাতারে-কাতারে না-খেয়ে মারা পড়ার উপক্রম, সরকারকে ত্রাণের উদ্যোগ নিতে হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে গরিব মানুষগুলিকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ন্যূনতম ব্যবস্থাদি গ্রহণ অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ে। বন্যাক্রান্তদের উদ্ধারের জন্য আশ্রয় শিবির খুলতে হয়, খাদ্য-পরিধেয়-ওমুধের ব্যবস্থা করতে হয়, বিপর্যস্ত রাস্তাঘাট-সাঁকো-বাঁধ পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হয়, জলনিকাশের জন্য আবশ্যিক আয়োজনের দিকে নজর দিতে হয়, ভেসে-যাওয়া ঘরবাড়ি ফের যাতে ভুক্তভোগী মানুষজন তুলতে পারেন তার জন্য টাকা পৌঁছে দিতে হয়, নতুন ক'রে ফসল বোনার জন্য, বীজশস্য-সার ইত্যাদির জন্য, অর্থ বরাদ্দ করতে হয়, এ-ধরনের আরো নানা খুঁটিনাটি দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর বর্তায়। যে-যে রাজ্য খরাপীড়িত,

সেখানেও রাজ্য সরকারের অনুরূপ দায়-দায়িত্ব পালনের স্বাভাবিক ভূমিকা। সাধারণ মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন দিনযাপনে সরকারকে বাদ দিয়েও চলতে পারেন, আমাদের মতো গরিব দেশে সরকারের কাছে তেমন-বেশি সাহায্য কেউই আশা করেন না, কিন্তু বিপদের মুহূর্তে সরকারি ভরসা সাহায্য ছাড়া এগোনো অসম্ভব। শহরের-গ্রামের-পাড়ার মানুষেরা অবশ্যই এগিয়ে আসেন দুর্গতদের সাহায্যকল্পে, গণ-আন্দোলনের কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন, একটু যাঁরা সচ্ছল, তাঁরাও সাধ্যমতো নানা সাহায্য নিয়ে কখনো-সখনো এগিয়ে আসেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থার উপরই প্রধানত ত্রাণের জন্য নির্ভর করতে হয়। বিপদের মুহূর্তে বিপন্নদের ঈষৎ পরিচর্যা সরকারের প্রধানতম কর্তব্য: আমাদের দেশে অন্তত এটা স্বতঃসিদ্ধতা ব'লে বিবেচিত।

কিন্তু বড়ো ঘরের সন্তানেরা এখন কেন্দ্রে সরকার চালাচ্ছেন, তাঁরা চালাক-চতুর নানা কথাবার্তা বলেন, আধুনিকতম প্রযুক্তির উপযোগিতা নিয়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা ফাঁদেন, একবিংশ শতাব্দীর স্বপ্ন তাঁদের চোখের অঞ্জন ছেয়ে, তাঁদের চিন্তাভাবনা এখন থেকে পুরোনো ধ্যানধারণাকে উল্‌টে দেবে। এখন পর্যন্ত যে-ব্যবস্থা স্বাধীনতার পর থেকে চ'লে এসেছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়হেতু সরকারি খাতে ত্রাণের জন্য যে-টাকা খরচ করা হয়ে থাকে, তার জোগান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে যৌথভাবে করতে হয়। একটি নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমা পর্যন্ত ত্রাণের খাতে রাজ্য সরকারের যে-অর্থব্যয়, তার অর্ধেক কেন্দ্রীয় সরকার দিতে বাধ্য। ত্রাণের ব্যয় এই ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম ক'রে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যবেক্ষক দল পাঠান, সেই দল বাড়তি খরচের হিশেব কষেন, সেই হিশেব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বাড়তি টাকা ত্রাণের উদ্দেশ্যে ধার দিয়ে থাকেন, সেই ধার পনেরো বছরের মধ্যে শতকরা নয় ভাগ সুদে রাজ্য সরকারকে ফেরত পাঠাতে হয়।

কিন্তু জীবনদর্শন ছায়া ফেলে। ত্রাণের অধিকাংশ টাকাই জোগাতে হয় রাজ্য সরকারকে, ঋণ হিশেবে কেন্দ্র যে-টাকা দিয়ে থাকেন তা সুদে-আসলে ফেরত দিতে হয়। হ'লে কী হবে, জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি তো এড়ানো সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হন দেশের গরিব মানুষগুলি, তাঁরা না খেতে পেয়ে মারা পড়েন, তাঁদের গোরু-ছাগল ধ্বংস হয়, তাঁদের মধ্যে মহামারীর প্রকোপ দেখা দেয়, তাঁদের ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে, তাঁদের মাঠের শস্য প'চে অথবা জ্ব'লে যায়। কিন্তু তাতে বড়োলোকদের কী, গরিবরা বিপন্ন ব'লেই সরকারকে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা খরচ করতে হবে, তা তো ঠিক নয়। বক্তৃতার ছলে মাঝে-মধ্যে একটু সমাজতন্ত্রের উল্লেখ

করা ঠিক আছে, কিন্তু তা ব'লে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া তো ঠিক নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে ত্রাণের প্রয়োজন একটু-আধটু হয়তো থাকে, কিন্তু তাতে সরকারকে জড়ানো কেন? সরকারের দায়-দায়িত্বের সীমা-পরিসীমা নেই, সরকারকে হাজারো খাতে কত টাকা খরচ করতে হচ্ছে, প্রতিরক্ষার খরচ আছে, গুপ্তচরবাহিনীর খরচ, মন্ত্রীদের বিলাসসফরের খরচ, বিভিন্ন উৎসবের খরচ, দূরদর্শনে নাম-তথ্য-তসবির মাহাত্ম্যপ্রচারের খরচ, ত্রাণের জন্য খরচের ঝামেলা আবার সরকারের উপর চাপানো কেন?

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সরকারি খাতে অপব্যয় রোধ করতে হবে, এবং ত্রাণের জন্য ব্যয় অন্যতম প্রধান অপব্যয়। অর্থমন্ত্রক তাই অর্থ কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা বিবেচনা ক'রে দেখুন, এখন থেকে ত্রাণের জন্য বরাদ্দ, অন্তত কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট থেকে, পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় কিনা। বরঞ্চ একটি জাতীয় বীমা ভাণ্ডের ব্যবস্থা করা হোক, প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার তাঁদের সংগৃহীত রাজস্বের একটি অংশ প্রতি বছর এই বীমা ভাণ্ডে জমা দেবেন। ত্রাণের টাকা জোগানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর কোনো দায় থাকবে না, কেন্দ্র বীমা ভাণ্ডে একটি কানাকড়িও দেবেন না, ভাণ্ডটি একমাত্র রাজ্য সরকারদের দেওয়া টাকা থেকেই ভরাট করা হবে। খুবই যুক্তিযুক্ত কথা এটা, কেন্দ্রে তো আর খরা বা বন্যা হয় না, সুতরাং কেন্দ্র কেন ত্রাণের টাকা দেবে: প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে রাজ্যে-রাজ্যে, সুতরাং রাজ্য সরকারগুলিরই তো উচিত ত্রাণের টাকার ব্যবস্থা করা।

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক মার্কিন দর্শনে পুরোপুরি মজেছেন। এখন থেকে ত্রাণব্যবস্থা হবে ফেলো-কড়ি-মাখো-তেল নীতি-অনুযায়ী। যেই রাজ্য সরকার জাতীয় বিপদ বীমা ভাণ্ডে বেশি টাকা দেবেন, ত্রাণের সময় তাঁরা বেশি টাকা পাবেন। যে-রাজ্য সরকারের অত টাকা জমা দেওয়ার সামর্থ্য নেই, কী আর করা যাবে, প্রলয়ংকর বন্যা হ'লেও তাঁরা বীমাভাণ্ড থেকে কম হারে সাহায্য পাবেন, মানুষজন যদি না-খেয়ে মারাও পড়ে, কী আর করা, মহামারীতে যদি লক্ষ-লক্ষ গ্রাম-শহর-বাসীর জীবনসংশয়ও হয়, কী আর করা, যদি রাস্তাঘাট-সাঁকো-পয়ঃপ্রণালী-বাঁধ ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েও থাকে, কী আর করা।

দেশের দুর্দিন, অপব্যয় রুখতে হবে। বিগত জুন মাসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক থেকে অর্থ কমিশনের কাছে নির্দেশ গেছে, খোদ প্রধান মন্ত্রী তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন। দেশে সমাজতন্ত্র আসতে আর বাকি নেই।

## ঘটিবাটি বন্ধ ক'রে দেবেন ?

কলকাতায় সাত-সাতজন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সভা করলেন, সম্মিলিত প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নানাবিধ অনাচার, দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হলেন। এঁদের বড়ো বাড় বেড়েছে, কংগ্রেসী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মতো বশংবদ না এঁদের আলাপ-আচরণ, এঁদের বলাই চলে দেশদ্রোহী, কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে যারাই ট্যাঁ-ফোঁ করে, কে না জানে, তারা সবাই দেশদ্রোহী, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই দেশদ্রোহিতা। এই সব দেশদ্রোহী মুখ্যমন্ত্রীদের একটু বুঝিয়ে দিতে হবে আমাদের জমিদারিতে বাস ক'রে আমাদের চোখ-রাঙানো চলবে না, ঘটিবাটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে ওঁদের।

মুখে তড়পাচ্ছেন প্রধান মন্ত্রী, কিন্তু মনে-মনে তিনি নিজেও জানেন তেমন বেশি কিছু করবার মতো কব্‌জির জোর তাঁর নেই, দেশের সর্বত্র তাঁর ও তাঁর দলের অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ সংঘবদ্ধ হচ্ছেন, কোনো অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একটু বাড়াবাড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করলে দেশ জুড়ে আগুন জলবে। কিন্তু চিমটি কাটতে তো অসুবিধা নেই। তাই পশ্চিম বঙ্গে মাঝে-মধ্যে ঘিসিঙবাবুকে একটু চোখ টিপে দেওয়া হয়, ত্রিপুরায় উপজাতি সমিতির গোপন সাকরেদদের উসকে দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অন্ধ্র প্রদেশে পাঠিয়ে আমলাদের চোখ রাঙিয়ে বলা হয়, খবরদার, দিল্লির হুকুম যদি তামিল না করো, তোমাদের গর্দান যাবে; কর্ণাটকে ব্যাঙ্ক ঋণমেলার অছিলায় লোক-খ্যাপানো হরিলুটের ব্যবস্থা করা হয়। এবং, সব শেষে, গত সপ্তাহে কেরল সরকারের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফ্‌ট দেওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের বড্ড বাড় বেড়েছে, তাঁরা একত্র হয়ে হম্বিতম্বি শুরু করেছেন, তাঁদের টিকি যে দিল্লির সরকারের কাছে বাঁধা তা একটু বুঝিয়ে দিতে হবে, কেরলকে দিয়ে শুরু করা যাক, ওদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাওয়া বন্ধ ক'রে দাও।

স্বৈরাচারীদের চোখের চামড়া অবশ্য থাকে না, চোখের চামড়া থাকলে স্বৈরাচারী হওয়া যায় না। বর্তমান বছরে কেন্দ্রীয় আয়-ব্যয়ের হিশেবে দশ

হাজার কোটি টাকার মতো ঘাটতি চলছে, এই ঘাটতি মেটাবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর হুকুম জারি ক'রে দশ হাজার কোটি টাকার বাড়তি নোট ছাপিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার দশ হাজার কোটি টাকার ঋণ নিলে তাতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু কেরল সরকারের পঁচিশ কোটি টাকার ঋণও বরদাস্ত করা হবে না, ওটা যে অকংগ্রেসী সরকার ; নিজের বেলা আঁটিসাঁটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি। স্বৈরাচার কী, অনেক সময় মস্ত প্রবন্ধ ফেঁদে বোঝাবার চেষ্টা করি আমরা। বিস্তৃত ব্যাখ্যার অথচ কোনো প্রয়োজনই নেই, কেরল সরকারকে টাকা-দেওয়া বন্ধ করা থেকেই স্বৈরাচারের যথার্থ রূপ আমাদের সামনে অতি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

টাকার ঘাটতি পড়লে কেন্দ্রীয় সরকার নোট ছাপাতে পারেন. রাজ্য সরকারেরা পারেন না, তাঁরা বড়ো জোর দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, দ্বারস্থ হ'তে পারেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সাময়িকভাবে কিছু ঋণ চাইতে পারেন, যাকে বলা হয় ওভারড্রাফ্‌ট। প্রত্যেক রাজ্য সরকারের টাকাকড়ি-হিশেবপত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে, অসুবিধায় পড়লে সেই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে একটু-আধটু বাড়তি টাকা চাইবার হক নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারগুলির আছে। কিন্তু এই অধিকারেও কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ ক'রে বসেছেন। কোন্ রাজ্য সরকার কত ওভারড্রাফ্‌ট পেতে পারেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে, প্রত্যেকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে তা ছক কেটে ব'লে দেওয়া হয়েছে, প্রায় লক্ষ্মণ-গণ্ডির মতো ব্যাপার, পেরোবার উপায় নেই। পেরোলেই গর্দান যাবে, টাকা বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার নিজে কিন্তু স্বাধীন মুক্তপুরুষ, দশ-কুড়ি-তিরিশ হাজার কোটি টাকার—কিংবা তারও বেশি—নোট ছাপিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যথেচ্ছ ধার নেবার অধিকার তাঁর বাঁধাবন্ধহীন।

তাছাড়া, যে-রাজ্য সরকারকে না-পছন্দ, তাকে বেকায়দায় ফেলা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অতীব সোজা। সংবিধানের নির্দেশ-অনুযায়ী প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার আয়কর এবং অন্তঃশুল্ক থেকে সংগৃহীত রাজস্বের ভাগ পেয়ে থাকেন। যোজনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সূত্র-অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলির প্রতি বছর পরিকল্পনা সাহায্যও প্রাপ্য। এবং, ফের সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ীই, কোনো-কোনো রাজ্য জাতীয় তহবিল থেকে বিশেষ নানা অনুদান পেয়ে থাকেন, বিভিন্ন অনুদানের পরিমাণ অর্থ কমিশন থেকে স্থির ক'রে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জাতীয় তহবিলের পুরো টাকাই কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে মজুত

রাখার রেওয়াজ। আয়কর-অন্তঃশুল্ক বাবদ যে-টাকা জমা পড়ে, তা-ও কেন্দ্রের কাছেই গচ্ছিত থাকে, এবং কিস্তিতে-কিস্তিতে তা রাজ্য সরকারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। কোনো আইনগত বিধান নেই, স্রেফ রীতি-অনুযায়ী, কেন্দ্র কিস্তির টাকা রাজ্যদের দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাজ্য সরকারের তহবিলে জমা ক'রে দেন। অন্য পক্ষে রাজ্য সরকারেরও কেন্দ্রের কাছে কিছু টাকা দেয় থাকে, যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অতীতে-ধার-করা ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ কিস্তিবন্দি হিশেবে, কিংবা হয়তো রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষদ কেন্দ্রীয় সংস্থা কোল ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে কয়লা কিনেছে, তার দাম মেটানো বাবদ।

এখন ধরুন প্রধান মন্ত্রীর সরকার কোনো রাজ্য সরকার সম্পর্কে মনস্থির করেছেন, ওকে দেখতে নারি, ওর চলন বাঁকা. ঐ রাজ্য সরকারকে একটু জব্দ করতে হবে। উপায় ভারি সোজা। ঐ রাজ্যের প্রাপ্য কিস্তির টাকা, তা আয়কর-অন্তঃ-শুল্কের ভাগই হোক, অর্থ কমিশন-নির্ধারিত অনুদানই হোক, বা পরিকল্পনা সাহায্যই হোক, চেপে দাও, কোনো ছুতো তুলে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য টাকা জমা দিতে দেরি করো, রীতি-নীতি যা-ই হোক না কেন। সেই সঙ্গে, আরো-একটু রগড় করো: কয়লার দাম বাবদ কোল ইণ্ডিয়া ঐ রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছ থেকে যে-টাকা পাবে, বলাকওয়া নেই, সেটা কেটে নাও, কিংবা কোনো পুরোনো ঋণের আসল বা সুদবাবদ যে-অর্থ কেন্দ্রের প্রাপ্য আজ থেকে তিন মাস বাদে, আজই তা দাবি ক'রে বসো, দাবি ক'রে ব'সে রাজ্যকে যে-পরিমাণ টাকা ছাড়ার কথা, তা থেকে বাদ দিয়ে দাও। এ-রকম ক'রে যেতে পারলে রাজ্য সরকারটি গভীর গাড্ডায় পড়বেন, খরচপাতি মেটাতে হিমশিম হবেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তার তহবিল শূন্যে গিয়ে ঠেকবে, বাধ্য হয়ে তাঁকে তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ওভারড্রাফ্‌ট চাইতে হবে, তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের সেই অনুরোধ সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, অর্থাৎ রাজ্য সরকারকে টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রে দেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

যেমন করা হয়েছে গত সপ্তাহে কেরল সরকারের ক্ষেত্রে, যেমন করা হয়েছিল বছর কয়েক আগে পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রেও। প্রধান মন্ত্রী একটু নাক ঘ'ষে দিতে চান দুর্বিনীত রাজ্য সরকারগুলির। বড়োদিনের ছুটি সামনে, সরকারি কর্মচারী-শিক্ষক-হাসপাতাল কর্মী-পরিবহণ কর্মী ইত্যাদি সবাইকে বড়োদিনের আগে মাইনেপত্তর দিতে চূড়ান্ত অসুবিধায় পড়বেন রাজ্য সরকার, প্রধানমন্ত্রীর তাতে বিমল আনন্দ হবে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে কেরলের মানুষ ঐ রাজ্য থেকে প্রধান মন্ত্রীর দলকে উৎখাত করেছেন, কিন্তু যাঁদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে স্বৈরাচারের উন্মাদনা, তাঁদের পক্ষে

জনগণের রায় বরদাস্ত করা বড়ো কঠিন। অতএব কেরলের মানুষদের একটু চিমটি কাটো, জনগণ-কর্তৃক নির্বাচিত সরকারকে একটু অপদস্থ করো, কেন্দ্রের সঙ্গে টক্কর লাগাতে এলে তার কী পরিণাম তা এদের একটু নাকে ঝামা ঘ'ষে বুঝিয়ে দাও।

কেরল সরকার সাময়িক সংকট অবশ্য ইতিমধ্যে সামলে উঠেছেন। কিন্তু বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর জমানায় এই ধরনের অভব্য আচরণের পুনরাবৃত্তি হ'তে বাধ্য। গত সপ্তাহে কেরল সরকারকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা হয়েছে, কয়েক সপ্তাহ বাদে হয়তো কর্ণাটক বা অন্ধ্র সরকারকে করা হবে অনুরূপ উপায়ে, কিংবা. কে জানে, ঐ রাজ্যে যেহেতু নির্বাচন অত্যাসন্ন, ত্রিপুরার সরকারকে। কেন্দ্রের ব্যবহারে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে না, প্রধান মন্ত্রী এবং সাধারণভাবে শাসক-শ্রেণী সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যে জনবিক্ষোভ গভীরতর হবে, কিন্তু সে-সব নিয়ে নতুন দিল্লির শাসককুল আদৌ ভাবিত ব'লে মনে হয় না, অন্যভক্ষ-ধনুর্গুণঃ-দর্শনে তাঁরা বিশ্বাস আরোপ করেছেন, একটা-দুটো চিমটি-খামচি কেটে সাময়িক যে-বাড়তি আনন্দ এই মুহূর্তে তাঁরা উপভোগ করতে পারছেন, তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট, জাতীয় সংহতির মতো গুরুগম্ভীর বিষয় তাঁদের চিন্তা-ভাবনার গণ্ডির বাইরে। কিন্তু যেখানে কেন্দ্র সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করছেন, জাতির সামগ্রিক স্বার্থে, জাতীয় ঐক্য অটুট রাখবার তাগিদে, রাজ্য সরকারগুলিকেই সেখানে এগিয়ে আসতে হবে। কেন্দ্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে, জাতীয় স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। হঠাৎ টাকা বন্ধ ক'রে দিয়ে ভবিষ্যতে কেন্দ্র যাতে কোনো রাজ্যকে অসুবিধায় ফেলতে সমর্থ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়া মনে হয় একান্ত প্রয়োজন। এই বোঝাপড়ার অঙ্গ হিশেবে ঘোষণা করা যেতে পারে, এখন থেকে ওভারড্রাফ্‌টের উর্ধ্বসীমা অতিক্রমের অভিযোগে কোনো রাজ্য সরকারকে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রে দেয়, সঙ্গে-সঙ্গে অন্য অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলি সবাই মিলে সেই রাজ্যকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিনা সুদে টাকা ধার দেবেন, যতদিন পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার নির্দেশ তুলে না নিচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই ধারের টাকা ফেরত চাওয়া হবে না। কেরলের মানুষ মুশকিলে পড়লে তাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন পশ্চিম বঙ্গ-কর্ণাটক-অন্ধ্র প্রদেশ-অসম-ত্রিপুরার মানুষ, পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ মুশকিলে পড়লে তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবেন কেরল-কর্ণাটক-অন্ধ্র প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের মানুষ, অন্ধ্র প্রদেশ বিপদে পড়লেও অনুরূপ ব্যবস্থা, যদি কর্ণাটককে জব্দ করার চেষ্টা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে

তা হ'লেও তাই। কেন্দ্রীয় সরকারের অমানবিক আচরণের যোগ্য প্রত্যুত্তর এই পারস্পরিক-কাছে-আসার মধ্য দিয়েই দিতে হবে। তাতে প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর পারিষদদের হয়তো তেমন লজ্জাবোধ হবে না, কিন্তু সম্ভবত চৈতন্যোদয় হবে যে এ-ধরনের নোংরামি আখেবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের কেন্দ্রের প্রতি আরো বেশি বিদ্বিষ্ট ক'রে তুলবে।

পঁচিশ কোটি টাকার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেরল সরকারের চেক বন্ধ ক'রে দিল। দু'সপ্তাহ আগে অন্য যে-ছয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীবৃন্দ কলকাতায় মিলিত হয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে অতি স্বচ্ছন্দে নিজেদের ভাণ্ড থেকে সাময়িকভাবে এই পঁচিশ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো। যদি এখন থেকে কেন্দ্রকে জানিয়ে দেওয়া যায়, নতুন দিল্লির হুমকির কাছে মাথা নত করবেন না রাজ্য সরকারেরা, কোনো-এক রাজ্য সরকারের টাকা বন্ধ করলে অন্য রাজ্য সরকাররা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, তা হ'লে হয়তো নতুন দিল্লির কর্তাব্যক্তিরা একটু সংযত হ'তে শিখবেন।

সেই সঙ্গে মনে হয় অন্য-একটি ব্যাপারেও মুখ্যমন্ত্রীদের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের সময় হয়েছে। আয়কর ও অন্তঃশুল্ক থেকে সংগৃহীত রাজস্বের যে-অংশ রাজ্যগুলির প্রাপ্য, তার উপর খবরদারি করার কোনো অধিকার কেন্দ্রের নেই। সংবিধানের নির্দেশে সেই রাজস্ব রাজ্যগুলির কাছে আসছে, কেন্দ্রর দয়ায় নয়। অথচ রাজস্বের সেই টাকা প্রথম দফায় পুরোটা জমা পড়ছে জাতীয় তহবিলে, এবং কেন্দ্রের খেয়াল-খুশি মতো তা রাজ্যগুলিকে দেওয়া হচ্ছে, কখনো আদৌ দেওয়া হচ্ছে না, অথবা অনেক দেরি ক'রে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীরা অত্যন্ত যুক্তির সঙ্গেই এই দাবি করতে পারেন, সংগৃহীত রাজস্বের যে-অংশে রাজ্যগুলির অধিকার, তা আলাদা একটি বিশেষ তহবিলে জমা দেওয়া হোক এখন থেকে, বিশেষ তহবিলের উপর কেন্দ্রের কর্তালি করার কোনো সুযোগ থাকবে না, রাষ্ট্রর যিনি প্রধান হিশেব-রক্ষক, সংবিধানে যাঁর ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা আছে, সেই কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল এই তহবিলের দায়-দায়িত্বে থাকবেন, যেই রাজ্যকে যখন যা দেয়, তিনিই তদনুযায়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। অবশ্য মোহ থাকা উচিত নয়, দাবি পেশ করলেই কেন্দ্রীয় সরকার সুবোধ বালকের মতো মেনে নেবেন, তা অবশ্য হবার নয়, কিন্তু রাজ্যে-রাজ্যে যদি আলোড়ন সৃষ্টি করা যায়, সর্বস্তরের মানুষকে বোঝানো যায় কোন্ কাঠি কোথায় কে কীভাবে নাড়িয়ে থাকেন, প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছুটা পিছু হঠতে অবশ্যই বাধ্য হবেন, এই ওভারড্রাফ্‌ট-ওভার-ড্রাফ্‌ট খেলার রঙ্গ ভঙ্গ হবে তখন।

## জ্বালানির মতো জ্বলুন !

নতুন বিধান সভা বসেছে। কংগ্রেসীরা এবার আরো-একটু কমজোরি, কিন্তু বিরাজ করছেন, বিরোধী দল হিশেবে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার জাহির করছেন। এক কংগ্রেসী সদস্য, কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন বেশ কয়েক বছর, বিলাপ করলেন ক'দিন আগে পশ্চিম বঙ্গে শিল্পের তুলনামূলক অধোগতির কথা উল্লেখ ক'রে। দাক্ষিণাত্য-মহারাষ্ট্র-গুজরাট শিল্পেব ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের রাজ্যে তুলনায় সব-কিছু ম্রিয়মাণ। এই দুরবস্থা দেখে একজন বাঙালি হিশেবে ওঁর নাকি লজ্জা-বোধ হয়।

পাপবোধ হয় না ? কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, নিরক্ষর তো বলা যাবে না তাঁকে। মন্ত্রী থাকাকালীন মাশুল সমীকরণ নীতি নিয়ে সামান্যতম প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছেন, পশ্চিম বঙ্গে কেন্দ্রীয় বিনিয়োগ কেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে তা নিয়ে এমনকি অর্ধস্ফুট প্রশ্নও রেখেছেন, কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি পশ্চিম বঙ্গ তথা পূর্বাঞ্চলে টাকা খাটাতে কেন এত অনাসক্ত সে-বিষয়ে কোনো হাল্কা উদ্বেগও কোনোদিন প্রকাশ করেছেন, যোজনাক্ষেত্রে গড প্রতি কেন্দ্রীয় সাহায্য বছরের-পর-বছর ধ'রে পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম কোন্ আশ্চয বিচারের নির্ভরে, এমনকি চুপি-চুপিও নিজেদের মধ্যে কখনো আলোচনা করেছেন ? কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি অধিষ্ঠিত দুই সংস্থা, তুলো কর্পোরেশন এবং পাট কর্পোরেশন, উভয়ের আপাতউদ্দেশ্য এক : কী ক'রে উৎপন্ন পণ্যের জন্য ন্যায্য দাম কৃষকদের পৌঁছে দেওয়া যায়, কী ক'রে অধিক ফলনের বছর মূল্যহ্রাস-জনিত বিপদের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করা সম্ভব। উভয় ক্ষেত্রেই সরকার কর্তৃক সহায়ক মূল্য ঘোষণার ব্যবস্থা আছে, এবং ঢক্কানিনাদসহকারে নীতি বিঘোষিত যে বাজারে দাম হু-হু ক'রে নিচে নামবার উপক্রম দেখা দিলে উভয় পণ্যের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা—তুলোর ক্ষেত্রে তুলো কর্পোরেশন, পাটের ক্ষেত্রে পাট কর্পো-রেশন—নির্ধারিত সহায়ক মূল্যে তুলো বা পাট কেনবার ব্যবস্থা করবেন, সাধারণ কৃষক-গরিব কৃষক সর্বনাশের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন। কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল। একাদিক্রমে বহু বছর ধ'রে তুলো কর্পোরেশন নির্ধারিত সহায়ক মূল্যের

দ্বিগুণ-তিনগুণ বেশি দাম দিয়ে গুজরাটে-মহারাষ্ট্রে-মধ্য প্রদেশে ধনী কৃষককুলকে খুশি রাখবার তাগিদে তুলো কিনে গেছেন। অন্য পক্ষে, পাটের দাম এমনকি সহায়ক মূল্যেরও অনেক নিচে নেমে গেছে, বিহার-উড়িষ্যা-পশ্চিম বঙ্গ-অসমের সহায়সম্বল-হীন গরিব চাষীরা সমূহ বিপদের মুখোমুখি, কিন্তু, বছরের-পর-বছর গড়িয়ে গেছে, পাট কর্পোরেশন নিরাসক্ত বৈরাগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যিনি কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন, খোদ বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন, তিনি জানেন না এই কাহিনী? তাঁর মন্ত্রকের নির্দেশেই কি এ-ধরনের ঘটনাবলী ঘটানো হয়নি? এবং কাদের স্বার্থে এবংবিধ দ্বিরাচারী নীতি, তা-ও কি তাঁর অজানা? মনের অগোচরে অবশ্য পাপ নেই, কিন্তু মনের গোচরে যা, পাপবোধহীনতার আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে তাকেও বোধহয় এড়িয়ে যাওয়া যায়। কে জানে, এই প্রজ্ঞারই হয়তো অপর নাম উচ্চতর দর্শন।

পটভূমিকা মাঝে-মাঝে পাল্টায়, কিন্তু অভিনয়দর্পণে অন্য-কোনো ইতর-বিশেষ ঘটে না। আপাতত ফলাও ক'রে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, পাটশিল্পের পুনর্গঠন-আধুনিকীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় আর্থিক সংস্থাদি মারফত দেড়শো না আড়াইশো কোটি টাকা পাটের মালিকদের পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এটা চলিত ভাষায় যাকে বলা হয় আপসে রসিকতা। মালিকরা পাটশিল্পকে শোষণ ক'রে-ক'রে শুধু ছিবেড়েটা ফেলে রেখেছেন, এখন তাঁরা অন্যত্র পরিভ্রমণে যাবেন, এই শিল্পের নবীকরণ-আধুনিকীকরণ ইত্যাদিতে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সুতরাং যে-টাকার কথা বলা হয়েছে, তা অব্যবহৃতই থাকবে। অথচ যে-মুহূর্তে বলা হলো, এভাবে তো চলতে পারে না, লক্ষ-লক্ষ শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের ভাগ্য জড়িত পাটশিল্পের সঙ্গে, এই শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হোক, তারপর রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হোক, কেন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক সরকার ক্ষেপে আগুন, তাঁরা রেগান সাহেবের কাছ থেকে অর্থশাস্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁদের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাঁরা পাট শিল্পের জাতীয়করণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। শ্রেণীস্বার্থযুক্ত নাড়ির টানের তুলনা নেই।

পাট শিল্প না হয় পুরোনো কাসুন্দি, কংগ্রেসি পণ্ডিতজনরা সম্ভবত বলবেন ইতিহাসের অমোঘ বিধানে পৃথিবীতে এই শিল্পের দিন শেষ হয়ে আসছে, এবার অন্য দিকে মুখ ফেরাতে হবে। ইস্পাত ও ইস্পাতভিত্তিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকল্প স্বপ্ন স্বাধীনতার আগে থেকেই এই অঞ্চলের মানুষ দেখতে শুরু করেছিলেন। আকাশকুসুম রচনা নয়, সেই স্বপ্নের বাস্তব ভিত্তি ছিল : পশ্চিম বঙ্গে এবং আশে-পাশে প্রভূত খনিজ সম্পদ, লোহা, সেই সঙ্গে কয়লা, কয়লাতে লোহা গালিয়ে

ইস্পাত, সেই ইস্পাত পিটিয়ে হাজারো যন্ত্রপাতি-কল-সরঞ্জাম। ভৌগোলিক কিছু সুবিধা পশ্চিম বঙ্গের ছিল, ইস্পাত তথা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে ; গড়পড়তা উৎপাদনব্যয়ে আমাদের সঙ্গে অন্য-কারো পাল্লা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল অতি সংকীর্ণ। সস্তা কয়লা, সস্তা ইস্পাত, সস্তায় যন্ত্রপাতি তৈরি, যে-যন্ত্রপাতি সারা দেশে এবং বিদেশেও বিকোবে, শিল্পের প্রসার ঘটবে, আমাদের ছেলে-মেয়েরা কাজ পাবে, দেশের সামাজিক কাঠামো যতদিন পুরোপুরি বদল না হচ্ছে কোনো অমরাবতী তৈরি হবে না, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গেও কিয়ৎ পরিমাণে নতুন শিল্পের পত্তন হবে, কর্মহীনতাজনিত সংকটের সামান্য কিছু উপশমের সম্ভাবনা থাকবে। কেন্দ্রের দয়ালু সরকার মাশুল সমীকরণ নীতি প্রবর্তন ক'রে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে সে-সম্ভাবনার গুড়ে বালি ঢাললেন, ফতোয়া জারি ক'রে সারা দেশে লোহা ও ইস্পাতের দাম এক ক'রে দেওয়া হলো, রেলের ক্ষেত্রে এমন-এক মাশুল নীতি চালু করলেন যার ফলে পশ্চিম বঙ্গের কয়লা আসানসোল, দুর্গাপুর, হলদিয়া, খড়্গপুরে যে-দামে বিকোয়, তার চেয়ে কম দামে নাসিক বা আমেদাবাদ বা চণ্ডীগড়ে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো। অর্থাৎ আমাদের ভৌগোলিক সুবিধাটি কেড়ে নেওয়া হলো, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে আমাদের আপেক্ষিক আর্থিক সুবিধাটিও সেই সঙ্গে। যুক্তি দাঁড় করানো হলো, শুধু পূর্বাঞ্চলে কেন, দেশের সর্বত্র ইস্পাত-ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গ'ড়ে তোলা প্রয়োজন সুষমাযুক্ত উন্নতির স্বার্থে, পশ্চিম বঙ্গসহ এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিকে তাই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যুক্তিতে ক্রটি নেই, সত্যিই তো, শুধু আমাদের এখানে কেন, সারা দেশেই সমান তালে শিল্পোৎপাদন ঘটুক, তার জন্য যদি কিছু ত্যাগ করতে হয়, এই রাজ্যের মানুষরা নিশ্চয়ই তা খুশি মনে মেনে নেবে। কিন্তু যে-প্রশ্ন পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা গত তিন দশক ধ'রে ক'রে আসছেন, তার উত্তর মেলেনি। মাশুল সমীকরণ কি শুধু কয়লা-লোহা-ইস্পাতের ক্ষেত্রেই হবে, অন্য উপাদানের বা কাঁচামালের ক্ষেত্রে হবে না, রাসায়নিক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে হবে না, আমাদের কয়লা-লোহা-ইস্পাত একই দামে পশ্চিম-উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে যাচ্ছে, তা হ'লে ওখানকার তুলো কিংবা প্রাকৃতিক গ্যাস কেন আমরাও ওখানকার দামেই এখানে পাবো না ?

ইতিমধ্যে অনেক কমিটি বসেছে, অনেক রিপোর্ট তৈরি হয়েছে, কয়লা-লোহা-ইস্পাতের মাশুল সমীকরণের একচক্ষু নীতি অবৈজ্ঞানিক তা মেনে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখানেও ইতিহাসের দোহাই টানছেন। সস্তায় লোহা-কয়লা ইস্পাত পেয়ে দেশের নানা জায়গায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গ'ড়ে উঠেছে, এখন

হঠাৎ ঐ নীতি পরিবর্তন করলে ওদের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা দেখা দেবে, সেটা কি শিষ্টাচার হবে ? পূর্বাঞ্চলের প্রতি যে অনিষ্টাচার হচ্ছে, মাশুল সমীকরণ নীতির একপেশে প্রয়োগের ফলে আমাদের এখানে যে শিল্পপ্রসার তথা কর্মসংস্থান ভয়ংকররকম ব্যাহত, তা নিয়ে কিন্তু কারো মাথাব্যথা নেই। এখন বলা হচ্ছে বড়ো জটিল সমস্যা, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে বিবেচিত হোক। পরিষদে বশংবদ কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীরা প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে হাত তুলবেন, তাই আগে থেকেই ব'লে দেওয়া চলে, সিদ্ধান্ত হবে, উঁহু, উক্ত নীতি পাল্টানো সম্ভব নয়, সেটা শিষ্টাচারবহির্ভূত হবে। নাকের ডগায় একটি বিষফোঁড়া উঠেছে, বেচারা এতদিন ধ'রে এত কষ্ট ক'রে বড়ো হয়েছে, এখন ওটাকে কেটে বাদ দেওয়া ঠিক ভদ্রতা হবে না।

সুতরাং পশ্চিম বঙ্গ ধুঁকুক। এই রাজ্য থেকে মাঝে-মধ্যে একজন-দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যান, টেঁকেন না খুব বেশিদিন কেউই, পছন্দ না হ'লেই তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু গোলামিকে যাঁরা জীবনের ব্রত হিশেবে গ্রহণ করেছেন এ-ধরনের বিপদের ঝুঁকি তাঁদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, আগে-কে-বা-প্রাণ-করিবেক-দান মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁরা প্রভুর সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করেন। এবং স্থূলে ভুল নেই, ভুলেও তাঁরা পশ্চিম বঙ্গের কোনো সমস্যা নিয়ে মুখ খোলেন না। কিছুদিন আগে পশ্চিম বঙ্গ থেকে এক কেউকেটা রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের যে-জাদুযুক্ত মাশুল পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গের কয়লা কোডাইকানালে আসানসোলের চেয়ে কম দামে পাওয়া যায়, তার গায়ে তিনি আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে রাজি হননি, সে রকম কোনো মূর্খ সাহস তিনি দেখাবারও চেষ্টা করেননি কোনোদিন। আর একজন খলিফা ব্যক্তি, এই পশ্চিম বঙ্গ থেকেই খোদ অর্থমন্ত্রী ব'নে গিয়েছিলেন পর্যন্ত, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আরোহণ-অবরোহণ দুটোই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হ'তে পারে। এই ভদ্রলোকটি আপাতত কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত, তবে জনশ্রুতি বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ-ঘটিত ডামাডোলের বাজারে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের লৌহ-ইস্পাত ইত্যাদির মাশুল সমীকরণসহ সমগ্র মূল্যনীতি পরিবর্তন-সংশোধনের সুযোগ তাঁর ছিল, কিন্তু, ওরে বাবা, তার ধার-কাছ দিয়েও যাননি তিনি। বরঞ্চ, বছর তিনেক আগে পাটনাতে সদম্ভ তিনি ঘোষণা করেছিলেন : বর্তমান মাশুল সমীকরণ নীতি চালু থাকছে, চালু থাকবে, বিহার-পশ্চিম বঙ্গ যদি তাতে ক'রে প'ড়ে-প'ড়ে মার খায় খাবে, তাঁর কিছু করবার নেই।

তা হ'লেও কংগ্রেসী বিধায়করা বিধান সভায় কেঁদে নদী হয়ে যাচ্ছেন, পশ্চিম

বঙ্গে শিল্পবিকাশ হচ্ছে না সেই শোকে। তাঁরা একটা কাজ করুন না কেন? প্রধান মন্ত্রী এই রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে গভীর ব্যঙ্গের সঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন জ্যোতি বসুর মতো অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অন্তত জানা নেই, এই মুখ্যমন্ত্রীটি এমনকি নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের জন্যই কিছু করেননি, রাজ্যের স্বার্থ দেখা এঁর কম্মো নয়। যেটা প্রধান মন্ত্রী বলেননি, বলতে তাঁর বিনয়ে বেধেছিল, অপর পক্ষে তিনি নিজে তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র অমেথির জন্য কত-কিছু করেছেন, প্রায় সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন আমেথিকে। উদাহরণত, পাঁচ-সাত-দশ হাজার কোটি টাকা খরচ ক'রে গুজরাট থেকে পাইপ টেনে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমেথিতে, এই গ্যাস থেকে ওখানে মস্ত বড়ো সারের কারখানা তৈরি হবে, টাকার জন্য ভাবনা নেই, খোদ প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্রে টাকার জন্য, সামান্য দশ হাজার কোটি টাকার জন্য, কাজ আটকে থাকবে না।

তা এই রাজ্যের কংগ্রেসি বিধায়করা এক কাজ করুন না কেন? হলদিয়ায় আমরা যে-পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা স্থাপন করতে চাইছি, তার অনুমতি দিতে কেন্দ্রীয় সরকার নানা টালবাহানা করছেন, বলছেন আমাদের প্রস্তাবিত কারখানার জন্য প্রস্তাবিত উপাদান নাপথা, কিন্তু এই উপাদান ব্যবহার করলে উৎপাদন ব্যয় বেশি হবে; দেশের পশ্চিমাঞ্চলে যে-পেট্রোকেমিক্যাল কারখানাগুলি আছে তাদের উপাদান প্রাকৃতিক গ্যাস, তাতে খরচ অনেক কম পড়ে; সুতরাং আমাদের কারখানা ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে না। বেশ তো, ঐ প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র আমেথির দেখাদেখি, কংগ্রেসী বিধায়করা নতুন দিল্লিতে ব'লে-ক'য়ে গুজরাট থেকে পশ্চিম বঙ্গ পর্যন্ত পাইপ টেনে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে আসার বন্দোবস্ত ক'রে দিন না কেন, তা হ'লে আমরাও আমাদের পেট্রোকেমিক্যাল কারখানায় গ্যাস ব্যবহার করতে পারি, যার ফলে প্রতিযোগিতায় আমরাও দাঁড়িয়ে যেতে পারবো। তা ছাড়া, যেহেতু আমাদের পূর্বাঞ্চলের কয়লা পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সমান দামে বিক্রি হচ্ছে, পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক গ্যাসও ধ'রেই নেওয়া যেতে পারে, অনুরূপ একই দামে আমাদের কাছে বিক্রি করা হবে। কয়লাও জ্বালানি। সুতরাং মূল্যনির্ধারণের ব্যাপারে হেরফের হওয়া তো উচিত নয়।

কংগ্রেসি বিধায়কদের কাছে আবেদন রাখছি: পশ্চিম বঙ্গে শিল্পে জোয়ার আনার জন্য আপনারা অঙ্গীকারবদ্ধ, সেই অঙ্গীকারের মর্যাদা রাখুন, আপনারা জ্বালানির মতো জ্ব'লে উঠুন!

# অনন্তকাল যা চলতে পারে না

হঠাৎ অনেক সংস্কৃত কথা শোনা যাচ্ছে, সংবিধানের পবিত্রতা-বিশুদ্ধতা-সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি। শাসকশ্রেণীর নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি চলছে, সুমহান্ সংবিধানকে সেই কাজিয়ায় লাগানো হচ্ছে। বাঘা-বাঘা রথী-মহারথীরা এ পক্ষে-ও পক্ষে নেমে পড়েছেন, সবাই গণতন্ত্রের পক্ষে, সত্যের পক্ষে, প্রাণের বিনিময়ে সংবিধানকে, দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার ব্রতধারী। শ্রেণীস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত থাকলে অবশ্য সব সময় সংস্কৃত শব্দাদিতে আবদ্ধ থাকা যায় না, চুন সুরকির মিহিন প্রলেপ ধুয়ে-মুছে যায়। এমনকি দেশের প্রধান মন্ত্রীর মুখ থেকেও রকের ভাষা বেরিয়ে পড়ে: 'আমাদের সঙ্গে যারা মামদোবাজি করতে আসবে, তাদের ঠাকুমা-দিদিমার নাম ভুলিয়ে ছাড়বো।' পবিত্র সংবিধানে তো কোথাও লেখা নেই প্রধান মন্ত্রী প্রাকৃত ভাষায় কথা বলতে পারবেন না।

তবে একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধান সম্বন্ধে বিরাট মোহ পোষণ করার তেমন কোনো কারণ সত্যিই নেই। ইংরেজ আমলে প্রধানত সমাজের উপরতলার মানুষেরাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন, ১৯৪৬ সালে এই মানুষেরাই বিভিন্ন প্রদেশে ভোট দিয়ে বিধান সভার সদস্য নির্বাচন করেছিলেন। সেই সদস্যরা অতঃপর নিজেদের ভোট প্রয়োগ ক'রে সংবিধান সভা-কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলী গঠন করেন। পরোক্ষনির্বাচিত সংবিধান-সভা, দেশের দরিদ্রতর অধিকাংশ অধিবাসী কিন্তু সেই পরোক্ষ নির্বাচিত সভাতে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারেননি। তা ছাড়া, আরো আজব ব্যাপার ঘটলো সংবিধান খসড়া তৈরি করবার সময়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের অনেকেই খসড়া কমিটিতে রইলেন না। বিদেশী শাসকদের বহুদিন ধ'রে সেবা ক'রে এসেছেন এ ধরনের আইনবিদ-প্রশাসনবিশেষজ্ঞতে ছেয়ে গেল সেই কমিটি। ভারতীয় জনগণের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের কী-কী অঙ্গীকার ছিল, ভারতবর্ষের কোন্ বিশেষ প্রতিস্বরূপ দেশের মানুষ কল্পনা ক'রে এসেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ প্রহর জুড়ে, সে-সমস্ত কথা বলবার মতো বিশেষ কেউ ছিলেন না সংবিধান-রচনার উদ্দেশ্যে-গঠিত খসড়া কমিটিতে। এই বহুভাষী বহু সাংস্কৃতিক সম্ভারের বৈচিত্র্য-

মণ্ডিত দেশের সর্বাত্মক শুভ সংসাধনের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় যে-বিন্যাসের প্রতিশ্রুতি জাতীয় নেতারা একদা দেশবাসীর কাছে রেখেছিলেন, ধুয়ে-মুছে গেল সে-সব প্রতিশ্রুতি, সংবিধানের মধ্যবর্তিতায় এক অতি-অতিকেন্দ্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হলো। তার সুফল-কুফলের আমরা ভুক্তভোগী সেই পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত। জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের এই সংবিধান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র মোহ থাকবার কথা নয়। সমাজবিপ্লব সফল হ'লে এই সংবিধানের সমাধি ঘটবে, বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য-বৈষম্য-ঠাসা অথচ সেই সঙ্গে সুষমা-সংহতিতে-সমাচ্ছন্ন এই দেশের জনগণের সার্বিক স্বার্থের কথা মনে রেখে তখন নতুন ক'রে ফের সংবিধান রচিত হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মাহেন্দ্রমুহূর্তে আমরা না পৌঁছুচ্ছি, বর্তমান সংবিধানকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, তার নিয়মাবলীর চৌহদ্দি মাথায় রেখে আমাদের উপস্থিত কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

সাধারণভাবে এটা তাই বলতে বাধা নেই যে সংবিধানের ৭৪ ধারার অবমাননা অনুচিত। পরিষদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচিত মন্ত্রিসভাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অধিকার কারো থাকতে পারে না, রাষ্ট্রপতিকেও তাঁর আচার-আচরণে বিচার-বিচরণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নির্দেশ তথা ইচ্ছা শিরোধার্য ক'রে নিতে হবে। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভোগী মন্ত্রিসভা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু, রাষ্ট্রপতি কোনো অবস্থাতেই তাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই বিধান তর্কের বাইরে। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে ৭৪ ধারার ঘাড়ে চেপে সংবিধানের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলিকে বেপরোয়া অবজ্ঞা ক'রে যাওয়া সম্ভব। সংবিধানের ৭৮ ধারা স্পষ্ট বলছে, সরকার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত-ও ক্রিয়াকর্ম-সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য চেয়ে পাঠাবার অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে। এই অধিকারকে যাঁরা পদদলিত করছেন, প্রকাশ্যে দেশজ ভাষায় রাষ্ট্রপতির নামে অবিশ্রান্ত কুৎসা প্রচার ক'রে চলেছেন, তাঁরা সংবিধানের নিহিত সারাৎসারকেই নস্যাৎ করতে চাইছেন।

তারও বাইরে কতগুলি কথা থেকে যায়। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা তো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও প্রশাসনের প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি গোটা দেশের-গোটা জাতির রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসমূহেরও তো তাঁর উপরে নির্ভরশীল হওয়ার অধিকার আছে। রাজ্যে-রাজ্যে বিধানসভা-বিধান-পরিষদের সদস্যরাও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন, সংবিধানে সেই অনুজ্ঞা আছে। সুতরাং এ-বিষয়ে স্পষ্ট লেখা থাক বা না-ই থাক, কোনো-কোনো বিশেষ অবস্থায়

রাজ্য সরকারগুলির নৈতিক দাবি থাকবে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হওয়ার। তারা সমস্যায় পড়েছে, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে, যেহেতু তিনি তাঁদেরও রাষ্ট্রপতি, সারা দেশের রাষ্ট্রপতি, তারা তাঁর কাছে বিচারপ্রার্থী।

এ ধরনের কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে কী করবেন রাষ্ট্রপতি? নিছক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন, যেখানে রাজ্যগুলির সমস্যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে নিয়েই, তাদের অভিযোগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেই? এটা আদৌ কোনো অবাস্তব প্রসঙ্গ নয়। সংবিধানের ২৮০ এবং ২৮১ ধারার গুরুত্ব অপরিসীম, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে পয়সাকড়ি সুষম বণ্টনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ব্যবস্থার কথা এই ধারাদ্বয়ে উল্লিখিত। প্রতি পাঁচ বছরের ব্যবধানে রাষ্ট্রপতি একটি অর্থ কমিশন নিয়োগ করবেন, কেন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত কিছু-কিছু রাজস্ব, যেমন আয় কর অথবা অন্তঃশুল্ক, কী পদ্ধতিতে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ভাগ করা হবে অর্থ কমিশন সে-সম্পর্কে বিধান দেবেন; কেন্দ্রীয় অর্থ-ভাণ্ড থেকে কোনো-কোনো রাজ্যকে অনুদান দেওয়া প্রয়োজন কিনা, এবং প্রয়োজন হ'লে সেই অনুদানের কী পরিমাণ হবে, তা-ও অর্থ কমিশনের বিবেচ্য বিষয়। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পদ্‌বিন্যাস-সম্পর্কিত অন্য-কোনো ব্যাপারেও কমিশনের অভিমত চাইতে পারেন। অর্থ কমিশনের সামগ্রিক সিদ্ধান্ত পেশ হবার পর সে-সব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কী-কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো, ২৮১ ধারা বলে রাষ্ট্রপতিকে তা-ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের নির্দেশে কোনো জড়তা নেই, অর্থ কমিশন সম্পদ্‌বিভাজনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সালিশি করবে। তার ভূমিকা বিচারকের। এই বিচারে এক পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার, অন্য দিকে রাজ্য সরকারসমূহ। এই বিচারক কে হবেন, অর্থ কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য হিশেবে কারা-কারা থাকবেন, কমিশনের কাজেব শর্তাবলীতে কোন্‌-কোন্‌ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে, রাষ্ট্রপতি কার উপদেশ অথবা পরামর্শে এসব প্রশ্নের মীমাংসা করবেন? যদি ৭৪ ধারার দোহাই পেড়ে বলা হয়, এসব নিয়ে বাড়তি কথা কেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তেই সমস্ত কিছু হবে, তা হ'লে তো অর্থ কমিশনের বিচারে শুদ্ধতা থাকবে না, নিরপেক্ষতা থাকবে না, সালিশির দুই পক্ষের এক পক্ষ ঠিক ক'রে দিচ্ছেন কে সালিশি করবেন এবং কী-কী বিষয়ে সালিশি হবে। অথচ স্বাধীনতার পর এটা চল্লিশতম বছর, এতদিন পর্যন্ত এভাবেই হয়ে এসেছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির নামে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অর্থ

কমিশন গঠন করেছেন, কমিশনের কর্তব্যের তালিকা ঠিক ক'রে দিয়েছেন, এবং কমিশনের বিচারের উপর তার পর একতরফা নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছেন। প্রতি পাঁচ বছরের জন্য কমিশন সম্পদ্‌বণ্টনের ছক রচনা করেন, অথচ অষ্টম অর্থ কমিশনের রিপোর্ট যখন পেশ করা হলো, ১৯১৪-১৫ সালের পুরো বছরের কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে দিতে অস্বীকার করলেন।

অতীতে যা হয়েছে অনন্তকাল ধরে তো তা চলতে পারে না। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাষ্ট্রপতিকে নবম অর্থ কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করতে হবে। এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি যদি প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি কমিশন গঠন করার আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মতামত জেনে নেবেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গেও আলোচনা করবেন, অর্থ কমিশনের সভাপতি তথা সদস্য কাদের-কাদের করা যেতে পারে সে-ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিরও পরামর্শ চাইবেন, কমিশনের জন্য নির্ধারিত নিদের্শমালাই বা কী হবে তা নিয়েও তাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তা হ'লে রাষ্ট্রপতি কি মহাপাপ করবেন, তাঁকে কি শূলে চড়াতেই হবে তা হ'লে ?

এখানে আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখও অসমীচীন হবে না। যদি কেন্দ্র এবং কোনো রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনো ব্যাপারে মতান্তর দেখা দেয়, সংবিধানের ১৪৩ ধারাবলে রাষ্ট্রপতির অধিকার আছে বিসংবাদটি সুপ্রিম কোর্টের কাছে নিষ্পত্তির জন্য পাঠানোর। কোনো রাজ্য সরকার ভীষণ অসুবিধায় পড়েছে, তার দৃঢ় ধারণা কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতি অবিচার করছে, তার সম্পর্কে সংসদে অবমাননাকর তথ্য দাখিল করেছে, কিংবা তার প্রাপ্য টাকা অন্যায় ক'রে আটকে রেখেছে। সেই রাজ্য সরকার তাই রাষ্ট্রপতির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে, পুরো ব্যাপারটি সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিচারের জন্য পাঠানো হোক, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় রাজ্য সরকার মাথা পেতে মেনে নেবে। কিন্তু বুঝুন মজা, রাজ্য সরকারের এই সকাতর প্রার্থনা পাওয়ার পর এটিকে সুপ্রিম কোর্টে পাঠানোর অধিকার নাকি রাষ্ট্রপতির নেই। ফের ৭৪ ধারা ছায়া ফেলবে, কেন্দ্রীয় সরকার ঐ রাজ্যের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে কি করেনি সে-বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিচার করবে কি করবে না তা পর্যন্ত নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিচারের উপর, রাষ্ট্রপতি রাজ্য সরকারের প্রার্থনাপত্রটি শুধু প্রধান মন্ত্রীর কাছে পাঠাতে পারবেন, তার পর যথাসময়ে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর থেকে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি যাবে : ও হে বৎস, অবহিত হও, আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবার যে-অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রে তুমি রাষ্ট্র-

পতির কাছে চিঠি দিয়েছিলে এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারের প্রার্থনা জানিয়েছিলে, আমি স্বয়ং বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি. তোমার নালিশ গ্রহণ-যোগ্য নয়, আমার বিরুদ্ধে কারো কখনোই কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না। কোনো কল্পকাহিনী নয়, পশ্চিম বঙ্গের ক্ষেত্রেই এ ধরনেব ঘটনা ঘটেছে।

৭৪ ধারার পবিত্রতা অক্ষয় থাক, কিন্তু দেশের সর্বত্র জনসমুদ্রে জোয়ার নেমেছে, যে-ধরনের খামখেয়ালি স্বেচ্ছাচারিতা কেন্দ্রীয় সরকার শ্রেণীস্বার্থপ্রসারের তাগিদে রাজ্য সরকারগুলিকে লক্ষ্য ক'রে এতদিন চালিয়েছে, তা এখন থেকে ক্রমশ দুরূহতর হবে। রাষ্ট্রপতির সর্ববিধ অনুজ্ঞা শুনতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বাধ্য নন, তাঁরা জন-গণের দ্বারা নির্বাচিত এবং আমাদের সংবিধানে, জনশ্রুতি, জনগণই শেষ কথা বলবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পক্ষে এটা ভুললে চলবে না রাজ্যসরকারগুলিও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং রাজ্যসমূহ সম্পর্কে ঘোড়সওয়ারবৃত্তিসুলভ মানসিকতা একমাত্র সর্বনাশই ডেকে আনতে পারে। কোটি-কোটি টাকা ঢেলে, সরকারি ব্যবস্থাপনা নির্লজ্জভাবে কাজে লাগিয়ে, নতুন দিল্লির ময়দানেব সুরক্ষিত পাটাতনে দাঁড়িয়ে 'আমি বিপন্ন, অতএব জাতি বিপন্ন' এই বালখিল্য যুক্তির ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ব্যাখ্যা নিজের বশংবদদের কাছে ক'রে ক্ষণিকের আত্মতৃপ্তি অর্জন সম্ভব। যে-ইতিহাস বচনায় জনতার একচ্ছত্র অধিকার, তার অভিযাত্রার এতটুকুও হেরফের হবে না তাতে।

# মানুষ কেন খঞ্জ হয়

অভিধান বলে, 'খেঁসারি' আসলে 'খঞ্জকারী' শব্দটির অপভ্রংশ। যে-খাদ্য বা অখাদ্য বেশি পরিমাণে অথবা অনেক দিন ধ'রে গ্রহণ করলে খঞ্জ কিংবা বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, তাই খেঁসারি, খঞ্জকারী। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে, বিশেষ ক'রে বিহারে-মধ্যপ্রদেশে-উড়িষ্যায়, প্রতি বছর অন্তত পনেরো-কুড়ি লক্ষ মানুষ খেঁসারি ডাল ভক্ষণের পরিণামে খঞ্জ ব'নে যাচ্ছেন, নানা ধরনের শারীরিক বিকৃতির শিকার হচ্ছেন। অপরিবর্তনীয় ভারতবর্ষ, বছরের পর বছর ধ'রে, এই পরম শোকান্তিক ঘটনা ঘ'টে আসছে, যেন নিয়তিলিখন, কারো কিছু করবার নেই। অথচ স্বাধীনতার পর চার দশক অতিক্রান্ত, সাত-সাতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জাদু নাকি আমাদের ছুঁয়ে গেছে। পরম পরিকল্পিত ভারতবর্ষ, সব-কিছুই পরিকল্পনা-অনুযায়ী ঘটছে, দেশের গরিব মানুষগুলিই শুধু পুষ্টির সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে খেঁসারির ডালের আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন, তার পর খঞ্জ হয়ে যাচ্ছেন।

নীরস-নিরেট কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে হয়। স্রেফ টিঁকে থাকবার তাগিদেই মানুষের শরীরে প্রোটিনের প্রয়োজন, প্রোটিনের অভাবে শরীরে অপুষ্টি ছড়ায়, আধিব্যাধির সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা শরীরে ক'মে আসে। ধনসচ্ছল দেশগুলিতে সাধারণ মানুষ মাছ-মাংস-ডিম-দুধ ইত্যাদি থেকে প্রোটিনের চাহিদা মেটান। আমাদের দেশেও সমাজের বিত্তবান অংশ দুধ-ঘি-ডিম-মাছ-মাংস থেকে প্রোটিন গ্রহণ করেন। দরিদ্রতর জনসাধারণের সেই সুযোগ নেই, দারিদ্র্যসীমার নিম্নপ্রান্তে যাঁরা, ঘি-ডিম-দুধ-মাছ-মাংস তাঁদের কাছে স্বপ্নবিলাসিতা। অথচ তাঁদের শরীরও, নিছক টিঁকে থাকবার জন্যই, ন্যূনতম কিছু প্রোটিনের জন্য আঁকুপাঁকু করে। ডাল থেকে তাঁরা এই প্রোটিন আহরণের প্রয়াস করেন। গরিব মানুষে ছাওয়া এই দেশ, কোটি-কোটি গরিব মানুষ, প্রোটিনের জন্য তাঁদের ডালই একমাত্র ভরসা।

পরম বিচিত্র কাহিনী। পরিকল্পিত ভারতীয় অর্থব্যবস্থা, সাত-সাতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জাদুকাঠি দেশকে ছুঁয়ে গেছে, জগৎসভায় এখন নাকি আমরা গর্ব ক'রে বলতে পারি, ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ম্ভর, বিদেশ থেকে এখন আর আমাদের খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় না, এখন আমরা বিদেশে খাদ্য রপ্তানি পর্যন্ত করছে

পারি। অথচ এই বাগাড়ম্বরের পাশাপাশি রূঢ় সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে হয় : ভারতবর্ষ, জনশ্রুতি, খাদ্যে স্বয়ম্ভর, আড়াই কোটি টন খাদ্যশস্য সরকারি গুদামে ডাঁই হয়ে আছে, কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষের খামতি নেই তাতে, কালাহাণ্ডির মানুষ-গুলি বরাবরের মতো এখনো না খেতে পেয়ে মৃত্যুগত হচ্ছেন। এবং ডালের সংস্থান করতে অপারগ, প্রতি বছরের মতো এখনো পনেরো-কুড়ি লক্ষ মানুষ খেঁসারি ভক্ষণ ক'রে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। খেঁসারিতে সামান্য প্রোটিন আছে, কিন্তু বিষও আছে সেই সঙ্গে, যা বিকলাঙ্গ ক'রে দেয়।

নিরাড়ম্বর গুটিকয় তথ্য, চাঁচাছোলা তথ্য, রেখে-ঢেকে বলার কোনো সুযোগ নেই এখানে। স্বাধীনতা-উত্তর চল্লিশ বছরে দেশের জনসংখ্যা আড়াই গুণের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এই চার দশকে মুগ-ছোলা-অড়হর-মুসুর-কলাই সবরকম ডালের সামগ্রিক উৎপাদন এক দানাও বাড়েনি : সেই ১৯৪৭-৪৮ সালে কম-বেশি এক কোটি কুড়ি লক্ষ টন, এখনো, এই ১৯৪৭-৪৮ সালেও, এক কোটি কুড়ি লক্ষ টন, অন্তর্বর্তী কোনো-কোনো বছরে উৎপাদন হয়তো আরো কম হয়েছে, ক্বচিৎ-কখনো একটি-দু'টি বছরে হয়তো এক রত্তি বেশি হয়েছে। কিন্তু গোটা হিশেবে হেরফের নেই। দেশ এগিয়ে চলেছে, জনসংখ্যা আড়াই গুণ বেড়েছে, পরিকল্পনার নামে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা এই চল্লিশ বছরে ব্যয় করা হয়েছে, প্রতিরক্ষার খরচ চল্লিশ গুণ বেড়েছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদনও নাকি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, আড়াই কোটি টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সরকারি গুদামে শান্তিতে কালাতিপাত করছে। কিন্তু, অপরিবর্তনীয় ভারতবর্ষ, ডালের উৎপাদন এক কোটি কুড়ি লক্ষ টনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

সামান্য, সোজা হিশেব। ডালের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়েনি, কিন্তু জনসংখ্যা আড়াই গুণ বেড়েছে, যার অর্থ চল্লিশ বছরে জনপ্রতি ডালের সংস্থান শতকরা ষাট ভাগ কমেছে, যা ছিল বাৎসরিক ছত্রিশ কিলোগ্রাম, তা দাঁড়িয়েছে বছরে পনেরো কিলোগ্রামে। কিন্তু গড়ের হিশেবে মস্ত ফাঁকি থাকে। যাঁরা উচ্চবিত্ত, তাঁরা ডাল কেনা নিশ্চয়ই কমিয়ে দেননি, তাঁদের সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্য খাটিয়ে খোলা বাজারে তাঁরা ডাল কিনছেন, চল্লিশ বছর আগে যে-পরিমাণ কিনতেন তা-ই কিনছেন, অতএব গরিবদের জন্য ডালের পরিমাণে আরো টান পড়েছে, তাঁদের জন্য জোগান যদি গড়ে প্রতি বছর মাত্র দশ কিলোগ্রামে নেমে গিয়ে থাকে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

গরিব মানুষগুলি হতচকিত, হতভম্ব, কোন্‌দিকে মুখ ফেরাবেন তাঁরা? শরীর

ব্যাধিমুক্ত থাকতে চায়, শরীর তাই পুষ্টির অন্বেষণ করে, প্রোটিনের জন্য হন্যে হয়ে ফেরে। যে-ডাল তাঁদের একমাত্র ভরসা ছিল, পরিকল্পিত ভারতীয় অর্থব্যবস্থার ফলে, তার জোগান ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত। অথচ যে-ক'রেই-হোক শরীরের চাহিদা মেটাতে হবে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত অতি নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর খেঁসারি। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজব্যবস্থার এ এক আজব নিয়মকলা : গরিব মানুষের শরীর ব্যাধি এড়াতে চায় ব'লেই নির্দয়তর ব্যাধির শিকার হ'তে বাধ্য হয়। খেঁসারির ব্যবহার বাড়ে, প্রতি বছর আরো বাড়তি কয়েক লক্ষ মানুষ বিকলাঙ্গ হন।

স্বাধীনতা-উত্তর চল্লিশ বছর জুড়ে, অস্বীকার করবার উপায় নেই, কৃষিক্ষেত্রে ভারতবর্ষ প্রভূত উন্নতি করেছে। লক্ষ-লক্ষ নতুন জমিতে আবাদ শুরু হয়েছে, সেচের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে এক-ফসলা জমি দু'-ফসলা, তিন-ফসলা, চার-ফসলা হয়েছে, উন্নত বীজশস্যের প্রয়োগে উৎপাদনের হার বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে বহুগুণ বেড়েছে, সারের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারেও অনুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে, তা ছাড়া কীটনাশক-ব্যাধিনাশক ওষুধপাতি উৎপন্ন শস্যের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করেছে। যাঁরা একটু মার্কিনভক্ত, বিপ্লবের প্রসঙ্গে ভয়ে কুঁকড়ে আসেন, তাঁরাও কৃষির প্রসঙ্গে গর্ব ক'রে বলেন, ভারতবর্ষে 'সবুজ বিপ্লব' সংসাধিত। তবে বড়ো একচক্ষু বিপ্লব এটা, খাদ্যশস্যের সামগ্রিক উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের গড় জোগান বাড়েনি, বরং কমেছে। খাদ্যশস্য ডাঁই হয়ে গুদামে পচছে, অথচ অভুক্ত-মরণাপন্ন-দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে তা নাকি বিলিয়ে দেওয়া অসম্ভব। এবং ডালের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যন্ত আদৌ বাড়েনি, যে-পরিমাণ জমিতে ডালের আবাদ হতো চল্লিশ বছর আগে, এখনো আবাদের ক্ষেত্র সেখানেই থমকে থেমে আছে, ডালের উন্নত বীজ উদ্ভাবন নিয়ে সরকারি মহলে কারো তেমন মাথা-ঘামানো দেখা যায়নি। সরকার হঠাৎ যখন কোনো কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পড়েন, খবরকাগজে কাহিনী প্রচার করা হয়, 'যুদ্ধকালীন তৎপরতা'র সঙ্গে সেই সমস্যার সমাধানে সবাই নেমে পড়েছেন। ডালের ফলন আদৌ বাড়ছে না, গরিব মানুষগুলি ডালের অভাবে ক্রমশ উৎকীর্ণতর অপুষ্টিতে ভুগছেন, বাধ্য হয়ে খেঁসারির ব্যবহার বাড়ছে, যার প্রকোপে দেশে খঞ্জত্ব ছড়াচ্ছে, কর্তাব্যক্তিদের কাছে এ-সব কোনো সমস্যাই নয়। সেই যে উড়িষ্যার মুখ্য মন্ত্রী বছর দেড়েক আগে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে বলেছিলেন, দেশে গরিব মানুষ সেই রামায়ণ-মহাভারতের সময় থেকেই আছে, তাদের নিয়ে অযথা বাড়তি মাথাব্যথা কেন। উড়িষ্যার মুখ্য মন্ত্রী মনে হয় স্পষ্টবক্তা মানুষ, মনে আর মুখে আড়াআড়ি নেই।

ভোটের সময় গরিবদের নিয়ে একটু-আধটু আদিখ্যেতা দেখাতে হয়, কিন্তু পরিকল্পনার মতো গুরুগভীর বিষয়ে আবার তাদের প্রসঙ্গ উত্থাপনে তাঁর বিবেকগত আপত্তি।

যে-আপত্তি এখন প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ কেষ্টবিষ্টুরা মেনে নিয়েছেন : সত্তর কোটি দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কথা ভাবার দরকার নেই, উপরতলার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল দশ কোটির প্রসঙ্গে নিবদ্ধ থাকাই শ্রেয়। উপরতলার দশ কোটি মানুষ যদি এগিয়ে যান, তাঁদের জীবনযাত্রার মান আরো যদি মসৃণ উর্ধ্বগামী হয়, যদি উপভোগের উপকরণ তাঁদের কাছে অপেক্ষাকৃত আরো সস্তায় পৌঁছে দেওয়া যায়, তাঁদের জন্য উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা যদি আরো প্রসারিত করা যায়, তাতেই জাতির সার্বিক মঙ্গল। একটি নিটোল তত্ত্ব বিধৃত আছে এখানে : বড়োলোকের ইষ্টেই গরিবের ইষ্ট, বড়োলোকরা আরো বড়োলোক হয়ে একটু-একটু প্রসাদের কণা ছিটোবেন, নিজেদের সম্ভোগ বাড়াবেন, সমাজের দরিদ্রতররা তখন তাঁদের সেবা করার বাড়তি সুযোগ পাবে, যা থেকে তাদেরও খানিকটা শ্রীসমৃদ্ধি ঘটবে। আপাতত এই মার্কিন দর্শনে আমাদের নতুন দিল্লিস্থ সমাজতান্ত্রিক সরকার সম্পূর্ণ ম'জে আছেন, উচ্চবিত্তদের সুখসমৃদ্ধির স্বাযাগ কী ক'রে বাড়ানো যায় তার চেয়ে মহত্তর কোনো চিন্তা সরকারের জানা নেই। দেশে ডালের উৎপাদন কেন বাড়ছে না, প্রতি বছর পনেরো-কুড়ি লক্ষ লোক খেঁসারির খুদ খেয়ে কেন বিকলাঙ্গ হচ্ছে, এ-সব উটকো প্রশ্ন এই মুহূর্তে করা মানেই দেশে অস্থিতিসঞ্চারের গূঢ় চক্রান্ত।

অথচ হৃদয়হীনতা থেকে সহৃদয়তায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়াটি তেমন-কিছু দুরূহ নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক ব্যয়ের বহর সত্তর হাজার কোটি টাকাও ছাপিয়ে গেছে। যদি, অন্তত বছর পাঁচেকের জন্যও, এই বিরাট অঙ্ক থেকে মাত্র একশো কোটি টাকার মতোও দেশে ডালের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আলাদা ক'রে রাখা হয়, সুফল প্রত্যাশা করা মোটেই অযৌক্তিক প্রস্তাব নয়। পণ্যশস্যের উৎপাদন বাড়তে পারে, অন্যান্য সমস্ত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়তে পারে, একমাত্র ডালের ক্ষেত্রে উৎপাদন কিছুতেই বাড়বে না, তা হ'তেই পারে না। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে, বিনিয়োগের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে, সার-সেচ-বপনবিন্যাস ইত্যাদির সুষম প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখে, সরকারি মূল্যনীতির প্রয়োজনমতো পরিবর্তন বা পরিশোধনের দিকে যত্ন দিয়ে নিশ্চয়ই ডালের উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব, মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টাতেই সম্ভব। সোনার কাঠি-রুপোর কাঠির ব্যাপার নয় এটা, কিমাশ্চর্য জাদুঘটিত কিছু নয়, একটি নির্দিষ্ট

লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছনোর জন্য নিজেদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া, তারপর সংহত উদ্যোগে প্রতিটি স্তরে প্রতিটি পর্যায়ে নির্ধারিত কর্তব্যগুলি পালন ক'রে যাওয়া। মানুষ চাঁদে পায়চারি ক'রে ফিরে এসেছে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রে এনেছেন, অথচ আমরা ভারতবর্ষে ডালের ফলন এক কোটি কুড়ি লক্ষ টন থেকে দু'কোটি বা তিন কোটি টনে টেনে তুলতে অসমর্থ হচ্ছি, এবং যেহেতু আমরা অসমর্থ হচ্ছি, প্রতি বছর পনেরো-কুড়ি লক্ষ অতিদরিদ্র হতভাগ্য মানুষ খেঁসারির খুদ গলাধঃকরণ ক'রে খঞ্জত্বপ্রাপ্ত হচ্ছেন, এই দৃশ্য সাধারণ বুদ্ধির বাইরে।

রহস্যের কোনো ব্যাপারই নয় এটা, দেশের সামাজিক-আর্থিক পরিকল্পনা নিছক প্রযুক্তি বা প্রকরণের প্রয়োগ নয়, পরিকল্পনা শ্রেণীচেতনাহীন নিরালম্ব-বায়ুভূত বস্তু নয়। কোন্ শ্রেণী ক্ষমতা কুক্ষিগত ক'রে আছেন, এই জিজ্ঞাসার উত্তরকে পাশে সরিয়ে রেখে পরিকল্পনা অকল্পনীয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় যে-শ্রেণী ক্ষমতা আঁকড়ে আছে, সে, লাজলজ্জাহীন, নিজের কোলে ঝোল টানবে, নিজের আখের গোছাবে, তার পৌষমাসে অপরাপর শ্রেণীর সর্বনাশের স্বপ্ন দেখবে। বিস্মিতবোধ করাই বিস্ময়কর প্রযুক্তির ঘাটতি নয়, প্রকরণের স্খলন নয়, বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনানুগ অর্থসংকুলানে অসামর্থ্য নয়, দেশে ডালের উৎপাদন বাড়ুক শাসককুল এটা চান না ব'লেই ডালের উৎপাদন বাড়ে না। আমরা ভুল বলি, আমাদের ভারতবর্ষে প্রতি বছর পনেরো-কুড়ি লক্ষ মানুষ খঞ্জ হন না, তাঁদের খঞ্জ করা হয়। শ্রেণীযুদ্ধ এটা।

# জাতীয় সংহতির কী ও কেন

প্রায় দেড়শোর মতো দেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। চীন-ভারতবর্ষের মতো জনসংখ্যাসমৃদ্ধ দেশ থেকে শুরু ক'রে মরিটেনিয়া-ভূটান-জামাইকার মতো খুদে-খুদে রাষ্ট্র, সবাই সদস্য, সবাই সার্বভৌম। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত সেইণ্ট লুসিয়া কিংবা সেইণ্ট কিট্স্ দ্বীপ, লোকসংখ্যা দু'লক্ষও ছাড়িয়ে যাবে না হয়তো, তারাও রাষ্ট্র-সংঘের সদস্য, তাদের আলাদা নিশান হাওয়ায় ওড়ে, সে-সব দেশের মানুষ নিজেদের কথা নিজেদের ভাষায় ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে আলাদা বেতার-টেলিভিশনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এবং করেওছেন।

আমাদের পশ্চিম বঙ্গে ছ'কোটির উপর মানুষ, ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য আমরা, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বের মধ্য দিয়ে আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত-রূপায়িত। বাইরের পৃথিবীর কাছে আমাদের পরিচয় ভারতবর্ষের নাগরিক হিশেবে, এই পরিচয়ে আমাদের গৌরব, গর্ব, তৃপ্তি। অথচ কতগুলি অপূর্ণতার-অসামঞ্জস্যের কথাও অহরহ আমাদের চেতনাকে তাড়া ক'রে ফেরে। দেড়শোর মতো দেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। কিন্তু চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পাকিস্তান, মেক্সিকো, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম ও পশ্চিম জার্মানি, সাকুল্যে এই বারোটি দেশ বাদ দিলে অন্য প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যাই পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যার চেয়ে কম। তা হ'লেও তারা নিজেদের ভাষায় নিজেদের মতো ক'রে নিজেদের আবেগ-আকূতি-মতামত প্রকাশ করবার জন্য বেতার-টেলি-ভিশন কেন্দ্র ইত্যাদি খোলার ব্যবস্থা করতে পারেন, ব্যবস্থা করেওছেন। আমরা পারি না, ভারতবর্ষের সংবিধান নাকি আমাদের সে-অধিকার দেয়নি, আমাদের বেতার-দূরদর্শন কেন্দ্র প্রত্যেকটিই নতুন দিল্লির তত্ত্বাবধানে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তারা পরিচালিত হয়। সংবিধান নাকি সেই নির্দেশই দিয়েছে। কেন্দ্রের মন্ত্রীরা মাঝে-মাঝেই আমাদের জ্ঞানশলাকা উন্মীলনের প্রয়াসে উদ্যোগী হন : রাজ্য-গুলি যতই বেতার-দূরদর্শন ইত্যাদি প্রচারযন্ত্রের ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার বিস্তারের দাবি করুন না কেন, কেন্দ্র অসহায়, সংবিধানের ধারাবলী লঙ্ঘন তো সম্ভব নয়; সংবিধানের সপ্তম তফসিলে কেন্দ্র তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা নামে

তিনটি সুস্পষ্ট তালিকা সন্নিবদ্ধ আছে, কেন্দ্রের কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে দায়িত্ব তথা অধিকার, রাজ্যগুলির কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে দায়িত্ব তথা অধিকার, এবং কোন্-কোন্ ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ দায়িত্ব, তা জলের মতো ক'রে এই তফসিলে বুঝিয়ে দেওয়া আছে। কেন্দ্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত একত্রিশ সংখ্যক নির্দেশিকা অনুযায়ী টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার ইত্যাদির দায়িত্ব কেন্দ্রের হস্তে সমর্পিত। সংবিধানের নির্দেশ তো এড়ানো সম্ভব নয়, রাজ্য সরকারসমূহকে বেতার-দূরদর্শন কেন্দ্র খুলতে দেওয়া সংবিধানকে অবমাননার শামিল হবে। তা ছাড়া, দেশবাসীগণ, ভেবে দেখুন সবাই, জাতীয় সংহতি বিপন্ন, দেশের ভিতরে-বাইরে ষড়যন্ত্র চলছে কী ক'রে আমাদের জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতাকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেওয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারদের বেতার-টেলিভিশন কেন্দ্র খোলবার অনুমতি দেওয়া চরম হটকারিতা হবে। দেশের এই সংকটমুহূর্তে কোনো দায়িত্বশীল সরকার এমনধারা প্রস্তাবে রাজি হ'তে পারেন না।

রাজ্য সরকারসমূহ নিজেদের তত্ত্বাবধানে বেতার-দূরদর্শন কেন্দ্র প্রবর্তন করার সুযোগ পেলে জাতীয় সংহতি শিথিলতর না নিবিড়তর হবে সেই তর্ক এই মুহূর্তে মুলতুবি থাক। কিন্তু সত্যিই কি ভারতের সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশ আছে কোনো অবস্থাতেই রাজ্যগুলির হাতে বেতার-টেলিভিশন চালানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করা চলবে না, অনন্তকাল ধ'রে কেন্দ্র এই ব্যাপারে তার একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ ক'রে যাবে?

আমাদের সাংবিধানিক ইতিহাস কিন্তু অন্য কথাই বলে।

ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা অনেক ক্ষেত্রেই অনুকরণ-অনুসরণের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন: এখান থেকে একটি ভাবনা ধার করা, ওখান থেকে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা, এ-ধরনের অজস্র জোড়াতালির উদাহরণ সংবিধানের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কেন্দ্র-রাজ্যের দায়িত্ব ও অধিকার নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের উপর। প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তরপর্বে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন উত্তাল, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শৃঙ্খল-মোচনের লক্ষ্যে শত-সহস্র দেশবাসী কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, বিদেশী শাসকের দমন-পীড়ন-অত্যাচারকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান ক'রে সাধারণ মানুষ সংগ্রামরত, যত বেশি দমন-পীড়ন-অত্যাচার, লক্ষ-কোটি ভারতবাসীর প্রতিজ্ঞা তত বেশি দৃঢ়বদ্ধ, স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে তারা তত বেশি বেপরোয়া-অকুতোভয়। ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারলেন কৌশলগত

কারণেই শোষণ-অত্যাচারের পাশাপাশি একটু-আধটু দয়া-দেখানোর ভাণ করা প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদ স্বেচ্ছায় নিজেকে অপসৃত করবে না, কিন্তু একটু-আধটু ক্ষমতা বিলিয়ে দেওয়ার অভিনয় করলে তো ক্ষতি নেই, তাতে অন্তত কিছু-কিছু ভারতবাসীর মনে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, যার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঈষৎ দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এই চিন্তাধারার ফসল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর একটি ভণিতা ছড়িয়ে আছে এই আইনের সর্বত্র, নতুন দিল্লিস্থ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই আসল সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকবে, কিন্তু ভারতীয়দের সামান্য খুশি করবার নিমিত্ত, পাশা-পাশি, গালভরা 'প্রাদেশিক' স্বায়ত্তশাসনেরও ব্যবস্থা থাকবে, ভারতবর্ষের মানুষ বিভিন্ন প্রদেশে সীমিত দায়িত্ব ও অধিকারের সুযোগ গ্রহণ ক'রে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় নিজেদের অভিষিক্ত করতে থাকুক, দয়ালু ব্রিটিশ সরকার তার পর বিবেচনা ক'রে দেখবেন ভবিষ্যতে তাদের দেশশাসনের আরো বাড়তি-কিছু দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে কিনা। দেশটি ভারতবাসীদের নিজেদের হ'লেই বা কী, দেশ-চালানো তো চাট্টিখানি কথা নয়, ধৈর্য ধ'রে 'প্রাদেশিক' স্বায়ত্তশাসনে তারা হাতেখড়ি দিক আপাতত; যদি ভালো করতে পারে, দয়ার আকর সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ থেকে প্রজাকুলের প্রার্থনা আর-একবার পরে বিবেচনা ক'রে দেখা হবে।

এই মানসিকতা থেকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের উদ্ভব, গোলামের জাতকে প্রভু সম্প্রদায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনরূপী প্রসাদকণা বিলোচ্ছেন। ১৯৩৫ সনের আইনেই নিধান দেওয়া আছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা-বেতারযন্ত্র ইত্যাদির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের বিধিগত নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অর্থ এই নয় যে নতুন দিল্লির সরকার বেতারমাধ্যম সম্পূর্ণ নিজের কুক্ষিগত করে রাখবেন, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার কোনো সুযোগই দেওয়া হবে না। ১৯৩৫ সালেব আইনের ১২৯ ধারায় বেতার ব্যবহারের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, কোনোরকম অস্পষ্টতা নেই এই ব্যাখ্যায়। নিজেদের প্রয়োজনে কোনো প্রাদেশিক সরকার যদি বেতারকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন, তা হ'লে অযৌক্তিক কারণে তা অগ্রাহ্য করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে না। বেতারব্যবস্থার ক্ষেত্রে যদিও কেন্দ্রের বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে, সেই অধিকারের অপপ্রয়োগ করা চলবে না, যুক্তিসংগত কারণ না দেখিয়ে কোনো প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুরোধ বাতিল করা চলবে না, এমনকি প্রাদেশিক বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত বক্তব্য

বা বিষয়াবলী সম্পর্কে আপত্তি জানাবার অধিকারও কেন্দ্রের থাকবে না, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে শুধু এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তাদের বেতারকেন্দ্র থেকে এমন-কিছু প্রচার করা হবে না যাতে দেশের শান্তি অথবা শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

ব্রিটিশ আমলে যা ছিল প্রদেশ, স্বাধীন ভারতবর্ষে তা-ই রাজ্যে রূপান্তরিত। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের অতি-সংকীর্ণ অতি-অনিচ্ছার আইনেও, দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের বেতারকেন্দ্র স্থাপনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পুরোপুরি চালু হওয়ার আগেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধলো। ইতিহাসের দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটলো, মহাযুদ্ধের উপসংহার, ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের অপসারণের সিদ্ধান্ত, দেশভাগ, স্বাধীন ভারতের নিজের সংবিধান, যা ১৯৫০ সাল থেকে আমাদের জীবনযাপনের নিয়মকলা নিয়ন্ত্রণ ক'রে আসছে। সংবিধানপ্রণেতারা কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা-দায়িত্ব বিভাজনের প্রশ্নে তেমন-কোনো মৌলিকতার আশ্রয় নেননি, প্রায় হুবহু ১৯৩৫ সালের আইনের নির্দেশাবলী অনুসরণ করেছেন। যোগাযোগ-টেলিফোন-টেলিগ্রাম-বেতারব্যবস্থাদি, ১৯৩৫ সালের আইনে যেমন ছিল, সংবিধানেও কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় হিশেবে বিধিবদ্ধ করা হলো। শুধু একটি তফাৎ ঘটলো। ১৯৩৫ সালের ১২৯ সংখ্যক ধারাটি আলাদা ক'রে পুনরুল্লেখ করা হলো না। সংবিধান প্রণেতারা আলোচনার সময় অবশ্য বললেন, ১৯৩৫ সনের আইনের নিহিত উদ্দেশ্য সংবিধানেও বলবৎ থাকবে, রাজ্যগুলিকে আলাদা বেতারকেন্দ্র স্থাপন করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে, প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরুও এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে গলা মেলালেন। রাজ্যগুলিকে অনুমতির জন্য অবশ্য কেন্দ্রের কাছে আসতে হবে, কেন্দ্র-কর্তৃক নির্দেশিত কিছু-কিছু অনুশাসন তাদের মেনে চলতে হবে, কিন্তু রাজ্য সরকারসমূহের সুযোগ থাকবে নিজেদের মতো ক'রে, নিজেদের ইচ্ছা-আদর্শ-চিন্তাধারা অনুযায়ী, প্রচার-বেতারকেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করার।

সেই প্রতিশ্রুতি কয়েক বছরের মধ্যেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নামে অঙ্গরাজ্যগুলিকে যে-অধিকার দিতে আদৌ চিন্তিত বোধ করেননি, স্বাধীন ভারতবর্ষে তা সুদূরপরাহত। সংবিধানরচনার মুহূর্তে প্রধান মন্ত্রীকর্তৃক উচ্চারিত অঙ্গীকার সুষ্ঠু ধারাবাহিকতার সঙ্গে তিন পুরুষ ধ'রে অস্বীকৃত হয়ে এসেছে। এখন সংবিধানেরই দোহাই পাড়া হচ্ছে, যে-অধিকার সংবিধান-অনুযায়ী কেন্দ্রের একার, তা রাজ্যগুলিকে দান করা সম্ভব নয়।

এটা ঠিক আইনঘটিত সমস্যা নয়, দৃষ্টিভঙ্গি-মানসিকতার সমস্যা। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারাধিপতিরা এ-সম্পর্কে কী অভিমত পোষণ করেন, তা আজ পর্যন্ত যাচাই ক'রে দেখা হয়নি। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার একচেটিয়া অধিকারের সমার্থক কিনা সেই তর্ক তাই অমীমাংসিত। যদি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নজির তোলা যায়, এবং খোদ সংবিধানপ্রণেতাদের ব্যক্ত অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তা হ'লে বিচারপতিদের সিদ্ধান্ত কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। অন্য পক্ষে যাঁরা বলবেন ইতিহাস পরিবর্তনশীল, এবং অতীতের নজির দেখিয়ে সংবিধানের বিশ্লেষণকে একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত করার প্রয়াস অসমীচীন, তাঁরা ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছুতে চাইবেন। তর্ক গড়িয়ে চলবে। ইতিমধ্যে কিন্তু দেশের লক্ষ-কোটি জনসাধারণের চেতনার মান একটু-একটু ক'রে উন্নীত হবে, নিজেদের আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থান সম্পর্কে তাঁরা ক্রমশ সচেতন হবেন, পৃথিবীর পরিপার্শ্বে কোথায় কী ঘটছে আস্তে-আস্তে তা তাঁদের জ্ঞানের বৃত্তের পরিধির মধ্যে ধরা পড়তে থাকবে।

যেমন, আমাদের দেশের চৌহদ্দিতেই, একটি-দু'টি ঘটনা ঘটেছে। কোনো রাজ্য সরকারকেই বেতার বা টেলিভিশন কেন্দ্র খোলবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। দূরদর্শনের হুজুরদর্শন খ্যাতি পরিম্লান হবার কোনো সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না, অথচ ভারত সরকারই পরিস্থিতির চাপে প'ড়ে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রীলঙ্কার বেশ কয়েক লক্ষ তামিলভাষী নাগরিক, যাঁরা নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করছেন, সাময়িকভাবে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন, এখান থেকেই শ্রীলঙ্কায় সংগ্রামরত সহযোগীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে চলেছেন। শ্রীলঙ্কায় বাণীপ্রচারের জন্য তাঁরা ভারতবর্ষের মাটিতে নিজেদের বেতারকেন্দ্র স্থাপন করেছেন পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বেতারকেন্দ্র খোলা সম্ভব নয়। অচিরেই তাঁদের সেই অনুমতি মিলেছে।

সংবিধানের নজির টানা তাই পণ্ডশ্রম। শ্রীলঙ্কার তামিল স্বাধীনতাসংগ্রামীদের বেতারকেন্দ্র মঞ্জুর ক'রে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই সংবিধান-বহির্ভূত কিছু করেননি, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যা অতএব কেন্দ্রের একচ্ছত্র অধিকার নয়, বেতার-টেলিভিশন পরিচালনার ব্যবস্থা কেন্দ্রের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হবে মাত্র, কিন্তু কেন্দ্রের একান্ত কুক্ষিগত থাকবে না, রাজ্য সরকারগুলি অনুরোধ জানালে তাঁদেরও সেই অধিকার দেওয়া সমীচীন হবে, তাঁদের কতগুলি কেন্দ্রীয় নির্দেশ-অনুজ্ঞা মানতে হবে মাত্র।

সাধারণ বুদ্ধিতে এ-ধরনের মীমাংসাতেই পৌছনো উচিত। কিন্তু যাঁরা একনায়কতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা তো সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত হ'তে দায়বদ্ধ হন। তাঁরা সব-কিছু নিজেদের জন্য গ্রাস করতে চান, সমস্ত ঝোল নিজেদের কোলে টানতে তাঁরা বদ্ধপরিকর, দেশের সমস্ত সম্পদ্ তাঁদের স্বার্থে ব্যয়িত হবে. দেশের সমস্ত আইন দুমড়ে-মুচড়ে তাঁদের স্বার্থ প্রসারের জন্য প্রয়োগ করা হবে, দেশের বিচারব্যবস্থা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থে তাঁরা ব্যবহার করবেন, দেশের প্রশাসন সর্বস্তরে একমাত্র তাঁদের স্বার্থ দেখবে, দেশের যাবতীয় প্রচারমাধ্যম তাঁদের পুরোপুরি কুক্ষিগত থাকবে।

সুতরাং সংবিধানের ইতিহাসবিশ্লেষণের কোনো সুযোগই নেই এখানে। দেশ বিপন্ন, কেরল বা কর্ণাটক বা ত্রিপুরা বা পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে দূরদর্শনের দ্বিতীয় তরঙ্গ ব্যবহার করার অনুমতি দিলে, কে না জানে, এই অবস্থায় জাতীয় সংহতি শিথিল হবার আশঙ্কা। আমাদের পরম দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকার এই ঝুঁকি আদৌ নিতে পারেন না।

মুশকিল হলো, ছ'কোটি মানুষ পশ্চিম বঙ্গে, সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ অন্ধ্র প্রদেশে, পাঁচ কোটি মানুষ কর্ণাটকে, তিন কোটি মানুষ কেরলে, এই মানুষগুলি যদি হঠাৎ ভাবতে শুরু করে, কেমনধারা প্রথা এটা, সেইণ্ট কীটসের মাত্র সত্তর হাজার নাগরিক, তাদেরও নিজেদের রেডিও-টেলিভিশন থাকতে পারে, আছে, অথচ আমরা এত-এত কোটি মানুষ, আমাদের ক্ষেত্রে তা হবার জো নেই, কিন্তু কেন নেই। এ-ধরনের চিন্তা যদি একটু-একটু ক'রে ক্রমশ ছড়াতে শুরু করে, জাতীয় সংহতি কী শিথিলতর হবে, না দৃঢ়তর হবে?

# ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস ?

ধুন্দুমার কাণ্ড চলছে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ফাটকা বাজারে। শেয়ারের দাম গোঁত্তা খেয়ে নিচে নামছে, নিউ ইয়র্কে নামছে তো লণ্ডনেও নামছে, নামছে শিকাগোতে, টোকিওতে, প্যারিসে, হংকঙে। প্রত্যেকটি দেশে এখন ভয়চকিত কণ্ঠস্বর: তবে কি মার্কসবাদীরাই ঠিক, ধনতান্ত্রিক কাঠামো সত্যি-সত্যি ধ'সে পড়বে, দেশে-দেশে, সেই প্রায় ষাট বছর আগে যেমন দেখা দিয়েছিল, ফের মন্দা দেখা দেবে, কোম্পানির পরে কোম্পানি ফেল পড়বে, একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে? এমনিতেই কর্মসংস্থানের অবস্থা ভালো নয়, এখন আরো হাজার গুণ খারাপ হবে, গোটা ধনতান্ত্রিক বিশ্ব জুড়ে কোটি-কোটি নাগরিক বেকার হয়ে পড়বেন? উৎকণ্ঠা, আর্তনাদ, পারস্পরিক সন্দেহ: লক্ষণ দেখে মনে হয়, মেরামতি ক'রে আর পশ্চিমী ধনতন্ত্রকে খুব বেশি দিন টিঁকিয়ে রাখা যাবে না। কিছু গুণ একদা হয়তো এই ব্যবস্থায় ছিল, এখন শুধুই ঘুণের পালা, সংকট চারদিক থেকে যেন ছেঁকে ধরছে, এবার আর অব্যাহতি নেই।

ফাটকা বাজারের বিশিষ্ট একটি মানসিকতা আছে, একবার দাম পড়তে শুরু করলে, এবং ফাটকাবাজদের একটি বড়ো অংশ হতাশার শিকার হ'লে, দাম হু-হু ক'রে কমতেই থাকবে। যদি ধারণা ছড়িয়ে পড়ে যে আগামী কাল শেয়ারের দাম আরো নামবে আজকের তুলনায়, এবং আগামী পরশু তার চেয়েও বেশি নিচে নামবে, তাহ'লে ঊর্ধ্বশ্বাসে সবাই এই মুহূর্তে শেয়ার বিক্রি ক'রে দিতে ছুটবেন। এবং শেয়ার বেচবার আগ্রহ যত বেশি হবে, দাম তত বেশি পড়বে, তখন বেচবার তাগিদ আরো বাড়বে, ফের শেয়ারের দাম আরো নিচে নামবে, এমনি ক'রে নামতে-নামতে একেবারে প্রায় পাতালে গিয়ে ঠেকবে। গত দু'সপ্তাহ ধ'রে ধনতান্ত্রিক বিশ্বে শেয়ার বাজারে যে-বিপর্যস্ততা দেখা দিয়েছে, তার গোড়ায় এই মানসিকতা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপ্রতিহত ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কল্পকথায় দেশে-দেশে সাধারণ মানুষ যেন আর সায় দিতে পারছেন না, এমনকি খোদ মার্কিন মুলুকেও পারছেন না। সবাই যেন ধ'রেই নিয়েছেন, এখন থেকে ঘুণের পালা, সুতরাং গুটিয়ে নিয়ে আসো নিজেদের, ঘর সামলাও, নিজেদের ঘর, প্রতিবেশীদের

কথা আপাতত না ভাবলেও চলবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকবর্গ ভাবছেন নিজেদের স্বার্থ কোনোক্রমে রক্ষা করবার কথা, ঐ একই কথা ভাবছেন পশ্চিম ইওরোপের বা জাপানের মানুষজনেরা। এবং তাতে পারস্পরিক অবিশ্বাস-ভুল-বোঝাবোঝি আরো বাড়ছে।

হালে সংকট যে-বিশেষ আকারে দেখা দিয়েছে, তার মূলে অবশ্য মার্কিনি অর্থব্যবস্থা। মার্কিন সরকার বিত্তশালীদের উপর ট্যাক্সো চাপাতে রাজি নন, তাঁরা ঘাটতি বাজেট করছেন, ঘাটতি মেটাচ্ছেন নোট ছাপিয়ে, এই টাকায় প্রতিরক্ষা খাতে সতত ব্যয় বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, প্রতিরক্ষার উপকরণ-সরঞ্জামাদি সরবরাহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান-ঠিকেদারদের পোয়া বারো। কিন্তু বেশি নোট ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটালে দেশে জিনিশপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী হবে, সেই আশঙ্কা এড়াবার জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর জিনিশপত্র আমদানি করছেন মার্কিন কর্তৃপক্ষ, বাজেটে যে-পরিমাণ ঘাটতি, রপ্তানি ছাপিয়ে আমদানির বহরও ঠিক সেই পরিমাণ, কিংবা কোনো-কোনো বছর তারও বেশি। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবার জন্যই এই ব্যবস্থার প্রয়োজন, বৈদেশিক বাণিজ্যে এই পরিকল্পিত ঘাটতি। কিন্তু রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হ'লে অন্য সমস্যা, বাণিজ্যিক ঘাটতি মেটাবার দায় দেখা দেয়, নগদ টাকা দিয়ে তা মেটাতে হয়। এখানেও মার্কিন কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েক-বছর ধ'রে একটি বিশেষ প্রকরণের উপর নির্ভর করছেন। তাঁরা দেশের অভ্যন্তরে সুদের হার বাড়িয়ে গেছেন। বাড়তি সুদের আকর্ষণে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে কাঁচা টাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জমা হয়েছে, এই টাকায় মার্কিন জাতি তাঁদের বাণিজ্যিক ঘাটতির দায়ভার মেটাচ্ছেন। জিনিশপাতি কিনছেন বিদেশ থেকে, আবার সেই জিনিশপাতি কেনার সংস্থান করছেন বিদেশীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ ক'রে।

কিন্তু ঠিক এখানেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্ববিরোধিতা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। অঢেল হারে সুদ বাড়াবার ঝুঁকি আছে। সুদের হার বাড়লে দেশের মানুষ ব্যাঙ্কে টাকা রেখে সুদ উপভোগ করবার দিকে ঝুঁকবে, ফাটকা বাজারে গিয়ে শেয়ার কেনবার শখ তাদের ক'মে যাবে। সুদের টাকা নিশ্চিন্ত হারে আসছে, কিন্তু শেয়ার কিনলে তা থেকে আখেরে লাভ হবে কি হবে না তা নিয়ে একটু অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। শেয়ার মানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানাদির শেয়ার, শিল্প-প্রতিষ্ঠানাদির মুনাফা ভালো হ'লেই শেয়ারে টাকা খাটিয়ে লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মুহূর্তে এক দিকে যেমন সুদের হার চড়ছে, অন্য দিকে

তেমনি শিল্পোৎপাদনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়-সন্দেহ মাথা চাড়া দিচ্ছে। সোভিয়েট দেশের নেতৃবৃন্দ অহরহ শান্তির কথা বলছেন, তাঁরা ইওরোপের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে চুক্তি সই করেছেন, নিত্য-নতুন আরো প্রস্তাব দিচ্ছেন যাতে গোটা পৃথিবীতে অর্থহীন অস্ত্রসম্ভার ব্যাহত হয়। নানা যুক্তির ফাঁদে তাঁরা মার্কিন কর্তৃপক্ষকে আটকে ফেলেছেন, সুতরাং, বলা যায় না, হয়তো মার্কিন সরকারকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন কমাতে রাজি হ'তে হবে। যার মানে মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যয় এক ধাক্কায় অনেকটা হ্রাস পাবে, সংশ্লিষ্ট শিল্প ও ঠিকেদারি সংস্থাগুলির উৎপাদন-উপার্জনের উপর প্রভাব না পড়েই যায় না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা গভীর দুঃসংবাদ হিশেবে দেখা দেয় কারো-কারো কাছে, প্রতিরক্ষার খরচ কমবে, শিল্পোৎপাদনও সেই সঙ্গে, পুঁজিপতিদের লাভে খামতি ঘটবে, শেয়ার কিনে লাভ নেই তেমন। কেউ যদি একবার এই আর্তোক্তি উচ্চারণ করেন, সঙ্গে-সঙ্গে তার অন্তঃস্থিত মর্ম ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, আতঙ্কের পালা শুরু হয়, ধস নামে ফাটকা বাজারে. যেমন নেমেছে গত দুই সপ্তাহ ধ'রে।

তা ছাড়া, অন্য সমস্যাও আছে। মার্কিন পুঁজিপতিরা শিল্প প্রতিযোগিতায় জাপানীদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। জামাকাপড়ের মতো অতি সাধারণ ভোগ্য-পণ্যই হোক, অথবা রেডিও-টেলিভিশনই হোক, কিংবা কম্পিউটারপ্রতিম ইলেক-ট্রনিক শিল্পজাত পণ্যই হোক, জাপানীরা যে-দামে যে-উৎকর্ষের জিনিশ বাজারে ছাড়তে পারছেন, মার্কিনরা তার কাছাকাছিও আসতে পারছেন না, এমনকি মার্কিন দেশের বাজারই জাপানী জিনিশপত্রে ছেয়ে যাচ্ছে। জাপানের উত্তরোত্তর পৌষ মাস, মার্কিনীদের সর্বনাশ। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শোরগোল শুরু হয়েছে, জাপানীদের হাতে প'ড়ে-প'ড়ে মার খেতে রাজি নন অনেক মার্কিন শিল্পপতি, একটি-দু'টি শ্রমিক প্রতিষ্ঠানও তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন, তাঁদের সম্মিলিত দাবি : হয় জাপানীরা স্বেচ্ছায় মার্কিন বাজারে জিনিশ বিক্রি-বাঁটা কমিয়ে আনুন, নয়তো মার্কিন কর্তৃপক্ষ বিধি-নিষেধ আরোপ করুন যাতে জাপান থেকে অঢেল পণ্য আসা বন্ধ হয়। দুই দেশের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে, প্রতিশ্রুতির আদান-প্রদান, কিন্তু সমস্যার তেমন সুরাহা হচ্ছে না। দুই দেশেই তাই একটু-একটু ক'রে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। নিউ ইয়র্কে ফাটকা বাজার যেই মার খাচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে টোকিওতে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ নিজেদের আভ্যন্তরীণ অর্থব্যবস্থা সামাল দিতে এবার বুঝি কড়া দাওয়াই প্রয়োগ করবেন, নির্দেশ দিয়ে জাপান থেকে আমদানি কমাবেন। এই সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়া

মাত্র টোকিও-র ফাটকা বাজারে তার ছায়া পড়ে, দাম নিচে নামতে শুরু করে। এভাবে এক ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে আর-এক ধনতান্ত্রিক দেশে ত্রাসের বার্তা পৌঁছে যেতে থাকে।

আরেকটি সমস্যাও প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দেখা দেয়। মার্কিন দেশে টাকার সুদ ক্রমশ উপরে চড়ে, পশ্চিম ইওরোপে তা হাতছানি হয়ে দেখা দেয়। ইওরোপের সঞ্চয় বাড়তি সুদের লোভে মার্কিনমুখো হয়, ইওরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে টাকার ঘাটতি ঘটে, অতএব প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আটকে থাকে. এই অসুবিধা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় ইওরোপীয় দেশগুলিতেও টাকার সুদ বাড়ানো। কিন্তু তা হ'লে শিল্পোৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, রপ্তানি বাণিজ্যে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে পিছিয়ে পড়তে হবে। সমাজতন্ত্রের জুজুর ভয়ে এইসব দেশের সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক সখ্যে আবদ্ধ, কিন্তু আস্তে-আস্তে এখন অর্থনৈতিক সংঘাতের সমস্যা বড়ো আকার ধারণ করছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মন-কষাকষির পালা এঁদেরও শুরু হয়েছে তাই। চাচা-আপন-প্রাণ-বাঁচা, এই নীতি এখন প্রায় প্রত্যেকেরই চেতনার গভীরে সুপ্রোথিত। সর্বত্র যখন শেয়ার বাজারে সংকট দেখা দেয়, তখন প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশেই এই ভাবনা প্রকট হয় রাজনৈতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে যতই প্রচার করা হোক না কেন, সংকটের মুহূর্তে প্রত্যেকেই নিজের-নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা ভাববে, বিদেশ থেকে জিনিশ কেনা-কাটা কমিয়ে আনবে, যে-সিদ্ধান্তের ভুক্তভোগী হ'তে হবে অন্য দেশগুলিকে। পারস্পরিক অবিশ্বাসের জোয়ারে প্রাক্তন অনেক প্রতি-শ্রুতি ও অঙ্গীকারের ভেসে যাওয়ার উপক্রম হবে।

আমরা যারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে আছি. অথচ পরিকল্পিত সমাজতন্ত্রের পৃথিবীতে এখনো উপনীত হতে পারিনি, পুঁজিবাদী সংকটে জড়িয়ে পড়তে হয় আমাদেরও। টাকার সুদ বাড়লে গরিব-অনুন্নত দেশগুলিকে সেই চড়া হারে টাকা ধার করতে হয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ থেকে, সেই সুদের চোট সামলাতে সকলের ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। একটা হিশেবে ধরা পড়েছে, অনুন্নত দেশগুলিকে সম্প্রতি স্রেফ সুদ হিশেবেই যত টাকা পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পৌঁছে দিতে হচ্ছে প্রতি বছর, তা ভারতবর্ষের বার্ষিক জাতীয় উপার্জনের সমপরিমাণ। তাছাড়া. পশ্চিমে ধনতন্ত্রের সংকট যত পরিব্যাপ্ত হবে, উৎপাদন ও উপভোগ ব্যবস্থায় তার প্রভাব পড়বে, বাণিজ্যিক লেনদেন-ক্রয়-বিক্রয় হ্রাস পাবে, গরিব-অনুন্নত দেশগুলিতে তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিদেশের বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে

হিমসিম খাবে। এ-সমস্ত সামগ্রীর দাম চাপে ফেলে কমিয়ে আনা হবে, যারা পড়বেন গরিব দেশের গরিব মানুষগুলি। যতদিন পর্যন্ত অনুন্নত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এই চাপকে উপেক্ষা করতে সক্ষম না হবেন, ততদিন অসুবিধার মধ্যে থাকতে হবে তাঁদের, পুঁজিবাদীরা তাঁদের সংকটের খানিকটা দায় পৃথিবীর দরিদ্রদের কাঁধে চাপিয়ে মুনাফার বহর যথাসম্ভব রক্ষা রক্ষা করতে সদাসচেষ্ট থাকবেন : ধনতন্ত্রের এটাই নিয়মকলা।

পশ্চিমের দেশগুলিতে শেয়ার বাজারে ধুন্দুমার কাণ্ড, সর্বনাশের পূর্বলক্ষণ। হয়তো পুঁজিবাদীরা জোড়াতালি দিয়ে আরো কিছুদিন সংকটের উদগ্র প্রকাশ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, হয়তো পারবেন না। শেষ পর্যন্ত যা ঘটবে তা ইতিহাসের নিয়ম-অনুযায়ীই ঘটবে : ধনতন্ত্রের কপাল পুড়বে, কিন্তু কবে কোথায় কীভাবে পুড়বে তা ইতিহাসে আগে থেকে লেখা থাকে না, বিশেষ ঘটনাক্রমের উপর তা নির্ভরশীল। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে ইতিমধ্যে আমরা হাত গুটিয়ে ব'সে থাকবো কবে রাধা নাচবে সেই প্রতীক্ষায়। গরিব উন্নতিশীল প্রতিটি দেশে যদি স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার বেলাভূমি সুপ্রশস্ত করা সম্ভব হয়, আমরা যদি সংযুক্ত-সম্মিলিত হ'তে শিখি, পুঁজিবাদের সংকট তাহলে আমাদের কোনো বিপাকেই পারবে না, ইতিহাস তো ঝুঁকবে আমাদের দিকে।

## 'নিলামে তেল বেচো, দাম কমবে'

খবরকাগজের ভিতরের পৃষ্ঠায় ঢোকানো অতি ছোটো সরকারি বিবৃতির বয়ান, চোখে পড়ে কি পড়ে না : দিল্লির সরকারের চোখে ঘুম নেই, দেশে খরা, শস্যহানি, জিনিশপত্রের দাম চড়ছে, ভোজ্য তেলের দাম অতিরিক্ত দিয়েও অনেক রাজ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না, জোগানে ঘাটতি। নতুন দিল্লিস্থ সরবরাহ মন্ত্রক এই ব্যবস্থা চলতে না দিতে দৃঢ়কল্প, তাঁদের তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশ হাজার টন ভোজ্য তেল মজুত আছে, সাধারণ মানুষের দুর্দশা লাঘব করবার উদ্দেশ্যে সেই তেল তাঁরা বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই তেল অচিরে ছাড়া হচ্ছে। কী পদ্ধতিতে ছাড়া হচ্ছে ? সেই পঞ্চাশ হাজার টন তেল নিলামে বিক্রি করবার বন্দোবস্ত করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। এর পর ভোজ্য তেলের দাম নাকি না ক'মেই পারে না।

প্রায় আশি কোটি মানুষের দেশ আমাদের, এই আশি কোটি নাগরিককে গোমুখ্যু ভেবে নিয়েছেন সরকার, নইলে এ-ধরনের বিবৃতি বাজারে ছাড়বার সাহস অথবা স্পর্ধা চট ক'রে হবার নয়। নিলামে চড়ালে ঘাটতি জিনিশের দাম কমে না, বাড়ে। নিলাম থেকে এই পঞ্চাশ হাজার টন ভোজ্য তেল চড়া দাম দিয়ে কিনবেন সাধারণ নাগরিকরা নন, কিনবে সে-সব ব্যবসাদাররা চড়া দাম দিয়ে কেনবার মতো সংগতি যাদের আছে। এবং ইত্যাকার ব্যবসাদাররা দয়ার সিন্ধু নয়, তাদের উপর সরকারের কোনো হুকুমদারির ক্ষমতাও থাকবে না। নিলামে সর্বোচ্চ দাম দিয়ে তারা সরকারের জিম্মা থেকে যে-ভোজ্য তেল কিনে নিজেদের গুদোমে তুলবে, তারা তা ইচ্ছা হ'লে বাজারে ছাড়বে, ইচ্ছা না হ'লে ছাড়বে না। তাদের ইচ্ছার গতি-প্রকৃতি নির্ভর করবে সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণের উপর। চড়া দামে যা কেনা হয়েছে আরো চড়া দামে তা না বিক্রি করতে পারলে ব্যবসার ধর্মরক্ষা হয় না, এবং অন্য-কোনো দায়ে ব্যবসাদাররা নিজেদের বা অন্য-কারো কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ নয়। স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ : মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করে ব'লেই মজুতদাররা মজুতদার, ফাটকাবাজরা ফাটকাবাজ, ব্যবসাদাররা ব্যবসাদার। যে-ভোজ্য তেল দয়ার সাগর সরকার খুশি মনে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, এই মুহূর্তে বিক্রি না ক'রে বরঞ্চ ধ'রে রাখলে ইচ্ছামতো

আরো-অনেক চড়া দামে বিক্রি করা সম্ভব হবে মনে হ'লে ব্যবসাদাররা তা ধ'রে রাখবে, গুদামজাত ক'রে রাখবে ; বাজারে যখন আরো অনেক বেশি ঘাটতি দেখা দেবে, দাম আরো ঢের বাড়বে, তখন একটু-একটু ক'রে তারা গুদাম থেকে তেল ছাড়তে শুরু করবে, তাদের অঙ্কের হিশেবে কোনো খুঁত থাকবে না, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মুনাফায়, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দামে সরকার কর্তৃক বিদেশ থেকে আমদানি করা ভোজ্য তেল ব্যবসায়ীরা বাজারে ছাড়বে। সুতরাং সরকারি সিদ্ধান্তে বাজারে দাম কমবার কোনো প্রশ্নই নেই, দাম আরো বাড়বে।

নতুন দিল্লির সরকার জনসাধারণকে যা-ই ভাবুন না কেন, নিজেরা অন্তত গোমুখ্যু নন। তাঁরা ভালো ক'রেই জানেন কোন্ সিদ্ধান্তের কোন্ পরিণাম হ'তে পারে। নিলামে বিক্রি করলে ভোজ্য তেলের দাম যে পড়বে না, বরঞ্চ বাড়বে সেই জ্ঞান তাঁদের আছে। এবং আছে বলেই যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাতে উপনীত হয়েছেন তাঁরা। শ্রেণীস্বার্থান্ধ সবকারের চরিত্রই এটা। স্বশ্রেণীভুক্ত জন-পরিজনদের আখের গুছোবার কোনো সুযোগই নষ্ট হ'তে দিতে নেই : শ্রেণীযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সূত্র এটা। বাজারে আগুন লেগেছে, সেই আগুনের সদ্ব্যবহার করতে হবে। এটা ব্যবসাদারদের সরকার, মুনাফাবাজদের সরকার, সরকারেব প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম শ্রেণীভুক্তদের স্বার্থ প্রসারের উদ্দেশ্যপ্রসূত। তাই লোক-দেখানো সিদ্ধান্তগুলিও লোক-ঠকানো সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হয়। বাজারে আগুন, জিনিসপত্রের দাম চড়ছে, সরকার ন্যাকার সখি সাজেন, জিনিশপত্রের দাম কমাবার অছিলায় জিনিশপত্রের দাম আরো বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, ব্যবসাদারের ট্যাঁক আরো ভারি হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের এবংবিধ আচরণের হয়তো আরো একটি সংগোপন কারণ আছে। দেশের লোক বাঁচলো কি মরলো তাতে এই সরকারের তেমন-কিছু যায় আসে না, সরকারের ভাবনা এই মুহূর্তে অন্যত্র। প্রতিরক্ষা তথা নিরাপত্তা বাহিনী পুষবার নামে সরকারের ব্যয় হু-হু ক'রে বেড়েই চলেছে : নিয়ন্ত্রণহীন ব্যয়, সাপের জন্য খরচ করা হচ্ছে না ব্যাঙের জন্য বাইরে থেকে তা জানবার উপায় নেই, এমনকি সংসদসদস্যদেরও জানবার উপায় নেই, যা খরচ করা হচ্ছে তার কত পরিমাণ বোফর্সসদৃশ দুর্নীতির খাতে উধাও হয়ে যাচ্ছে তা পর্যন্ত জানবার উপায় নেই। অথচ খরচ বাড়ছে। নোটের পর নোট ছাপিয়েও সেই খরচের সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। যে করেই হোক, দিল্লির সরকারকে আরো টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। ভোজ্য তেল আমদানি করা হয়েছিল সরকারি বণ্টনব্যবস্থা মারফত

তা বিতরণ ক'রে বাজারে তেলের দামের উপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে। শিকেয় তোলা থাক সেই প্রাগৈতিহাসিক উদ্দেশ্য, আপাতত ব্যবসাদারদের কাছে নিলামে তেল বেচে কিছু লাভ করা হোক তো আগে, সেই লাভের টাকায় সরকারের ঘাটতি খানিকটা মেটানো যাবে। এই সরকারি কেরামতিতে বাজারে দাম যদি আরো বেড়েই যাবে, কী আর করা, শাসকগোষ্ঠীর কেউ তো আর মার খাচ্ছে না তাতে, তাদের বরং আরো সুবিধাই হবে, তারা নিজেরাও আরো-একটু বাড়তি আখের গুছিয়ে নিতে পারবে এই সুযোগে। এমন না হ'লে শ্রেণী সরকার।

যে-কোনো সংকটের সময় সাধারণ মানুষ আরো-বেশি শোষিত-বঞ্চিত হবেন, এবং দেশের ক্ষমতাশীল সরকার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখবেন, সেই শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবেন না, উল্‌টো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত দেবেন শোষকপ্রবঞ্চক সম্প্রদায়কে : এটাই ধ্রুব সমাজিক সত্য। কিন্তু গণমানসে এই সরল সত্যটি আদৌ সহজগ্রাহ্য নয়। সামন্ততান্ত্রিক একটি বিশেষ মোহের কুয়াশা এখনো সমাজের একটি বড়ো অংশের চেতনা সমাচ্ছন্ন ক'রে আছে। সামন্ততন্ত্রের অন্ধকারে অভাবী মানুষ, দুঃখী মানুষ, অত্যাচারিত-হতভম্ব মানুষ সর্বদা পরিত্রাতা অন্বেষণ-শীল। দুঃখরজনীর নিরসন ঘটবে, দুঃশাসন খর্ব হবে, এমন-কারো আবির্ভাব ঘটবে যিনি অত্যাচারিত-শোষিত মানুষদের ত্রাণ করবেন, তাঁদের হয়ে লড়াই করবেন, তাঁদের জন্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করবেন। সেই পরিত্রাতা হয় ঈশ্বর, নয় রাজা, নয় দূরস্থ সরকার। নায়েব-পেয়াদা-বরকন্দাজরা গরিব মানুষদের উপর যে-অত্যাচার চালাচ্ছে, রাজা বাহাদুর বা জমিদার সাহেব নিশ্চয়ই সেই খবর রাখেন না, সেই খবর তাঁর কাছে পৌঁছয় না, পৌঁছুতে দেওয়া হয় না, কিন্তু কোনোক্রমে যদি খবরটা তিনি পেয়ে যান, তড়িঘড়ি ছুটে আসবেন তিনি, রথ চালিয়ে কি ঘোড়া ছুটিয়ে, আমাদের গ্রামের মাঠে তিনি রথ বা ঘোড়া থেকে নামবেন, আমরা সাষ্টাঙ্গ হবো, তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন, আমাদের উপর অত্যাচারের বিবরণ আরো বিশদ ক'রে জানবেন, সঙ্গে-সঙ্গে যথাবিহিত ব্যবস্থা নেবেন, গোমস্তা-পেয়াদা-বরকন্দাজদের অত্যাচার-থেকে মুক্ত করবেন তিনি, আমরা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবো : অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, যুগের পর যুগ ধ'রে দূরবর্তী রাজা-জমিদার-সরকার সম্পর্কে এই কুহকবোধ দেশের বেশির ভাগ মানুষকে ঘোরের মধ্যে রেখে দিয়েছে। পেয়াদা-বরকন্দাজরা যে সরকার বা জমিদার থেকে আলাদা নয়, যে-অত্যাচারে তাঁরা জর্জরিত হচ্ছেন তা যে খোদ জমিদার বা

সরকারের নির্দেশ মেনেই করা হচ্ছে, এই প্রতীতিতে সাধারণ মানুষকে পৌঁছে দেওয়া এখনো যথেষ্ট দুঃসাধ্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশের দাম বাড়বে, গরিব, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ মূল্যবৃদ্ধির তাড়নায় হাঁসফাঁস করবেন, অথচ নতুন দিল্লিস্থ সরকার বাহাদুর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখবেন, মানুষের দুর্দশা অপনোদনের জন্য ন্যূনতম চেষ্টাটুকু করবেন না, এমনকি হয়তো দুর্দশা যাতে বাড়ে তার জন্য একটি-দু'টি বাড়তি অপকর্ম সংঘটিত করবেন: শাদামাটা গৃহস্থ মানুষ এরকম কোনো বাস্তবতা এখনো যেন ঠিক মেনে নিতে পারেন না, তাঁদের দু'চোখে বিস্ফারিত বিস্ময়।

আস্তে-আস্তে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাবেন তাঁরা, শ্রেণীস্বার্থের, শ্রেণীদ্বন্দ্বের পাটিগণিত একটু-একটু ক'রে রপ্ত হবে তাঁদের। সরকার নিরপেক্ষ-নিরালম্ব কোনো বস্তু নয়, সেই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারই হোক, কিংবা রাজ্য সরকার। প্রত্যেকটি সরকারকে আবৃত ক'রে শ্রেণীস্বার্থ, স্ব-স্ব শ্রেণীভুক্তদের স্বার্থ দেখবার জন্য সরকার। সুতরাং যাঁরা মাঝে-মাঝে অনুযোগ করেন, কেন্দ্র-রাজ্য সংঘর্ষের কচকচি আর ভালো লাগে না, আপনাদের ঝগড়াঝাঁটি মুলতুবি রাখুন না কেন রাজ্যের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, জাতির স্বার্থে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারগুলি মিলে-মিশে একযোগে কাজ করুন না আপনারা, তাঁদের সবিনয়ে বলতেই হয়, এক অলীক কল্পরাজ্যে বিহার করছেন তাঁরা। যাঁরা গলা কাটতে চাইছেন, আর যাঁরা টিঁকে থাকতে চাইছেন, এই সমাজে তাঁদেরও বেঁচে-বর্তে থাকার অধিকার আছে সেটা প্রমাণ করতে চাইছেন, এই দুই মেরুর মধ্যে বোঝাপড়ার অথবা যুদ্ধবিরতির কোনো অবকাশ নেই। কৌশলগত কারণে হয়তো কোনো সাময়িক চুক্তি হ'তে পারে, কিন্তু শ্রেণীযুদ্ধ, শেষ পর্যন্ত, শ্রেণীযুদ্ধই।

অসম বিকাশের লক্ষণে ভারাক্রান্ত দেশ, আমাদের সংবিধান যাঁরা রচনা করে-ছিলেন, বিচক্ষণতার অভাব ছিল না তাঁদের. তাঁরা অনুমান করতে পেরেছিলেন কোনো-না-কোনো সময়, এই রাজ্যে নয় তো সেই রাজ্যে, শোষিত-বঞ্চিত-অত্যাচারিত শ্রেণীভুক্তরা মাথা তুলে দাঁড়াবেন, তাঁরা সংঘবদ্ধ হ'তে শিখবেন, এমন কি হয়তো তাঁরা, এই রাজ্যে নয় তো সেই রাজ্যে, সরকার গঠন করতে সক্ষম হবেন পর্যন্ত। সংবিধানরচয়িতাদের স্থূলে ভুল ছিল না, দূরদর্শী ছিলেন তাঁরা সবাই, শ্রেণীস্বার্থ কী ক'রে আবহমানকাল ধ'রে রক্ষা করতে হয় তার বিধি-ব্যবস্থায় তাই তাঁরা কোনো খুঁত রাখেননি। একটি-দু'টি রাজ্য সরকার হয়তো শ্রেণী-শত্রুদের খপ্পরে গিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু ঘাবড়াবার কিছু নেই, সংবিধান এমন-

ভাবে রচনা করা হবে যে রাজ্য সরকারগুলির টিকি বাঁধা থাকবে কেন্দ্রের কাছে, আইন করবার ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা, আর্থিক ক্ষমতা সব-কিছুর জন্য মুখাপেক্ষী হ'তে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার যদি চূণের ঘরে দাঁড়িয়ে অঢেল অসত্য কথা বলেন, অঢেল অন্যায় করেন, রাজ্য সরকারগুলির হাতে উপস্থিত মুহূর্তে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের তেমন-কোনো মোক্ষম অস্ত্র থাকবে না।

নতুন দিল্লির সরকার এটা জানেন ব'লেই ভোজ্য তেলের দাম কমাবার অছিলায় পঞ্চাশ হাজার টন তেল, যা কষ্টার্জিত বিদেশী মুদ্রা খরচ ক'রে সরকারি খাতে কেনা হয়েছিল, ব্যবসাদারদের কাছে নিলামে ঝেড়ে দেওয়ার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেন। কিন্তু এক মাঘে তো শীত যায় না।

## সর্বভূতেষু

পোশাকি ভাষায় আমরা বলি সামন্ততন্ত্র, সোজা বাংলায় জমিদারি মানসিকতা, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এখন মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, সামন্ততন্ত্রের ভূত আমরা কাঁধ থেকে গোড়ার দিকে যতটা ঝেড়ে নামাতে সফল হয়েছিলাম, স্বাধীনতার পর চল্লিশ বছর ধ'রে ততটাই যেন অসফল হয়েছি, এমনকি সব-মিলিয়ে হয়তো পিছিয়েই পড়েছি আরো।

ব্যক্তিভিত্তিক দৃষ্টান্ত না দিতে হ'লেই ভালো হতো, কিন্তু উপায় নেই, সামন্ততন্ত্র ও ব্যক্তিপূজার মধ্যে জড়াজড়ি সম্পর্ক। আমাদের দেশের প্রধান মন্ত্রী গত বছর ব্যাঙ্গালোর শহরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে অনেক গালভারি কথা ব'লে এসেছিলেন : দেশে বিজ্ঞানচর্চার মান অত্যন্ত নেমে এসেছে, বৈজ্ঞানিকরা অল্পে তুষ্ট হচ্ছেন; মহত্তর, বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য-আদর্শের দিকে এগোচ্ছেন না, এবার থেকে তাঁরা কাজকর্মে আরো একটু মন দিন ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন হেডমাস্টার মশাই ইশকুলের ছেলেদের সদুপদেশ দিচ্ছেন। প্রধান-মন্ত্রী মহোদয়ের বিদ্যার বহর তেমন পরিব্যাপ্ত নয়, বিদেশের যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন সেখান থেকে দু'বছর বাদে তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, পঠন-পাঠনে সুবিধা করতে পারছিলেন না ব'লে, তারপর আর তিনি পড়াশুনার ধারকাছ দিয়ে থাকেননি। কিন্তু অতীত গৌরব-কাহিনী প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনা তথা বাগ্‌শক্তিকে আদৌ পঙ্গু করতে পারেনি। বাঘা-বাঘা বৈজ্ঞানিকদের সভায় গিয়ে তিনি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে আসেন, এ ধরনের বক্তৃতাবর্ষণ, অন্তত তাঁর পক্ষে, কতটা বেমানান, সেই বোধশক্তি যেন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। যেটা সমান বিস্ময়জনক, সভায়-জড়ো-হওয়া বিদ্বজ্জনমণ্ডলী প্রধান মন্ত্রী-বর্ষিত অপমানজনক উক্তি নীরবে শোনেন, বক্তৃতান্তে হাততালি দিয়ে থাকেন পর্যন্ত। এবং এই বছরও যথাবিহিত প্রধান মন্ত্রী ফের বিজ্ঞান কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হয়েছেন, ধ'রেই নেওয়া যায় আরেক দফা পুরনো বক্তৃতা বর্ষণ করবেন : বৈজ্ঞানিকদের আরো দায়িত্বশীল হ'তে হবে, দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা ক'রে আরো নতুন-নতুন আবিষ্কারে নিজেদের নিয়োগ করতে হবে, অন্যথা তাঁদের বৈজ্ঞানিক জীবন ব্যর্থ···। সামান্তন্ত্র

প্রতিবাদ সভার কোনো প্রান্ত থেকে ধ্বনিত হবে না, প্রতিবারের মতো, জড়ো-হওয়া বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় প্রধান মন্ত্রীর জ্ঞানগর্ভ ভাষণকে করতালিসহ স্বাগত জানাবেন।

এই দাসানুদাস মানোভাবের দুটো আলাদা কারণ আছে। প্রথম কারণ, সরকারের কাছে টিকি বাঁধা বৈজ্ঞানিকদের। তাঁদের গবেষণার টাকা জোগান সরকার, তাঁদের মাইনের-ভাতার টাকা আসে সরকারের কোষাগার থেকে, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম-উপকরণাদির জন্য তাঁদের সরকারি মন্ত্রক-দপ্তরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। চিনি জোগান যে-চিন্তামণি, তাঁর অম্লমধুর বাণী মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু না-শুনে উপায় কী: তাঁদের বৃত্তির সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা ক'রে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক তাই সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনগুলি মেনে নেন, একটু-আধটু গা-জ্বালা-করা কথা শোনা তো মাত্র, তা না হয় একদিনের জন্য কোনোক্রমে শোনাই গেল, বছরের বাকি সময়টা তো যথেচ্ছ কাজ করা যাবে, এবং পয়সাকড়ি-সরঞ্জামের অসংকুলান হবে না।

দ্বিতীয় কারণ কিন্তু আরো অনেক গভীরে। খুব কম বৈজ্ঞানিকই আছেন যিনি নিরীশ্বরবাদী। ভারতবর্ষের মানুষের আবহমান কাল ধ'রে দৈব ক্ষমতায় প্রবল আস্থা, এই আস্থার সম্মোহ থেকে বৈজ্ঞানিকরাও মুক্ত নন। যখন চার-দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, অন্যান্য দেশবাসীর মতো বৈজ্ঞানিকদেরও একটি বড়ো অংশ মনে করেন হঠাৎ কোন ঐশী শক্তি এসে পরিত্রাণের পথ দেখাবেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে দেশের নেতৃবৃন্দদের জনসাধারণ দেবতার আসনে বসিয়ে-ছিলেন: বিধাতাপুরুষরা অদৃশ্য, তাঁরা প্রত্যক্ষ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু নেতাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি-প্রণাম করতে পারছি, তাঁরাই আমাদের দেবতাসদৃশ, তাঁরাই আমাদের পথ দেখিয়ে জ্যোতির্ময়লোকে পৌঁছে দেবেন। 'নরকে দেবতা করি, দেবতাকে নর' শুধু কথার কথা ছিল না, আমাদের প্রাত্যহিক অভ্যাসের সঙ্গে সেই আচরণ মিশে গিয়েছিল, দেবদ্বিজে ভক্তি ও নেতৃবন্দনা প্রায় সমার্থক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। এই মানসিকতা থেকে দেশের বৈজ্ঞানিকরাও মুক্ত ছিলেন না। পরাধীন দেশ, সুযোগ-সুবিধা খণ্ডিত-সংক্ষিপ্ত, তারই মধ্যে পাঠাগারে-গবেষণাকক্ষে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় স্ব-স্ব কর্তব্যে নিয়োজিত, তাঁরাও স্বপ্ন দেখছেন দেশ একদিন স্বাধীন হবে, সেই স্বাধীন দেশে বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পাবেন, সমাজ তাঁদের জন্য উপচার সাজিয়ে অপেক্ষা করবে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চা ও ব্যবহার সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাবে ভবিষ্যতের সেই স্বাধীন-সুন্দর প্রভাতবেলায়। যে-

নেতারা সেই স্বাধীনতার দিকে দেশকে-জাতিকে পথ প্রদর্শন ক'রে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা দেবোপম, তাঁরা নমস্য, তাঁরা প্রণম্য, বৈজ্ঞানিকদেরও তাঁরা প্রণম্য। জাতীয়তাবাদের এই উন্মাদনাঘোর থেকেই স্বাধীনতাব পূর্বাহ্নে, চল্লিশের দশকে, জবাহরলাল নেহরুকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছিল। জবাহরলাল নেহেরু যদিও বিজ্ঞানানুরাগী ছিলেন, কোনো অর্থেই বৈজ্ঞানিক ছিলেন না তিনি। কিন্তু বিদেশী শাসকদের অবহেলার প্রত্যুত্তর হিশেবে, জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় জবাহরলাল নেহরুকে মালা পরিয়ে তাঁদের সভাপতিরূপে বরণ ক'রে নিলেন : 'নরকে দেবতা করি, দেবতাকে নর' এই আবাহনে নিজেদের আবদ্ধ রাখলেন না তাঁরা, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'-পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন।

জবাহরলাল নেহরু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হয়ে গর্ববোধ করেছিলেন যেমন, মজাও পেয়েছিলেন তেমন। কিন্তু মুশকিল হলো নেতারাও মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ, তাঁরাও ষড়রিপুর প্রভাবমুক্ত নন। কয়েক বছর বাদে দেশ স্বাধীন হলো, নেতারা স্বাধীন দেশের মন্ত্রী হলেন, তাঁদের ঘরে সম্ভার-বৈভবের তুলনা নেই। এবং তাঁদের মাথায় পোকা ঢুকে গেল। স্বাধীনতা আন্দোলনের মুহূর্তে, আমাদের মলিন আকাশ, সামনের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় না আমরা কোথায় আছি-কোথায় যাচ্ছি, এটা প্রয়োজন ছিল আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকি, সাধারণ মানুষ, নেতৃবৃন্দ, দেশের বিদ্বৎসমাজ, একে অপরের কাছ থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করি, পরস্পরকে আনুগত্যের অঙ্গীকার প্রদান করি। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্বে পরিবেশ ও প্রয়োজনের রকমফের ঘটেছে, রকমফের ঘটতে বাধ্য : এবার স্ব-স্ব বৃত্তিতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে সাধারণ মানুষকে, মন্ত্রীবর্গকে, কবিকে, সাহিত্যিককে, বৈজ্ঞানিককে। এই সোজা সত্যটি নেতৃসম্প্রদায় বুঝতে রাজি হলেন না। স্বাধীনতার আগে দেশপ্রেমিক বিদ্বজ্জন তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, নেতারা ধ'রে নিলেন এই অভ্যর্থনায় তাঁদের জন্মগত অধিকার। নেতারা আর শুধু নেতা নন, তাঁরা মন্ত্রী। মন্ত্রীরা বিদ্বজ্জন সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চেপে ব'সে রইলেন। জবাহরলাল নেহরু বছরের পর বছর ধ'রে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্মেলনে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করলেন। এবং শুধু বৈজ্ঞানিক সম্মেলন নয়, তিনি সাহিত্য সম্মেলনেও যাওয়া-আসা শুরু করলেন, তারপর ইতিহাস সম্মেলনে, দর্শন সম্মেলনে, অর্থনীতিবিদ্‌দের বৈঠকে। ক্রমশ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নতুন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জন্মগ্রহণ করলো : অনুষ্ঠানটি

বিবাহ হোক, শ্রাদ্ধ হোক, অন্নপ্রাশন হোক, মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন অপরিহার্য। কানু বিনা গীত নেই, মন্ত্রী বিনা সম্মেলন নেই, তা সেই সম্মেলন যত গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে হোক না কেন।

এই সাংস্কৃতিক অঘটনের ভুক্তভোগী এখন গোটা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা। যে-সম্মেলনের প্রধান ঘোষিত উদ্দেশ্য নিজেদের মধ্যে নিভৃতে জ্ঞানাধ্যয়ন, বিভিন্ন গাবেষণিক সমস্যা নিয়ে ভাব তথা মতামত বিনিময়, মন্ত্রীদের অভ্যাগমে তা মহোৎসবের প্রকৃতি পরিগ্রহণ করে, মন্ত্রীদের পরিচর্চাতেই সময় ও সামর্থ্য ব্যয় হয়ে যায়। অন্য অসুবিধাও ঘটে। মন্ত্রীরা রক্তমাংসের মানুষ, ষড়রিপুর দাস। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জ্ঞানীগুণীদের সভায় বিভিন্ন ব্যাপারে একাদিক্রমে বক্তৃতা দিয়ে-দিয়ে তাঁদের মনেও অনেক সময় ধারণা প্রোথিত হয়ে যায়, কে জানে, হয়তো সত্যি-সত্যিই তাঁরা, মন্ত্রীরা, সকল-কলাপারঙ্গম, তাঁদের প্রতিভার তুলনা নেই। জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো বিশেষ প্রশাখার কোনো বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে হঠাৎ তাঁদের মনে হঠাৎ যদি কোনো উটকো ধারণা জড়ো হয়, তাঁরা তখন বিদ্বান মানুষদের সভায় গিয়ে নিজের খেয়ালি ধারণাটি সরবে ঘোষণা করা একান্ত কর্তব্য ব'লে মনে করেন। বিদূষকের দল আশেপাশেই থাকেন, তাঁরা ঘাড় নাড়েন, গবেষণা হোক, মন্ত্রী-কর্তৃক নির্দেশিত সমস্যাটি নিয়ে আরো গবেষণা হোক। রবীন্দ্রনাথ সামন্ততন্ত্রকে আখ্যা দিয়েছিলেন কর্তার-ইচ্ছায়-কর্ম। তাই-ই হয়, বৈজ্ঞানিকদের রুচিঅভিরুচি-ইচ্ছা-অনিচ্ছা মুখ থুবড়ে পাশে প'ড়ে থাকে, গবেষণার টাকা ঢালা হয় মন্ত্রীর খেয়ালপনা মেটাতে। স্বাধীন ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস ঘাঁটলে এই গোছের মন্ত্রীভজন গবেষণার ভূরি-ভূরি উদাহরণ তুলে ধরা সম্ভব।

হাতের কাছে যে-দৃষ্টান্ত, সেটিও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতী যখন আইন প্রণয়ন ক'রে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হলো, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরুকে প্রতিষ্ঠানের আচার্যরূপে ঘোষণা করা হলো সঙ্গে-সঙ্গে। বিশ্বভারতীর প্রধান পুরুষ আচার্য। যেহেতু জবাহরলাল নেহরু রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও বরাবর জ্ঞানচর্চা করেছেন, বইপত্র রচনা করেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্তও ছিলেন, বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে তাঁকে আদৌ বেমানান মনে হয়নি। তাঁর পিতার জ্ঞানতৃষ্ণার অণুতমও ইন্দিরা গান্ধির মধ্যে ছিল না, কিন্তু ললিতকলায় তাঁর অন্তত গভীর আগ্রহ ছিল, তাই তাঁকেও বিশ্বভারতীর আচার্য পদে বৃত হওয়ার ব্যাপারটাকে তেমন কুরুচিপূর্ণ মনে হয়নি। অপর পক্ষে

মোরারজী দেশাই প্রধান মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হবার পর সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান খাটিয়ে এটা বুঝেছিলেন তাঁর পক্ষে বিশ্বভারতীর আচার্য হওয়া উদ্ভটকিম্ভূত ব্যাপার হবে। অন্য হাজার বিষয়ে মোরারজী দেশাইকে সমালোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু এই বিচারের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাতেই হয় যে তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী হবার যোগ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বভারতীর আচার্য হবার অধিকার নেই, আচার্যপদে তিনি তাই গুজরাটের বিখ্যাত কবি মনীষী উমাশংকর যোশীর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান প্রধান মন্ত্রী সামন্ততন্ত্রের আদর্শ ধারক, যে-উত্তরাধিকারসূত্রতাবোধে তিনি রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হয়েছেন, তারই তাগিদে বিশ্বভারতীর আচার্য হিশেবেও নিজেকে বৃত হ'তে দেখে তিনি পরিতৃপ্ত, কোনো দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা তাঁকে দীর্ণ করছে ব'লে বাইরে থেকে অন্তত মনে হয় না।

এবং এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যাকরণের বিরুদ্ধে তেমন-কোনো প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'তেও শোনা যায় না। সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা স্বতঃসিদ্ধতার মতো দেশের অধিকাংশ মানুষের চেতনায় সুপ্রোথিত। মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীবর্গ জনপ্রতিনিধি, সমাজের সামগ্রিক প্রত্যাশার প্রতিবিম্ব তাঁরা, কিন্তু মাত্রাজ্ঞান পেরিয়ে স্ব-স্ব বৃত্তের বাইরে গিয়ে তাঁদের যে-অনধিকার চর্চা, তা-ই সামন্ততন্ত্র। অথচ বৈজ্ঞানিকরা মুখ বুঁজে অর্বাচীন বক্তৃতা হজম করেন, বিশ্বভারতীতে দিগ্‌গজ পণ্ডিতরা বংশবদ টিকি নাড়েন। এবংবিধ আচরণও কিন্তু সামন্ততন্ত্রের সমাচ্ছন্ন প্রভাবের স্বাক্ষরবাহী।

## ভারতভাগ্যবিধাতা

প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষকে যেন নিলামে চড়ানো হয়েছে। নাগাল্যাণ্ডে নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে প্রধান মন্ত্রী ঐ রাজ্যে সফরে গেলেন। কোনো ঢাকাঢুকির ব্যাপার নেই, প্রধান মন্ত্রী নিলাম হাঁকলেন : যদি কংগ্রেস দলকে জিতিয়ে দেয় নাগাল্যাণ্ডের লোকেরা, পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য একটি বিধান পরিষদ তৈরি ক'রে দেওয়া হবে। বিধান সভা তো আছেই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি বিধান পরিষদও। অনেক-অনেক রাজ্যে—যেমন পশ্চিম বঙ্গে, অন্ধ্র প্রদেশে—বিধান পরিষদ তুলে দেওয়া হয়েছে, বেশ-কয়েকটি রাজ্যে—যেমন কেরলে অথবা হরিয়ানায়ই—আদপেই কোনোদিন পরিষদ গঠনের কথা ভাবা হয়নি। গরিব দেশ, রাজ্যস্তরে পাশাপাশি দু'টি আইন সভা বেমানান, এ ধরনের অযথা অপচয়ের কোনো যৌক্তিকতা নেই। নাগাল্যাণ্ডে সব মিলিয়ে মাত্র আট লক্ষের মতো মানুষ, পশ্চিম বঙ্গে হাওড়া জেলার যে-জনসংখ্যা, তারও অর্ধেকের কম। ষাটটি আসন-বিশিষ্ট বিধান সভা আছে নাগাল্যাণ্ডে, সেই বিধান সভার জন্যই নির্বাচন। নির্বাচনে প্রধান মন্ত্রীকে জিততেই হবে, তাঁর দলকে জেতাতেই হবে, অতএব নীতি-নিয়ম-যুক্তিকে নিলামে চড়াও, বিধান সভার নির্বাচনে যদি আমার দলকে ভোট দাও তোমরা, বিধান সভার পাশাপাশি আমি তোমাদের জন্য একটি বিধান পরিষদও গঠনের ব্যবস্থা ক'রে দেবো। এই পরিষদেও নিদেন পক্ষে ষাট জন সদস্য থাকবেন, তাঁদের জন্য বেতন-ভাতার ব্যবস্থা থাকবে, সাধারণ মানুষের তাতে কার কতটা লাভ না ভাবলেও চলবে। আসলে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে আদর্শ-কর্মসূচী ইত্যাদি নিয়ে পারস্পরিক তুলনা-প্রতিতুলনা থেকে অনেক দূর সরিয়ে আনা হয়েছে, নির্বাচন এখন নিলামের হাঁকের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন কংগ্রেসের নেতারা, সেই দলের যিনি সর্বেসর্বা, সেই প্রধান মন্ত্রী। আইন অবশ্য বলে নির্বাচনের প্রাক্-মুহূর্তে এ ধরনের প্রতিশ্রুতির বন্যা বওয়ানো বিধিবহির্ভুত, কিন্তু দেশের প্রধান মন্ত্রীকে তো আইনের তোয়াক্কা করতে হয় না। তবে যেহেতু তিনি দেশের প্রধান মন্ত্রী, তাঁর তো বোঝা উচিত নাগাল্যাণ্ডের আট লক্ষ মানুষের জন্য আলাদা বিধান পরিষদ গঠন করা হ'লে এক ধরনের প্রবণতা ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য ; অপ্রয়োজনীয় সম্ভার, প্রত্যেক রাজ্যেই হয়তো নতুন ক'রে ধুয়ো

উঠবে বিধান পরিষদ চাই, শেয়ালদের যেহেতু ভাঙা বেড়া দেখিয়েছেন স্বয়ং দেশের প্রধান মন্ত্রী। নাগাল্যাণ্ডে বিধান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হ'লে, মেঘালয়-মিজোরাম-ত্রিপুরা-সিকিম-হিমাচল প্রদেশ-গোয়া সর্বত্রই দাবি উঠতে পারে এই-এই রাজ্যেও চাই, কোন্ যুক্তিতে সেই দাবি খণ্ডন করবেন প্রধান মন্ত্রী? তা সত্ত্বেও তিনি যদি ব'লে বসেন, উঁহু, নাগাল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে রাজি হয়েছি ব'লেই মেঘালয়ের ক্ষেত্রে সম্মত হবো এমন তো কথা নেই, আগুন জ্বলবে মেঘালয়ে, সেই আগুন নেভাতে গলদঘর্ম হ'তে হবে সবাইকে। ক-কে যা দেওয়া হয়েছে, খ-কে তা থেকে ইচ্ছা ক'রে বঞ্চিত করা হয়েছে, এই ধারণা থেকেই দেশে বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয়। অদূরদর্শী প্রধান মন্ত্রী নির্বাচনী সফরে এসে চিন্তাহীন একটি প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ ক'রে প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রশ্রয় দিয়ে গেলেন, এখন অনেক দূর পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতির জের গড়াবে।

অথচ কংগ্রেস দলের, এবং সেই দলের নেতার, দেশের প্রধান মন্ত্রীর, এখন এমনই শোচনীয় অবস্থা যে নাগাল্যাণ্ডের নির্বাচনে কোনক্রমে জয়লাভ করা মরণ-বাঁচন সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে মাথা-ঘামানোর আপাতত দরকার নেই, দেশের স্বার্থকে নিলামে চড়াও, যদি বিধান পরিষদের আগাম প্রতিশ্রুতি দিলে জেতার সম্ভাবনা বাড়ে, তা হ'লে অন্য সমস্ত বিবেচনা বিসর্জনান্তে প্রতিশ্রুতিটি দেওয়ার সিদ্ধান্তই টেঁকে। এখন খবরকাগজে লেখা-লেখি হচ্ছে, ঐ ষাট-আসন বিশিষ্ট বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার জন্য কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে নাগাল্যাণ্ডে নাকি সাকুল্যে পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। জনসাধারণেরই পকেট কেটে কংগ্রেস দল এই পঞ্চাশ কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছে: ব্যবসাদাররা গোপনে বা প্রকাশ্যে চাঁদা দিয়েছে সেই টাকা, ঠিকাদাররা লুকিয়ে উৎকোচ প্রদান করেছে সেই টাকা, রাষ্ট্রীয় খাতে আমদানি-রপ্তানি কেনা-বেচার কমিশনের টাকা। কিন্তু নির্বাচনে জিতেও সোয়াস্তি নেই। ষাটটির মধ্যে আটত্রিশটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা, যে ক'রেই হোক, জিতেছেন। তাঁদের মধ্যে একুশ জনকে মন্ত্রী করতে হয়েছে, বিধানসভার অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ হবেন আরো দু'জন, অবশিষ্ট যে ক'জন আছেন তাঁদের হয়তো নানান রাষ্ট্রীয় সংস্থা খুলে তাদের দায়িত্বে বসিয়ে দেওয়া হবে, বাড়ি-গাড়ি-বাড়তি ভাতার নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা। স্বাধীনতার প্রথম পর্বে একটি প্রথা চালু করা হয়েছিল, মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যার ঊর্ধ্বসীমা বিধান সভা বা সংসদের সমগ্র সদস্যসংখ্যার এক-দশমাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু নিয়মনীতিপ্রথা এখন ধুয়ে-মুছে গেছে।

দেশকে যখন নিলামে চড়ানো হয়েছে, বিধান সভার যে-সদস্যকেই মন্ত্রী করা না হবে, তিনিই দলত্যাগের ভয় দেখাবেন, এবং এক-তৃতীয়াংশের মতো যদি দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আড়াই-বছর-আগে-গৃহীত-হওয়া আইন প্রয়োগ ক'রেও তাঁদের ঠেকানো যাবে না। নিলামের প্লাবনে গোটা দেশ এখন ভেসে যেতে বাধ্য।

হাতের কাছে তার অন্য প্রমাণ দার্জিলিঙ সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের লীলাখেলা। পঞ্চাশ বছরের তদ্গত সাধনা, অধ্যবসায় ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি দার্জিলিঙ অঞ্চলে সর্বভাষাভাষী শ্রমজীবী মানুষদের একটি সংঘ-বদ্ধ, শক্তিশালী আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার্থে সর্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে যে-আন্দোলন সদাপ্রস্তুত। দিল্লির কর্তাব্যক্তিদের রাতে ঘুম নেই, পশ্চিম বাংলার সর্বস্তরের সর্ববর্ণের খেটে-খাওয়া জনসাধারণের অটুট ঐক্যে যে-ক'রেই-হোক চিড় ধরাতে হবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হ'লে যদি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য দান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে তা-ই হোক। গত দেড় বছরের অনবচ্ছিন্ন অবসন্ন রক্তাক্ত নাটক সেই অভি-সন্ধির পরিচয় বহন করছে। জাতীয় সংহতি রক্ষার পণে দৃঢ়বদ্ধ নেপালী কমরেডরা দিনের পর দিন ধ'রে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে চলেছেন, অনেক মূল্যবান প্রাণ ঝ'রে পড়েছে। আদর্শবাদী কমরেডরা হতোদ্যম হননি তা হ'লেও, চোখের জলে সহকর্মীদের বিদায় দিয়ে নতুন ক'রে বিভেদপন্থীদের বিরুদ্ধে নিজেদের জড়ো করেছেন। অথচ জাতীয় ঐক্য ও সংহতির এই অতন্দ্র প্রহরীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে দিল্লির সরকার একটি অর্ধবাক্যও আজ পর্যন্ত ব্যয় করেননি, তাঁর সম্পূর্ণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কী ক'রে আরো-একটু বাড়তি প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তা নিয়ে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সর্বশেষ ধুয়ো পার্বত্য পরিষদের সঙ্গে শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সকেও যুক্ত করতে হবে। এই দাবির অদ্ভুত অযৌক্তিকতা নিয়ে প্রধান মন্ত্রী বা তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিন্তু একটি বিরূপ মন্তব্যও করেননি। এই গোছের দাবির পুনঃপৌনিক উচ্চারণের মধ্যেও যে দেশের সার্বিক সর্বনাশের বীজ নিহিত আছে, তা নিয়ে তাঁদের কোনো মাথা-ব্যথা নেই। এখন ঘিসিঙয়ের কায়দায় যে-কেউই দাবিপত্র পেশ ক'রে বসতে পারেন, যেহেতু পূর্ণিয়া জেলার শতকরা তিরিশ ভাগ মানুষ বঙ্গভাষী, অতএব ঐ জেলাকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অথবা যেহেতু বোম্বাই শহরে বসবাস-কারীদের শতকরা পনেরো জন উত্তর প্রদেশ থেকে আগত, ঐ শহরের প্রশাসনে

উত্তর প্রদেশ সরকারকে অন্তত শতকরা পনেরো ভাগ দায়িত্ব দিতে হবে। দেশে হানাহানি বাড়ুক, অদ্ভুতকিম্ভুত দাবির পাহাড় জ'মে উঠুক, সেই সব দাবিদাওয়া নিয়ে জনগণ, তাঁদের রুটিরুজির সমস্যা ভুলে, সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন-লক্ষ্য পাশে সরিয়ে রেখে, উন্মত্ত হয়ে উঠুক : দেশের যাঁরা সতত অনিষ্ট চিন্তা করেন, তাঁদের এটাই পরম মনোবাঞ্ছা।

কিন্তু কেন্দ্র নির্বাক, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের জিভ জড়িয়ে আসে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বোঝাতে চাইছেন তিনি এক কথার মানুষ, যদি পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি-ডুয়ার্স সম্পর্কে বিচ্ছিন্নতা-বাদীদের সর্বশেষ দাবিটি মেনে নেন, তা হ'লে তিনিও মানবেন, অন্যথা না। যেন দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার একমাত্র দায় পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর, কেন্দ্র এ-ব্যাপারে হাত-পা ধোওয়া। দেশকে যদি টুকরো-টুকরো করার চক্রান্ত হয়ে থাকে, মনোভাবটা যেন তা হ'লে কেন্দ্রের কিছু করার নেই, তা ছাড়া ঘিসিঙ বড়ো ভালো ছেলে, এঁকে গোপনে আমরা একটু আদর-আপ্যায়ন ক'রে থাকি। এ এক আশ্চর্য পরিস্থিতি : এঁরা একদিকে জাতীয় সংহতি পরিষদ গঠন করবেন, অনেক ধোপা-বাড়ি-ফেরত ভালো-ভালো কথা বলা হবে সেই পরিষদের বৈঠকে, এঁরাই আবার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দিকে চোখ টিপবেন, চালিয়ে যান আপনারা, তলে-তলে নতুন দিল্লি থেকে আপনাদের প্রশ্রয় দিয়ে যাবো আমরা।

তা না হ'লে হঠাৎ কোন্ রহস্যের সূত্র ধ'রে পশ্চিম বঙ্গে হঠাৎ শিবু সোরেন মহোদয়ের অভ্যুদয় ঘটে? সোরেন মশাই এক সঙ্গে আমিশাষী-নিরামিশাষী, বিহারে তিনি ঝাড়খণ্ডী দলের নেতৃত্ব দান ক'রে থাকেন, আবার নির্বাচনের মরশুম সমাগত হ'লে কংগ্রেসী প্রসাদ কুড়োবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সাড়ে চার বছর জুড়ে বর্তমান সমাজব্যবস্থার অনাচারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের হতজীর্ণ দশা নিয়ে বিবিধ উপাখ্যান রচনা করেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকি ছাড়েন, অথচ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বর্তমান সমাজব্যবস্থার সমস্ত অনাচারের জন্য দায়ী যে-রাজনৈতিক দল, সেই কংগ্রেসের ছত্রতলে আশ্রয় অন্বেষণ করেন, আশ্রয় মেলেও সঙ্গে-সঙ্গে। যেহেতু পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন অত্যাসন্ন, এবং গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের খুঁটির জোর সম্পূর্ণ অন্তর্হিত, একটু বহির্সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শিবু সোরেন মশাইয়ের কংগ্রেস দলের প্রতি ঋণশোধের ঋতু এটা, সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের তিনটি জেলাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি নিয়ে তাঁকে সোচ্চার হ'তে হচ্ছে।

একই কাহিনী ত্রিপুরা রাজ্যে। চল্লিশ বছরের একাদিক্রম সাধনায়, কমিউনিস্ট পার্টির প্রেরণায়, বামপন্থী আন্দোলন সমতল-বনাঞ্চল-পাহাড়ের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে সফল হয়েছেন, সারা রাজ্য জুড়ে বাম ফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে তাঁদের আর্থিক-সামাজিক সংগ্রাম দ্রুত এগিয়ে চলেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা হতাশ, সন্ত্রস্ত। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারের নিদ্রাহীন রাত্রি, যে-ক'রেই-হোক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শক্তিতে ফিরিয়ে আনতে হবে। ১৯১৯ সালের মতো, এবারেও তাই কংগ্রেস দলের প্রকাশ্য রাখীবন্ধন উপজাতি সমিতির সঙ্গে: এ লড়াই বাঁচার লড়াই, দেশের সংহতিকে বিপদের গর্তে না ফেলতে পারলে কেন্দ্রের, প্রধান মন্ত্রীর, কংগ্রেসের রাহুমুক্তি নেই।

দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ পরিব্যাপ্ত হ'লে, এখানে-ওখানে অন্তঃকলহ বাড়লে, কংগ্রেস বা প্রধান মন্ত্রীর কী লাভ তা ভেবে নির্ণয় করা সাধারণ বুদ্ধিতে সত্যিই কুলোয় না। কিন্তু তাঁদের দিক থেকে একটি প্রচ্ছন্ন যুক্তি নিশ্চয়ই আছে। এত বড়ো দেশ পরিচালনা তাঁদের সাধ্যের বাইরে ; যত দিন যাচ্ছে, তত বেশি তাঁরা সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা আরো বেশি ক'রে মাথাচাড়া দিচ্ছে, দিল্লির বর্তমান কর্তাব্যক্তিরা অভিজ্ঞতায় খাটো, তাঁরা হালে পানি পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা অসাধারণ বুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন। রাজ্যে-রাজ্যে অসন্তোষ, রাজ্যে-রাজ্যে বিরোধীরা সরকার গঠন করেছেন, তাঁরা কেন্দ্রের শ্রেণীস্বার্থান্ধ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছেন, তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে হবে, তা করতে হ'লে প্রতিটি প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লেলিয়ে দেওয়া যাক, এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জ্যোতি বসু সম্প্রদায়ের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে, নিজেদের-নিজেদের ঘর সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন জ্যোতি বসু সম্প্রদায়, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের শক্তি বা সময় আর থাকবে না তা হ'লে তাঁদের, অতএব ঘিসিঙ-সোরেন-উপজাতি সমিতি প্রভৃতিদের জড়ো করা যাক।

নিজের নাক কেটে নিজেদেরই যে যাত্রাভঙ্গ করছেন তা বোঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত, মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রধান মন্ত্রীর নেই। এত বড়ো দেশ যেন খেলার পাত্র, মর্জিমতো তাঁরা ভাঙবেন-চূর্ণ করবেন। দেশ থাকুক না থাকুক কী যায় আসে, অবশংবদ রাজ্যগুলিকে ও তাদের মুখ্য মন্ত্রীদের তো ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়া যাচ্ছে ?

## ষড়যন্ত্রী মশাইদের লীলাখেলা

আজ থেকে দশ-পনেরো বছর আগে কলকাতার একটি নাট্যগোষ্ঠী প্রচুর চিত্তাকর্ষক সংগীত-সংবলিত একটি নাটক—'মারীচ সংবাদ'—পরিবেশন করেছিলেন। মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সিকে বাংলায় কখনো আমরা বলি সিয়া, কখনো বলি সি আই এ। সেই সংস্থার অদ্ভুতকিম্ভূত ক্রিয়াকলাপ ঐ নাটক-অনুষ্ঠানের কালে কারো-কারো কাছে হয়তো কল্পকথা ব'লে মনে হয়েছিল, হয়তো মনে হয়েছিল নাটকীয়তার স্বার্থে একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। সি আই এ সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক অন্যায় ষড়যন্ত্র ক'রে বেড়াচ্ছে তা ঠিক, কিন্তু ঐ নাটকে-ঘটানো উৎকট ব্যাপারগুলি, কমিউনিস্ট-বিরোধিতা যাদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঢুকে গেছে, তাদের পক্ষেও নিশ্চয়ই আদৌ সম্ভব নয়।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন শহর থেকে বব উডওয়ার্ড নামে এক সাংবাদিক 'দি ভেইল' শিরোনামে সি আই এ-র গত সাত-আট বছরের বিবিধ গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে একটি লোমহর্ষক বই প্রকাশ করেছেন। উডওয়ার্ড সাংবাদিকতায় ভুবনজোড়া খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন আজ থেকে পনেরো বছর আগে মার্কিন দেশে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সময়। তৎকর্তৃক উদ্‌ঘাটিত তথ্যের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট নিকসনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। নিকসন প্রেসিডেণ্ট হিশেবে অমার্জনীয় অসদাচরণে রত হয়েছিলেন; উডওয়ার্ড ভূরি-ভূরি গোপন তথ্য লোকসমক্ষে হাজির ক'রে প্রেসিডেণ্টের অপরাধ প্রমাণ ক'রে ছেড়েছিলেন, নিকসন পদত্যাগ না করলে বিচারে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হ'লেও আশ্চর্যের ব্যাপার হতো না। এই সাংবাদিকের দক্ষতা তথা দায়িত্বজ্ঞানশীলতা অতএব প্রশ্নাতীত। 'দি ভেইল' বইটিতে সি আই এ-র কীর্তিকাহিনী নিরাসক্ত, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ, নৈপুণ্যের সঙ্গে উডওয়ার্ড সম্পূর্ণ নিরাবরণ করেছেন। পৃথিবীর অপকারসাধনের প্রবৃত্তির তাড়নায় সংস্থাটি যে কত নিচে নামতে পারে, কী পরিমাণ হীন জঘন্য ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হ'তে পারে, একটির-পর-একটি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন তিনি। কোনো কট্টর মার্কিনবিরোধীর কলম থেকে এই বই বেরোয়নি। বব উডওয়ার্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি-অভিজাত সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্টের

অন্যতম সহযোগী সম্পাদক, তাঁর পেশ-করা প্রতিটি তথ্যের যথার্থতা বহুবার যাচাই ক'রে নেওয়ার পরই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সুতরাং এটা বলা চলবে না পক্ষপাতদুষ্ট, কেউ মার্কিন দেশকে গালাগাল পাড়ার প্রকট উদ্দেশ্যে 'দি ভেইল'-এর মতো গ্রন্থ রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অলীক কাহিনী নয়, কোনো আষাঢ়ে গল্প নয়, 'মারীচ সংবাদে' পরিবেশিত অদ্ভুতকিম্ভূত বহু ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে, ঘটছে, সি আই এ দ্বারা ঘটানো হচ্ছে। 'দি ভেইল' স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করছে, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাওয়ার অধিকার সত্যিই আমাদের নেই, এমন কোনো কুকর্মই আমরা কল্পনায় আনতে পারবো না যা সি আই এ-র পক্ষে ঘটানো অসম্ভব, সি আই এ সব পারে।

আমরা এতদিন পর্যন্ত স্রেফ অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেছিলাম যে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জাগ্রত জনতার আন্দোলন প্রতিহত করতে যে-সমস্ত প্রতিবিপ্লবী-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমাবেশ ঘটে, তাদের প্রায় প্রত্যেকটির পিছনে সি আই এ-র অদৃশ্য হাত কাজ করছে। উডওয়ার্ডের বই প'ড়ে আমাদের জ্ঞানশলাকা উন্মীলিত হয়, আমরা উপলব্ধি করি 'প্রায়' কথাটি অপব্যয়িত, পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকে উদ্বুদ্ধ করেছে ও করছে সি আই এ সংস্থা। ভিয়েতনাম-কুবা-চিলির কথা ছেড়েই দিই, নিকারা-গুয়ায় উপস্থিত মুহূর্তে যা ঘটছে সেই প্রসঙ্গও যদি পাশে সরিয়ে রাখি, তা হ'লেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, সি আই এ সতত সর্বত্র সঞ্চারমান, লিবিয়ার বিরুদ্ধে, চাদ হোক, মিশর হোক, কিংবা সুদান হোক, যখনই যে-দেশকেই উগ্র মূর্তি ধরতে দেখা গেছে গত সাত-আট-দশ বছরে, প্রতিটি ঘটনা সি আই এ-অনুপ্রাণিত, সি আই এ কর্তৃক এই দেশের-ঐ দেশের-সেই দেশের কোনো রাজা বা মন্ত্রী বা সেনাপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানকে টাকা খাওয়ানো হয়েছে, কিংবা অন্য কোনো উপায়ে বশীভূত করা হয়েছে। ইরানে প্রতিবিপ্লবীদের উৎসাহ দিচ্ছে সি আই এ, দক্ষিণ ইয়েমেনের প্রতিবিপ্লবীদের হয়েও কলকাঠি নাড়ছে সি আই এ, অ্যাঙ্গোলাতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়োগ করেছে সি আই এ, আফগানিস্তানের ব্যাপার তো আরো অনেক প্রকাশ্যে। লেবাননে গোঁড়া খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়কে উস্কে দিয়ে এসেছে বহু বছর ধ'রে সি আই এ, তাদের যিনি নেতা, তাঁকে পয়সা দিয়ে আমৃত্যু পুষেছে পর্যন্ত সি আই এ। এশিয়ার অন্যত্রও একই কাহিনী, লাতিন আমেরিকাতেও। আড়ি পাতা, গোপনে অস্ত্র চালান করা, মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী ব'লে যাদের মনে করা হয় তাদের খুন করা, দিনকে-রাত-

করা মিথ্যা অপপ্রচার, পিছন থেকে ছুরি মারা, ঘুষ দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান পুরুষদের দেশের-জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক হ'তে শেখানো, এ সব-মিলিয়ে এমন-কোনো পাপাচার নেই যার সঙ্গে সি আই এ নিজেকে জড়ায়নি!

উডওয়ার্ডের বইতে আরো যে-ভয়ংকর সত্য উদ্‌ঘাটিত, ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্ট রেগানের মেয়াদ শুরু হবার পর থেকে সি আই এ-র কাজকর্মের উপর রাশ ধ'রে থাকবার মতো মার্কিন প্রশাসনে কেউ ছিলেন না। মার্কিন ব্যবস্থায় মার্কিনি আইন সভা কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া সরকারি খরচপাতি সম্ভব নয়; অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, বিশেষ ক'রে ভিয়েতনাম, চিলি, ইরান ইত্যাদি দেশে সি আই এ-র বিবিধ অপকর্মের কাহিনী ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর, কংগ্রেস থেকে প্রচুর কড়াকড়ি করা হয়েছে, আগে থেকে বিশদ হিশেব দাখিল না ক'রে অপকর্মে লিপ্ত হওয়া সি আই এ-র পক্ষে আইনত এখন আর উপায় নেই। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়াই, কংগ্রেসকে না জানিয়ে, বহু ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নির্দেশ তুড়ি মেরে উপেক্ষা ক'রে সি আই এ এই দশকের প্রায় গোড়া থেকে বিবিধ গুপ্তকমে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। কখনো-কখনো সি আই এ এইসব কুকীর্তি করেছে প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে, আবার কখনো সি আই এ-র প্রভুরা বড়ো-কর্তা-যত-কম-জানেন-তত-তাঁর-পক্ষে-মঙ্গল এই দর্শনে বিশ্বাসবর্তী হয়ে রেগান সাহেবের অগোচরেই পৃথিবীতে অশান্তি ছড়াতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। কংগ্রেসকে জানানো হয়নি, প্রেসিডেন্টকেও না, দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে না। দেশের পূর্বনির্দিষ্ট পররাষ্ট্র নীতিকে কলা দেখিয়ে নিজেদের মনমতো আলাদা পররাষ্ট্র নীতির পত্তন করেছে সি আই এ, দেশের প্রতিরক্ষা নীতিকে অগ্রাহ্য ক'রে নিজস্ব আলাদা প্রতিরক্ষাব্যবস্থার খসড়া তৈরি করেছে। প্রশাসনের একটি গোপন ভগ্নাংশ গোটা প্রশাসনকে ছাড়িয়ে গেছে, গোটা দেশের ভাগ্য কিছু গুপ্তচর বেপরোয়া খেয়াল-খুশিমতো নির্ধারণে নিজেদের নিয়োগ করেছে। এমন নয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদিত পররাষ্ট্রনীতি বা প্রতিরক্ষানীতি এমনিতেই প্রতিক্রিয়া ঠাসা ছিল না, কিন্তু গুপ্তচরদের ষড়যন্ত্রে তা আরো মারাত্মক বিধ্বংসী রূপ পেয়েছে।

অন্ধকারের বৃত্তে যাদের ঘোরাফেরা, অবশেষে তারা হাতে-নাতে ধরা পড়েছে নিকারাগুয়ার প্রতিবিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে। কংগ্রেস থেকে-বার বার অনুশাসন ঘোষণা করা হয়েছে, নিকারাগুয়ার প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার চক্রান্তে সি আই কিছুতেই প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হ'তে পারবে না। কোনটি প্রত্যক্ষ চক্রান্ত কোনটি পরোক্ষ তা তো সংজ্ঞা আরোপের

ব্যাপার। সি আই এর তরফ থেকে অতএব কংগ্রেসের কাছে অভিযোগ জানানো হলো নিকারাগুয়া থেকে অস্ত্র চালান করা হচ্ছে হণ্ডুরাস রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বিপদে ফেলবার অসদুদ্দেশ্যে, এই অস্ত্র চালান বন্ধ করা প্রয়োজন. সেজন্য পাঁচশো প্রতিবিপ্লবী নিকারাগুয়া নাগরিককে তালিম দিতে হবে, টাকা চাই; নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হবে না, কিন্তু সেই সরকার যাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হণ্ডুরাসের অসুবিধা না-ঘটাতে পারে তার জন্য তো ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এই ছুতো থেকে যে-কাহিনীর শুরু, তা, যতই বছরের-পর-আরেকটি-বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আস্তে-আস্তে, গভীর-গোপন ষড়যন্ত্রের রূপ নিয়েছে, পাঁচশো পরিদর্শক-প্রহরীর বাহিনী ক্রমে প্রায় পনেরো-কুড়ি হাজার প্রতিবিপ্লবী সৈন্যদলের রূপ পরিগ্রহ করেছে, নিকারাগুয়ার প্রতিটি বন্দরের প্রবেশমুখে সি আই এ নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিস্ফোরক মাইন পেতেছে, নিকারাগুয়ার গ্রামে-শহরে বোমা ফেলবার লক্ষ্য নিয়ে ঠ্যাঙারে বিমানবাহিনী সৃষ্টি করেছে, এই হিশেব-ঐ হিশেব থেকে লুকিয়ে-ঠকিয়ে টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিকারাগুয়ার বামপন্থী সরকারকে খতম করবার মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে। সব কিছুই করা হয়েছে কংগ্রেসের অগোচরে, পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে না জানিয়ে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকেও সমপরিমাণে অবজ্ঞা ক'রে, একটু-আধটু প্রেসিডেণ্টকে আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়ে, তা-ও ঠিক কতটা তা এখনো রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ার ব্যাপার নয়, শেষ পর্যন্ত সি আই এ ধরা প'ড়ে গেল বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে। কংগ্রেসের কাছে টাকা চাইতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না. অথচ নিকারাগুয়ার পনেরো-কুড়ি হাজার প্রতিবিপ্লবীদের অস্ত্র কেনবার জন্য ব্যবস্থা চাই। কংগ্রেস ইরানের সঙ্গে লেনদেন বারণ ক'রে দিয়েছে, কিন্তু তাতে কী, কংগ্রেসকে কে পরোয়া করে, অন্তত সি আই এ করে না। এক কাজ করা যাক, গোপনে ইরান দেশকে কিছু গোলাবারুদকামানবন্দুক বিক্রি করা যাক, তাতে রথ দেখা-কলা বেচা দুটোই বোধ হয় হবে, ইরানের নেতাদের সঙ্গে লেবাননের আরবদের ভাব আছে, ইরানকে অস্ত্র বিক্রি করলে ওঁরা হয়তো আরবদের কাছে মার্কিন সরকারের হয়ে সুপারিশ করবেন, আরবরা লেবাননে যে-সব মার্কিনিদের বন্দী ক'রে রেখেছে, তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, তা ছাড়া ইরানকে অস্ত্র বেচে যে-মুনাফা মিলবে সেই টাকায় এবার নিকারাগুয়ার প্রতি-বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র কেনার বন্দোবস্ত পর্যন্ত করা সম্ভব হবে।

কিন্তু এত বিভিন্ন দলকে জড়িয়ে পরিকল্পনা ফাঁদা হয়েছিল যে শেষ রক্ষা হলো

না, কোথাও গুপ্ত কথা ফাঁস হয়ে গেল, সি আই এ ধরা প'ড়ে গেল। এই ধরা-পড়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ কাহিনী 'দি ভেইল', যার খলনায়ক সি আই এর সর্বোচ্চ কর্তা বিল কেসী, মাঝারি-ক্ষুদে খলনায়ক প্রেসিডেণ্টের খাস দপ্তরের আরো একজন-দু'জন। রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চকাহিনীর মতো এই উপাখ্যান। তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও কী ক'রে সমস্ত বিধিবিধান-নীতিনিয়মকলাকে উপেক্ষা ক'রে সরকারি গুপ্তচরসংস্থা সারা দেশের প্রধান ভাগ্যনিয়ন্ত্রকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, মন্ত্রীরা অসহায়, ব্যবস্থাপক সভা পুরোপুরি অন্ধকারে, রাষ্ট্রনায়ক নিজে পর্যন্ত বেশির ভাগ পরিকল্পনা-ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বব উডওয়ার্ড সেই দানবীয় কাহিনী স্তবকের-পর-স্তবক সাজিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন।

দু'টি আলাদা মন্তব্য সংযোজন করা অযৌক্তিক হবে না। আমাদের দেশে এখানে-ওখানে সন্দেহজনক নানা ব্যাপারস্যাপার ঘটছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, ত্রিপুরায়, দার্জিলিংয়ে ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনের নাম ক'রে; কখনো হয়তো আমরা বঙ্গভাষী অথবা আমরা ব্রজবুলি-বা ভোজপুরী-ভাষী, আমাদের দাবি মানতে হবে এ ধরনের আপাতঅদ্ভুত কোনো ধুয়োর আড়ালে। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মনে খটকা লাগে, হয়তো সাধারণ মানুষের অনুভূত কিছু অভাববোধ আছে, হয়তো কিছু আবেগাশ্রয়ী অভিযোগ, ধান্দাবাজ কিছু লোক সম্ভবত জুটে গেছে, কিন্তু তা হ'লেও অভাব-অভিযোগের যথার্থতা-অযথার্থতা একটু খতিয়ে দেখা ভালো। 'দি ভেইল' প'ড়ে নতুন ক'রে পুরনো সন্দেহ মাথাচাড়া দেয়। সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ অবশ্যই খানিকটা আছে, কিন্তু তিলকে তাল করা হচ্ছে না তো, যে-ধান্দাবাজগুলি মোড়লি দিচ্ছে, তাদের পিছন থেকে সি আই এ উৎসাহদান করছে কি করছে না আমরা সত্যিই আর বুকে হাত দিয়ে বলতে পারছি না : যা মনে হয় হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই তা হয়, অন্তত সি আই এ সম্পর্কে যা মনে হয়।

দ্বিতীয় যে-সংশয়ে দীর্ণ হ'তে হয়, তা আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা-তথ্য-গুপ্তচর বাহিনী প্রসঙ্গে : প্রতিরক্ষা দৃঢ়তর করতে, এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আরো পাকাপোক্ত করতে, অঢেল টাকা ঢালা হচ্ছে, গরিব দেশের গরিব মানুষের টাকা, যা সরকারের হাতে চ'লে যায়, সেই টাকা। এবং এই কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা খরচ হচ্ছে নিভৃত গোপনে, সংসদে এই খরচপাতি নিয়ে যেই বিশদ প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে যে-সদস্য প্রশ্ন উত্থাপন করছেন, তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে বক্রোক্তি করা হচ্ছে। কিন্তু মার্কিন দেশের চরম কেলেঙ্কারির বিবরণ জানার পর আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে নীরব-নিরাসক্ত থাকা মহাপাতক হবে। আমাদের

প্রতিরক্ষাবাহিনীর দক্ষতা ব্যয়ভারবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ছে না কমছে, দেশের মানুষের তা জানবার নিশ্চয়ই অধিকার আছে, বোফর্স এবং সাবমেরিন কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাবার পর আরো বেশি ক'রে আছে। সেই সঙ্গে, গুপ্তচর ও নিরাপত্তা-বাহিনীকে উন্নততর করার নামে কোথায় কী হচ্ছে তারও আভাস সদাসর্বদা লোকসমক্ষে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন, অন্যথা সি আই এ-র লীলাখেলার মতো আমাদের এখানেও হয়তো প্রবলপরাক্রান্ত প্রধান মন্ত্রীর উদার আশ্রয়ের আড়ালে কোনো খলনায়ক, প্রধান মন্ত্রীর অনুমতি কখনো-কখনো নিয়ে আবার কখনো-কখনো না নিয়েই, একটির-পর আর-একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'তে পারে। অতি গোপনীয়তার পর্দার অন্ধকারে যারা ঘোরাফেরা করে, তারা সহজেই সহসা ভেবে বসতে পারে মুখ্যুসুখ্যু জনগণের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, সংসদের সদস্যরা অযোগ্য-অপদার্থ, একমাত্র তারাই, গুপ্তচররাই, দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থ অনুধাবনে সক্ষম। একটা-দুটো জায়গায় যা ঘটছে, পাঞ্জাবে বা দার্জিলিংয়ে বা শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে, তাতে সন্দেহ হওয়া অন্যায় নয় কিছু-কিছু কুচক্রী দেশকে গভীর সর্বনাশের গহ্বরে ফেলার তালিম দিচ্ছে। আমাদের আশেপাশে, কোণে-ঘুপচিতে লুকিয়ে, অপকর্ম সাধনে তদ্‌গতমন, সি আই এ-র চরেরা যেমন সম্ভবত আছে, নতুন দিল্লির সরকারের বেতনভোগী ষড়যন্ত্রীমশাইরাও সেই সঙ্গে হয়তো আছেন, প্রায় যুগলবন্দী যেন তাঁদের অবস্থান। এই অন্ধকারের জীবদের মুখোশ উদ্‌ঘাটনের চেয়ে মহত্তর জাতীয় কর্তব্য আপাতত সত্যিই নেই।

# ধর্মে আছে, জিরাফেও আছে

দেখা করতে এসেছে বছর আটেকের একটি বাচ্চা ছেলে। ফুটফুটে দেখতে, এরই মধ্যে চোখে চশমা, বেশি-বেশি পড়তে গিয়ে চোখ খারাপ ক'রে বসেছে। গল্পচ্ছলে নিজের নাম বানান ক'রে লিখতে বলা হ'লে ইংরেজিতে অতি স্বচ্ছন্দে সঙ্গে-সঙ্গে লিখে দেখালো। বাংলাতে বানান লিখতে গিয়েই কিন্তু বিপদ, যা বেরোলো তো 'স্দিহার্থ'। অথচ পড়াশুনায় দিব্যি ভালো সিদ্ধার্থ, অবশ্যই ইংরেজিতে পড়াশুনা হয় তার স্কুলে, পরীক্ষায় এ-বছর ক্লাসে প্রথম হয়েছে। প্রায়ই একই রকম আরেকটি অভিজ্ঞতা। ট্রেনের কামরায় পাশে বসেছে সিদ্ধার্থেরই কাছাকাছি বয়সী একটি ছেলে, অনুরূপ সপ্রতিভ। বাবা-মা নিকষ বঙ্গভাষী, বাবা কাজ করেন পশ্চিম বাংলাতেই এক শিল্পশহরে, কিন্তু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে স্কুলে ব্যবস্থা করা হয়েছে ছেলের জন্য, ক্লাসে তার প্রথম ভাষা ইংরেজি, দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি। বাংলাও একটু-আধটু পড়বে, তবে তৃতীয় ভাষা হিশেবে।

একটি-দু'টি বিক্ষিপ্ত উদাহরণের ব্যাপার নয়, গোটা দেশ জুড়ে, সামন্ততান্ত্রিক ঝোঁক বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে, আরো-একটি প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। দেশ স্বাধীন হয়েছে, অথচ বিদেশ সম্বন্ধে মোহ একটি বিশেষ মহলে প্রতিদিন প্রবলতর হচ্ছে। দেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্তরা করতে আদৌ রাজি নন, তাঁদের মন পাশ্চাত্যমুখী, তাঁদের চোখে পশ্চিমী সংস্কৃতি-সভ্যতার স্বপ্নাঞ্জন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাচ্চা বয়স থেকেই মার্কিন দেশের বৈভব-উপচারের কথা শেখানো হয়, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি একবার পেরোতে পারলেই তারা উড়ে চ'লে যাবে ইওরোপে বা আমেরিকায়, ওখানেই আরো-কিছু পড়াশুনা হয়তো শেষ করবে, তারপর জীবিকাগ্রহণ। দেশে মাঝে-মধ্যে অবশ্য ফিরবে, তবে তা নিছক বেড়াতে, নয়তো দু'দশ দিনের জন্য বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এই যে তারা কোনোক্রমে দেশে জীবনের প্রথম পনেরো-কুড়ি বছর কাটাচ্ছে, তা নেহাতই দায়ে পড়ে, স্কুলে একটু-আধটু মাতৃভাষা জানতে হয়, তা-ও দায়ে প'ড়ে। তাদের ধ্যানজ্ঞান আমেরিকা, যেখানে

নাকি সুখ আর ঐশ্বর্যের বন্যা ব'য়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের মতো হতভাগ্য-দরিদ্র দেশে তারা কেন প'ড়ে থাকবে?

পোশাকি ভাষায় এই ধ্যানধারণাকেই হয়তো বলা হয় ঔপনিবেশিক মানসিকতা। দেশ চল্লিশ বছর হলো স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু দেশের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি বড়ো অংশ স্বেচ্ছায় পরাধীনতা বরন করতে চান, যে-কোনো কারণেই হোক, দেশ সম্পর্কে তাঁদের মমতা বা অনুরাগ নেই, অহংকারের কথা ছেড়েই দিলাম। হয়তো সামন্ততান্ত্রিক চেতনারই এক বিকল্প প্রতিফলন এই মানসিকতা। গরিব দেশ এটা, নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, অশিক্ষিত-স্বাস্থ্যবিহীন লোকের ভিড়ে ঠাসা, এমন দেশে তিষ্ঠোনো অসম্ভব, ছেলেমেয়েদের জন্য তাই তাঁরা ইংরেজি ভাষার মধ্যবর্তিতায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন, এবং সুযোগ খুঁজে বেড়ান কী ক'রে যথাশীঘ্র তাদের মার্কিন দেশে পাঠিয়ে দিতে পারেন। সংখ্যায় এঁরা অতি নগণ্য, কিন্তু টাকার জোর আছে এঁদের, আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় এঁরা নিজেদের জাহির করতে পারেন অতি সহজে। সমাজ থেকে এঁরা অম্লানচিত্তে কিছু বাড়তি সুবিধা আদায় করেন, এঁদের ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষাদানের জন্য সরকার থেকে ব্যয়বহুল ব্যবস্থা করা হয়, এই গরিব দেশের গরিব মানুষের টাকায় বড়োলোকের ঘরের ছেলেমেয়েরা প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয়ে ওঠে, তারপর উধাও হয়ে যায় তারা, আমেরিকায় বা অন্য-কোনো বিদেশে।

যারা যায়, তারা যায়। তাদের জন্য দেশের টাকা কিছু অপচয় হয়, কিন্তু আপাতত বর্তমান সমাজব্যবস্থায় উপায় নেই, এটা হ'তে বাধ্য। কাউকে তো ধ'রে-বেঁধে দেশকে ভালোবাসতে শেখানো যায় না, যারা দেশকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ ক'রে যেতে চায়, বোধ হয় তাদের যেতে দেওয়াই ভালো। দেশের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র চিরবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আখেরে খুব-একটা মারাত্মক ক্ষতি হবে না ভারতবর্ষের, আশি কোটি মানুষের দেশ, প্রতিভার অভাব হবে না এ-দেশে, সমাজের সমস্ত স্তর থেকে, যথাযথ সুযোগ পেলেই, দেশপ্রেমে ভাস্বর, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল ছেলেমেয়েরা কাতারে-কাতারে বেরিয়ে আসবে. দেশের সেবায় নিজেদের ঢেলে দেবে তারা।

যারা গেল তাদের তাই যেতে দেওয়াই ভালো। কিন্তু মুশকিল বাঁধে সেই সব দেশবাসীকে নিয়ে যাঁদের মনটা প'ড়ে আছে আমেরিকায়. কিন্তু যাঁরা মোড়লি করতে চান দেশের মাটিতে। তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রশাসনে কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে বসেন, কেউ-কেউ মন্ত্রী হন, কেউ-কেউ আমলা। দেশটা গরিব, সমস্যাগুলি শাদা-

মাটা সমস্যা, অসাম্যের সমস্যা, সম্পত্তি-সুযোগ-সুবিধা ভয়ংকররকম অসমবণ্টনের সমস্যা, কিন্তু এই সব ধ্রুব সত্যগুলি স্বীকার ক'রে নিলে তাঁদের নিজেদের অস্তিত্বে টান পড়বে, তাই ঐ পথে হাঁটেন না তাঁরা। তাঁদের মন তাই চ'লে যায় মার্কিন দেশের দিকে, ভারতবর্ষকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার একমাত্র উপায়, তাঁরা বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্তে পৌঁছন, মার্কিনি প্রশাসন ব্যবস্থা, মার্কিনি অর্থনীতি, প্রধান মন্ত্রীর মার্কিন রাষ্ট্রপতির ধাঁচে আচরণ-বিচরণ-ব্যবহার। তাঁরা ধুয়ো তুলেছেন আমাদের আমলাদের কিস্তিতে-কিস্তিতে মার্কিন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, ঐ দেশে প্রশাসনে কী জাদু আছে তা জেনে আসুন আমাদের সর্বস্তরের প্রশাসকরা, তা হ'লেই নাকি দেশের চেহারা পাল্‌টে যাবে, নিরক্ষররা সাক্ষর হবে, বেকাররা কাজ খুঁজে পাবে, সতীদাহ বন্ধ হবে, ফাইল দ্রুতগতিতে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাওয়া-আসা করবে, উন্নয়ন প্রকল্পাদির বাস্তব রূপায়ণ ঝটিতি সুসম্পন্ন হবে। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠায় আপাতত কিছুদিনের জন্য আমাদের প্রশাসকদের মার্কিনি ধাঁচে দীক্ষিত করার কর্মসূচী স্থগিত রাখা হয়েছে, কিন্তু সুযোগসন্ধানীরা ঘোরাফেরা করছেন, খানিক সময় বাদে এঁরা হয়তো চেষ্টা করবেন প্রশাসনের মগজ-ধোলাইয়ের সুমহান পরিকল্পনাটি কী ক'রে ফের চালু করা যায়।

এই মার্কিনপ্রেমিকদের অনেকেই প্রশাসনের খোদ অন্দরমহলে ঢুকে গেছেন, ধাপে-ধাপে উপরে উঠেছেন, এখন বিভিন্ন মন্ত্রকের বহু দায়িত্বশীল পদে সমারূঢ়। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো বহু বছর ধ'রে বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিংবা এখনো আছেন, ছুটি নিয়ে এসেছেন সে-সব প্রতিষ্ঠান থেকে। এঁরা একটি বিশেষ আর্থিক দর্শনে বিশ্বাস রাখেন, জাতীয় স্বনির্ভরতার প্রসঙ্গ এঁদের কাছে বাতুলের প্রস্তাব, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-ধনবিজ্ঞান প'ড়ে এসেছেন তা-ই এঁরা প্রয়োগ করতে চান ভারতবর্ষের মাটিতে। ভূমিসংস্কার নয়, কাঠামোর পরিবর্তন নয়, গরিব মানুষদের লেখাপড়া শেখানো বা তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান, এ-সব কোনো কিছুই নয়, দেশবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই, দেশের আর্থিক উন্নতি, এঁরা ধ'রেই নিয়েছেন, একমাত্র বিশ্ব ব্যাংক বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার কর্তৃক নির্দেশিত উপায়েই হ'তে পারে। অর্থাৎ জমিদার-পুঁজিপতি-ব্যবসাদারদের উৎসাহবর্ধন করতে হবে, তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেলেই দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, সেই উৎসাহের পরিসর বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে এগোতে গেলে যা-যা প্রয়োজন তাদের মধ্যে প্রধান বড়ো-লোকদের উপর ট্যাক্সোর বোঝা কমানো, তাদের জন্য অধিক পরিমাণে অনুদানের

ব্যবস্থা করা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সংকুচিত ক'রে আনা, একচেটিয়া পুঁজির সম্প্রসারণের উপর থেকে সবরকম বাধাবিঘ্ন তুলে দেওয়া, বিদেশ থেকে অঢেল পুঁজি ও প্রযুক্তির আমদানি, বিদেশ থেকে জিনিশপত্রেরও অঢেল আমদানি, কারণ তা হ'লে নাকি প্রতিযোগিতার মুখে প'ড়ে স্বদেশী শিল্প দক্ষতা শিখবে, যার ফলে রপ্তানির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে, এবং স্বদেশী পণ্যের বর্ধমান রপ্তানির সূত্র ধ'রেই আর্থিক উন্নতির হার তীব্রতর হবে, দেশ এগিয়ে যাবে, মার্কিন দেশের প্রধান-প্রধান মন্ত্রশিষ্য দক্ষিণ কোরিয়ায় কিংবা সিঙ্গাপুরে যেমন এগিয়ে গেছে। পাশাপাশি, এই পণ্ডিত প্রশাসককুল এটাও বলবেন, টাকার বৈদেশিক মূল্য ক্রমশ কমিয়ে আনতে হবে, এই কাজটি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সমাধা করলেই নাকি, তাঁরা দিব্যি দিয়ে বলবেন, ভারতবর্ষের রপ্তানি হু-হু ক'রে বেড়ে যাবে, সেই সঙ্গে বাড়বে জাতির আর্থিক অগ্রগতির হার।

ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছেন এই গোষ্ঠী, তাঁরা প্রশাসনের বাইরে আছেন, ভিতরেও আছেন। টাকার মূল্য সরকারি ঘোষণা মারফৎ কমিয়ে দিলে বিদেশীরা আমাদের পণ্য আরো সস্তায় কেনবার সুযোগ পেয়ে যান, আর আমাদের আরো চড়া দাম দিয়ে বিদেশী পণ্য কিনতে হয়। যে-যুক্তি দাঁড় করানো হয়, এই অবস্থায় বিদেশীরা আরো বেশি-বেশি আমাদের জিনিশ কিনবেন, আর আমরা বিদেশী পণ্য কেনা কমিয়ে আনবো, দু'দিক দিয়েই তাই বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সাশ্রয় ঘটবে, আমরা রপ্তানি ক'রে বাড়তি ডলার পাউণ্ড-মার্ক-ইয়েন ঘরে তুলবো, এবং যেহেতু আমদানি কমবে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাব্যয়ও সংকুচিত হবে। অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলে। আজ থেকে বছর বাইশ আগে তাঁর মার্কিন-অনুরাগী উপদেষ্টাদের পরামর্শ শুনে ইন্দিরা গান্ধির টাকার অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু যা-যা পূর্বঘোষণা করা হয়েছিল কিছুই ঘটলো না সে রকম : রপ্তানি আদৌ বাড়লো না, অন্য পক্ষে দেশে খরা দেখা দেওয়ায় বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ ক'রে বাড়তি আমদানির ব্যবস্থা করতে হলো, যন্ত্রপাতি আমদানির খরচও ভীষণভাবে বেড়ে গেল। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর প্রশাসনের অভ্যন্তরে যে-সব মার্কিনপ্রেমিক অবস্থান করছেন, তাঁরা খোলা গলায় নতুন ক'রে টাকার মূল্য কমাবার জন্য আর দাবি পেশ করতে সাহস পাচ্ছেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁরা হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন। কোনোরকম সরকারি ঘোষণা ছাড়াই, চুপি-চুপি, প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে একটু-একটু ক'রে, বাস্তবতার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার অছিলায়, তাঁরা ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য গত ছ'সাত বছরে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কিংবা তারও বেশি কমিয়ে ফেলতে সফল হয়েছেন, সাড়ে সাত

টাকায় যে-ডলার মিলতো, সেই ডলারের জন্য এখন তেরো টাকা খরচ করতে হয়। এই অবমূল্যায়ন নাকি ঘটানো হয়েছে জাতির স্বার্থে, অথচ জাতির কী স্বার্থ সংসাধিত হয়েছে সাধারণ বুদ্ধিতে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। আজ থেকে সাত-আট বছর আগে জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ রপ্তানি করতাম আমরা, টাকার মূল্য অর্ধেক ক'রে আনার ফলেও সেই একই অবস্থা, বর্তমান বছরেও আমাদের সামগ্রিক রপ্তানি জাতীয় আয়ের পাঁচ শতাংশ অতিক্রম ক'রে যাবে না। অন্য পক্ষে, আমাদের আমদানি হু-হু ক'রে বেড়ে চলেছে, সাত বছর আগে যা ছিল জাতীয় আয়ের সাত শতাংশের পরিমাণ, তা এখন বেড়ে প্রায় দশ শতাংশ হবার উপক্রম। আমাদের কৃষক-শ্রমজীবী মানুষদের মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে উৎপাদিত জিনিশপত্র বিদেশীরা আরো অনেক সস্তায় কেনার সুযোগ পাচ্ছে, আর বিদেশীদের উৎপাদিত জিনিশ আমাদের আরো অনেক চড়া দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে।

যা ঘটছে, ঘটানো হচ্ছে, তা মার্কিন নীতির সারাৎসার অনুসরণ ক'রেই ঘটানো হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিভঙ্গ বদলায়, টাকার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করানোতে বাধ্য করিয়ে শোষণ তীব্রতর করা নবসাম্রাজ্যবাদের একটি পরিচিত প্রকরণ। এখন সাহস বেড়েছে। বিশ্ব ব্যাংক থেকে এখন আবার দাবি করা হয়েছে, টাকার দাম আরো কমাতে হবে, এবং প্রকাশ্যে, সরকারি ঘোষণা মারফৎ, কমাতে হবে, নাচতে নেমে ফের ঘোমটা দেওয়া কেন। শাসকদল ও তার নেতার অপকীর্তি তথা দুর্নীতি হেতু গোটা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নতুন ক'রে গোচরমান, বিশ্ব ব্যাংক তার সুযোগ গ্রহণ করতে চাইছে। এবং তাকে সাহায্য করবার জন্য, ধ'রেই নেওয়া যায়, উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় রত কিছু মন্ত্রী-শান্ত্রী-আমলা, যাদের কাছে দেশপ্রেমের সংজ্ঞা মার্কিনপ্রেম।

আমরা মুৎসুদ্দি পুঁজির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করি, দেশকে মুৎসুদ্দিরা কী ক'রে বিদেশী পুঁজির কাছে হেলায় তুলে দিতে পারে সেই চিন্তায় ভাবিত হই। প্রশাসনের অভ্যন্তরে যে-মুৎসুদ্দিরা প্রবিষ্ট, তাদের সম্পর্কেও সমপরিমাণ সতর্ক হবার সময় হয়তো এসেছে। মাতৃভাষায় নিজের নাম লিখতে পারে না, অথচ ইংরেজিতে অবলীলাক্রমে পারে, এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা দেশে যে-হারে বেড়ে যাচ্ছে, তার চেয়েও দ্রুততর হারে মনে হয় বাড়ছে প্রশাসনের অন্দরমহলে সগৌরবে বিরাজমান এই স্বদেশকে-তাচ্ছিল্য-করতে-অভ্যস্ত বিদেশপ্রেমিকদের সংখ্যা। বাচ্চা ছেলেটিকে বকুনি দিয়ে কী হবে, সে উপর মহলের দৃষ্টান্ত থেকে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, দেশরক্ষার কাজ কোথায় শুরু করবো আমরা? অন্তর্ঘাতে নিবেদিতপ্রাণ মুৎসুদ্দিরা তো, আধুনিক কবির ভাষায়, ধর্মে আছে, জিরাফেও আছে।

# মেরেছো কলসীর কানা, তা ব'লে কি

প্রাচীন কালে আলংকারিকরা ছিলেন, তাঁরা শব্দের-বাক্যের রহস্যের সন্ধানে অনেক গভীরে চ'লে যেতেন, পরস্পরের সঙ্গে তর্কে জড়িত হতেন। তাঁদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে রাজসভায় সোরগোল প'ড়ে যেত, রাজার কাছ থেকে শিরোপা পেতেন তাঁরা, গ্রামে-গঞ্জের হাবা-গোবা মানুষগুলি দূর থেকে সসম্ভ্রমে তাঁদের প্রণাম জানাতো।

আমরা বিংশ শতাব্দী প্রায় অতিক্রম ক'রে যাচ্ছি, আলংকারিক পণ্ডিতদের কাল আর নেই, কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের ঘাটতি হচ্ছে না তা হ'লেও। আলংকারিকরা নেই, অর্থনীতিবিদ্‌রা আছেন। তাঁরাই এখন রাজসভা জুড়ে থাকেন। তাঁরা মস্ত-মস্ত অঙ্ক কষেন, আপাতসহজ কথাকে কঠিন ভাষায় প্রকাশ করেন, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে সরকারকে উপদেশ দেন, তাঁদের বাদ দিয়ে সরকার অচল। এবং তাঁরা নিজেদের মধ্যে প্রভূত তর্ক করেন। তাঁরা তর্ক করেন ব'লেই হয়তো সরকারের মস্ত বাঁচোয়া। অর্থনীতিবিদ্‌রা যখন পরস্পরকে তর্কে ঘায়েল করতে থাকেন, সেই অবসরে সরকার নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা ক'রে ফেলেন। যে-বিষয় নিয়ে অর্থনীতিবিদ্‌দের বিতর্ক, সেই সম্পর্কেই সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। পণ্ডিতরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মেটাতে পারছেন না ব'লে তো আর পৃথিবীর নিয়ম বন্ধ থাকবে না, কোনো দেশের সরকারও কাজকর্ম বন্ধ রেখে পণ্ডিতি সিদ্ধান্তের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা ক'রে থাকবেন না, সেটা সম্ভব নয়। সরকারের পক্ষে সুবিধাই হয় এক হিশেবে অর্থনীতিবিদদের পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হওয়া থেকে। সরকার এখন লোকসমক্ষে বলতে পারবেন যে তাঁরা পণ্ডিতজনদের উপদেশ-পরামর্শ অনুযায়ীই চলতে চান, কিন্তু, কী আর করা, পণ্ডিতরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় আসতে পারছেন না, অতএব সরকারকে স্বীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপর নির্ভর ক'রে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না। সরকার নিজের পছন্দমতোই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, কিন্তু ওদিকে বলাও চললো অর্থনীতিবিদ্‌দের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তবে তাঁরা মনস্থির ক'রে উঠতে পারছেন না।

ত'বে অন্যরকমও হচ্ছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় শাসককুল তাঁদের স্বার্থ-সিদ্ধির অন্বেষণে ধনবিজ্ঞানকে অবশ্যই কাজে লাগাবেন, সেই সঙ্গে অর্থনীতি-বিদ্‌দেরও। পুরোনো দিনে পণ্ডিতরা অলংকার নিয়ে কোন্ ধরনের বাগাড়ম্বর করলেন তাতে রাজ্যচালনার ক্ষেত্রে কিছু যেত-আসত না, প্রজাপীড়ন সুষ্ঠু উপায়েই চলতো, কিন্তু বর্তমান কালে অর্থনীতিবিদ্‌দের বলা-কওয়ার সঙ্গে দেশের শুভাশুভ, এবং বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ, ওতপ্রোত জড়িত। শাসককুলকে তাই অর্থনীতিবিদ্ যেমন পুষতে হয়, সঙ্গে-সঙ্গে তাই এটাও দেখতে হয় এই পণ্ডিতদের দল আবার উটকো-কিছু পরামর্শ যেন দিয়ে না বসেন। অর্থাৎ যা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা পরমবশংবদ, অতিঅনুগত একপাল অর্থনীতিবিদের, যাঁদের দিয়ে যা-কিছু-খুশি বলানো যাবে-লেখানো যাবে। এই অবস্থায় ভাড়াটে গণৎকারের সঙ্গে ভাড়াটে অর্থশাস্ত্রজ্ঞের কোনো তফাৎ থাকে না: দু'জনকে দিয়েই পছন্দমতো ভবিষ্যদ্বাণী করানো যায়।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। তা ছাড়া, যেহেতু জিনিশপত্রের দাম বাড়ে, টিঁকে থাকার সমস্যা, একটু ভালোভাবে খেয়ে-প'রে বাঁচার হাতছানি, সরকারের সুনজরে থাকলে এটা-ওটা নানা সুবিধালাভের সম্ভাবনা, বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকা তেমন বেশিদিন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেই তাই আর হয়ে ওঠে না। তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন, স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা, শাসককুল নিজেদের শ্রেণীস্বার্থপ্রসারে ব্যস্ত, দেশের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ যেহেতু শাসককুলের স্বার্থের পরিপন্থী, প্রশাসনের তদ্‌গত সাধনা হয়ে দাঁড়ায় কী ক'রে জনসাধারণের সর্বনাশ কী ক'রে ক্ষিপ্রতম পন্থায় সুসম্পন্ন করা চলে। এই মহান্ কর্তব্যের সঙ্গে ভাড়া-করা অর্থনীতিবিদ্‌দেরও জুড়ে দেওয়া হয়।

এই এতগুলি কথা অবতারণা করার উপলক্ষ একটি প্রকাশিত সংবাদ। যোজনা কমিশনের সদস্যরা সবাই জ্ঞানীগুণী মানুষ, আপাতত তাঁরা অতি শঙ্কিত। কিছুদিন আগে কয়েকশো অতিথিকে চা-পানে আপ্যায়িত করছিলেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী। হেমন্তসন্ধ্যা, মৃদু-সুন্দর আবহাওয়া, হঠাৎ নাকি প্রধান মন্ত্রী, সর্বসমক্ষে, যোজনা কমিশনের সদস্যদের সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে বসলেন, ওঁরা সব ভাঁড়, ওঁদের দিয়ে কিছু হবে না। জ্ঞানীগুণী মানুষ, আমন্ত্রণ ক'রে এনে যোজনা কমিশনে বছর তিনেক আগে এঁদের বসিয়েছিলেন প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং, দেশ ও জাতি যাতে সুচারু ছন্দে দ্রুত সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এঁরা বুদ্ধিপরামর্শ দেবেন, পরিকল্পনা রচনা করবেন, নিজেদের স্বাধীন চিন্তার

নির্ভয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারদের আর্থিক নির্দেশ জ্ঞাপন করবেন, জনমানসে অন্তত সেরকম ধ্যানধারণা। কিন্তু এই পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলাপ-আচরণ স্পষ্টতই প্রধান মন্ত্রীর পছন্দ হয়নি, তাঁর বিবেচনায় এঁরা ভাঁড়ের দল, এবং তাঁর এই বিচার তিনি প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্ত করেছেন আজ থেকে প্রায় দু'মাস আগে, এবং হয়তো করেছেন এই আশা নিয়ে যে এধরনের অপমানজনক উক্তি শোনার পর যোজনা কমিশনের সদস্যদের নিশ্চয়ই গায়ে জ্বালা ধরবে, সঙ্গে-সঙ্গে এঁরা ইস্তফা দেবেন, তার পর তা হ'লে নতুন একঝাঁক সদস্য কমিশনে নিয়োগ করতে পারবেন প্রধান মন্ত্রী, যাঁরা আরো অনেক-বেশি বশংবদ হবেন। ভাত ছড়ালে তো বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কাকের অভাব হয় না।

কিন্তু না, যোজনা কমিশনের কোনো সদস্যই পদত্যাগ করেননি, তাঁরা বৈষ্ণব গীতিকবিতার ভক্ত: মেরেছো কলসীর কানা, তা ব'লে কি প্রেম দেবো না। সর্বশেষ যে-খবর বেরিয়েছে, আগামী সপ্তাহে তাঁরা দল বেঁধে ভক্তি-আপ্লুত চিত্তে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন, দেখা ক'রে যথাযথ বিনয় ও নম্রতা-সহকারে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবেন: তিনি যদি দয়াপরবশ হয়ে একটু তাঁদের জানান, কর্তব্য-কর্মসম্পাদনে কোথায়-কোথায় তাঁরা কী-কী ভুল করেছেন, যেই ভুল থেকে তাঁর চিত্তশান্তি বিঘ্নিত হয়েছে; এবারকার মতো যদি তিনি তাঁদের গোস্তাকি মাফ ক'রে দেন, ভবিষ্যতে নিজেদের শুধরে নেবেন তাঁরা, শুধু তাঁদের যথাযথ অনুজ্ঞা দান করুন তিনি, এখন থেকে তাঁরা যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি এই গীতাবচন অক্ষরে-অক্ষরে পালন ক'রে চলবেন।

আরো যা খবর সংবাদপত্রে ফলাও ক'রে ছাপা হয়েছে, যোজনা কমিশনের সদস্যরা দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে দু'টি আলাদা প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। একটি প্রতিবেদনে বিশদ তথ্যের সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ক'রে দেশের ভয়ংকর এক আর্থিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অন্য প্রতিবেদনে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, প্রচুর কল্পনা যোগ ক'রে, এক অতি-উজ্জ্বল ঝকঝকে আর্থিক ভবিষ্যতের ছবি বর্ণিত হয়েছে। যোজনা কমিশনের সদস্যরা কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। যদি প্রধান মন্ত্রী ভালো মেজাজে থাকেন, সত্যি কথা শুনতে চান, তাঁর বিবিধ খাম-খেয়াল দেশকে কোন্ অন্ধকার পাতালের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে-বিষয়ে অবহিত হ'তে চান, তা'হলে প্রথম প্রতিবেদনটি পেশ করা হবে। আর যদি তাঁরা দেখেন প্রধান মন্ত্রীর মেজাজ খিঁচড়ে আছে, বেজার মুখ ক'রে ব'সে আছেন তিনি, তা হ'লে কাজ কী ঝামেলায়, দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করলেই

চলবে যাতে বলা আছে, প্রভু, আপনার নায়কত্বে দেশ তথা জাতি প্রতিনিয়ত উৎকর্ষ ও উন্নতির উচ্চ শিখর থেকে উচ্চতর শিখরের দিকে অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে চলেছে।

ধরণী দ্বিধা হও বলারও কোনো অর্থ হয় না। যাঁদের মেরুদণ্ড নেই তাঁরা কেন সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন না অবান্তর জল্পনা তা। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, স্বৈরতন্ত্র তো তেমনি একপাক্ষিক ব্যাপার না। উপর থেকে আমাদের উপরে আদেশ-নির্দেশ চাপিয়ে দেওয়া হলো, না মেনে আমাদের উপায় কী, গর্দানা যাবে যে, এবংবিধ সাফাই অন্য-একটি সমান সত্যকে অসাধুভাবে আড়ালে রাখতে চায়। যাঁরা আপাতবিচারে শিক্ষিত-সংস্কৃত, যাঁদের জ্ঞানে কোনো ঘাটতি নেই, বিকল্প জীবিকা সংগ্রহ করতেও যাঁদের খুব বেশি অসুবিধা হবার কথা নয়, তাঁরা যদি প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেন, অপমান মুখ বুঁজে সহ্য করেন, স্পষ্ট কথা উচ্চারণ করার সাহস বিসর্জন দেন, কোনোক্রমে নিজেদের সুযোগ-সুবিধাগুলি রক্ষা করার তাড়নায় তাঁরা যদি বিবেককে অতল জলে ডুবিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত, তাহ'লে স্বৈরাচার তার সাম্রাজ্য বিস্তার করবেই। মনীষী ও বিদূষকে ব্যবধান যদি ঘুচে যায়, অত্যাচারীদের সাহস সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায় সেই অবস্থায়।

সুতরাং ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বাধ্যক্ষের কাছে যতই চিঠি লিখুন, নির্বাচনের প্রাক্‌কালে তাঁর রাজ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কর্তৃক ঋণমেলা অনুষ্ঠিত হবেই, এবং নতুন দিল্লির শাসকদল হরির লুটের বাতাসার মতো বেপরোয়া কিছু প্রসাদ বিতরণ করবেনই, এই আশায় যদি একটি-দু'টি বাড়তি আসন এই অনাচার ঘটিয়ে ছিনিয়ে আনা যায়। রিজার্ভ ব্যাংকের সর্বাধ্যক্ষ চল্লিশ-বছর ধ'রে পরিশোধিত-পরিমার্জিত আমলা, তিনি যদি ধর্মভীরু হন বিশেষ-কিছু বলবার থাকে না। যোজনা কমিশনে প্রবিষ্ট পণ্ডিতপ্রবর অর্থনীতিবিদ্‌দের যে-সাহস নেই, আমলাবাহিনী সেই সাহসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবেন এমন আশাপোষণ অন্যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীর চিঠিখানা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বাধ্যক্ষ সুতরাং বড়োজোর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, তারপর শ্মশানের নিস্তব্ধতা নামবে, অন্য দিকে ঋণমেলার নামে ত্রিপুরায় কয়েকটি দিন শ্মশানে-ভূতের-নাচের পালা অনুষ্ঠিত হবে।

দেশে আরো রসিকতা ঘটবে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যেখানে যেখানে শাসকদলের হেরে যাওয়ার আশঙ্কায়, সে-সব জায়গায় কোনো-না কোনো-ছুতো তুলে সমস্ত নির্বাচন-উপনির্বাচন বন্ধ ক'রে দেবেন। তাঁকেও আলাদা ক'রে দোষ

দেওয়া যায় না, তিনি হয়তো ভবিষ্যতে রাজ্যপাল হবার বাসনা পোষণ করেন, আপাতত শাসকদলের খানিকটা মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা তেমন-কিছু গর্হিত অপরাধ নয়।

জ্ঞানীগুণী মানুষরা নিজেদের সত্তাকে বেচে দিচ্ছেন যখন, সেই অবস্থায় জাতিকে বাঁচানোর দায় তো আমলাতন্ত্রের নয়। দেশের সামনে আপাতত সবচেয়ে বড়ো বিপদ, মনে হয়, এটাই : পণ্ডিতরা মূর্খ, তা হ'তেই পারে, কিন্তু, সেই সঙ্গে আরো যা, পণ্ডিতরা বিবেকহীন ; কোনো সমাজের পক্ষে তার চেয়ে কলঙ্কজনক কিছু হ'তে পারে না।

# কবরে-চাপা ইতিহাস

আমি-আপনি বাড়িতে ব'সে বই লিখতে পারি, কিন্তু বই ছেপে বের করতে টাকা দরকার, উল্লেখযোগ্য বা আকর্ষণীয় কিছু বলা হয়ে থাকলে সেই বইয়ে, ছেপে বের হওয়ার পর আলোচনার মধ্য দিয়েই তার প্রচার সম্ভব। প্রচার না হ'লে বিশেষ-কেউ জানতেও পারবেন না এমন-একটি বই লেখা হয়েছে, এবং বইয়ের তেমন বিক্রি না হ'লে খরচের টাকা উঠে আসবে না। যে-কোনো গবেষণা বা বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই অবশ্য সমস্যাটি সমান বাস্তব, কবি-সাহিত্যিকদেরও একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অনেকে অবশ্য এটাও বলেন, আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়, তেমনি যাঁরা প্রথম জীবনে কৃচ্ছ্রসাধনা করেছেন, অনেক কষ্টে অবশেষে নিজেদের বই প্রকাশ করতে পেরেছেন, তাঁদের কৃচ্ছ্রের প্রভাব প্রতিফলিত হবে প্রকাশিত গ্রন্থের অধিকতর গুণগত উৎকর্ষে। সবুরে মেওয়া যেমন ফলে, কষ্টেসৃষ্টে অনেক দেরিতে হ'লেও একবার যদি বইটি ছেপে বের করানো যায়, তা হ'লে তার নিহিত ঐশ্বর্য দেশের লোকের মন বেশি-বেশি ক'রে কাড়বে।

অথচ সমাজধারা বাদ দিয়ে তত্ত্বকথার কোনো সার্থকতা নেই। শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় কোন্-কোন্ ধরনের বই লেখা হবে, এবং কোন্ বই সম্পর্কে কী ধরনের প্রচার বা আলোচনা হবে, তা-ও শ্রেণীভিত্তিক সমস্যা হয়ে পড়ে। সব বই কদর পায় না, বিশেষ কয়েকটি বই পায়। ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়েই প্রতিটি দেশেই এরকম ঘটেছে। যে-কবি বা দার্শনিক নিজের মনে গ্রন্থ রচনা ক'রে গেছেন, রাজার বা রাষ্ট্রের প্রসাদের ধার ধারেননি, তিনি অবহেলায় পাশে প'ড়ে থেকেছেন, অন্য পক্ষে যে-কবিমন্য বা খলপণ্ডিত রাজসভায় কোনোক্রমে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছেন, এবং রাজার প্রসাদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তাঁকে আর চিন্তা করতে হয়নি, রাজার কাছ থেকে শিরোপাই শুধু তিনি পাননি, যেহেতু রাজপ্রসাদ লাভের খবর সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে, তাঁর গ্রন্থের চাহিদা হু-হু ক'রে বেড়েছে, তাঁর ঐহিক বৈভব বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সরকারের হাতে অপর্যাপ্ত ক্ষমতা, অপর্যাপ্ত সম্পদ। সরকার ইচ্ছা করলে রাতকে দিন করতে পারেন, দিনকে রাত।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ধনী সংবাদপত্র বা ব্যবসায়ী

গোষ্ঠী। তাঁরাও দিনকে রাত বানাতে পারেন, রাতকে দিন, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কোনো কবি বা সাহিত্যিকের উপর দয়াপরবশ হয়ে, তাঁকে আকাশে তুলে ধরতে পারেন, অন্যদিকে যথার্থ প্রতিভাবান কোনো লেখককে যদি তাঁদের অপছন্দ হয়, তাঁকে নানা ফন্দিফিকির এঁটে চূড়ান্ত অবহেলার গর্ভে নিক্ষেপ করতে তাঁদের বিবেক সামান্যতমও কাঁপে না। এরকম ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে চল্লিশ বছর ধ'রে দেখেছি। শাসকশ্রেণী এবং সেই শ্রেণীভুক্ত পয়সাওলা মালিক-ঠিকেদার-ব্যবসাদাররা পছন্দমতো সাহিত্যিক তৈরি করছেন, সেই সাহিত্যিককে পুরস্কারভূষিত করছেন, পরে তাঁকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন। আজ থেকে প্রায় একশো পঁচিশ বছর আগে, এ ধরনের ঘটনাক্রম পর্যবেক্ষণান্তেই মার্কস মন্তব্য প্রয়োগ করেছিলেন, যে-কোনো দেশে যে-কোনো যুগে সবচেয়ে ক্ষমতাওলা শ্রেণীর চিন্তাধারা সমাজের প্রধান চিন্তাধারার রূপ পরিগ্রহ করে।

অর্থাৎ শ্রেণী বিভক্ত সমাজব্যবস্থায় শাসককুল যা লিখতে বলেন, বশংবদ লেখকরা তাই লেখেন, অন্যতর ভাবনাচিন্তা শ্রেণীস্বার্থের পরাক্রান্ত ভারে ডুবে যায়। বিশেষ ক'রে এটা ঘটে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে। সাধারণ মানুষ ইতিহাস থেকে প্রেরণা অনুসন্ধান করেন, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত হাতড়ে বেড়ান ইতিহাসের শরীরে। তাই কী ইতিহাস লেখা হবে, কোন্ ভঙ্গিতে বা প্রকরণে লেখা হবে, সেই ইতিহাসে কোন্-কোন্ শ্রেণীর কীর্তিকাহিনী প্রাধান্য পাবে এবং কাদের আদৌ পাত্তা দেওয়া হবে না, এসব সমস্যা নিয়ে প্রতি মুহূর্তে যে-কোনো সমাজে প্রভূত আলোচনা হয়ে থাকে। শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে ইতিহাসচর্চাকে ব্যবহার করার প্রয়োজন স্বীকৃতি পায়; সরকারে আসীন আছেন যে-শ্রেণী বা শ্রেণীগোষ্ঠী, তাঁরা তাঁদের মতো ক'রে ইতিহাস গুছিয়ে লেখবার নির্দেশ দান করেন। শ্রেণী-স্বার্থের তাগিদে তাই ইতিহাসকে একটু লেপামোছা করা হয়, কোনো যথার্থ ঘটনা চেপে যাওয়া হয়, অন্য-কোনো অতি সাধারণ ঘটনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মহত্তর রূপে চিত্রিত করা হয়, কানা ছেলে পদ্মলোচন ব'নে যায়, দুশ্চরিত্র, অতি লম্পট কোনো রাজপুত্র মহাপুরুষ নামে আখ্যাত হন, আবার শ্রেণীভিত্তিক ইতিহাসের প্রয়োজনে কোনো সজ্জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চরিত্রে এক কাঁড়ি কলঙ্ক লেপন করা হয়।

খাঁ আব্দুল গফ্ফর খাঁ, আমরা যাঁকে সীমান্ত গান্ধি নামে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত, আটানব্বুই বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে

চিরাচরিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে, তাঁকে যেদিন সমাহিত করা হলো পাকিস্তান-আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী জালালবাদ শহরে, গোটা ভারতবর্ষে সরকারি-বেসরকারি কাজকর্ম বন্ধ হলো। কিন্তু দেশের শাসককুল মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাসও নিশ্চয়ই ফেললেন সেই সঙ্গে। খাঁ আব্দুল গফ্ফর খাঁ-র জীবনাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে অতীত ইতিহাসের একজন সাক্ষী বিলুপ্ত হলেন, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটি অতি কলঙ্কজনক অধ্যায় সম্পর্কে মনে করিয়ে দেওয়ার বিশেষ-কেউ আর রইলেন না, এবার ধীরে-সুস্থে আগাগোড়া লেপে-পুছে, নিজেদের মনের মতো ক'রে ইতিহাসের সেই বিশেষ অধ্যায়টিকে লিখতে পারবেন আমাদের কর্তাব্যক্তিরা, অথবা তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত কলমনবিশরা।

ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে ভাগ করা নয়, আদর্শের ভিত্তিতে দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে সংঘবদ্ধ করা : এই আস্থার উপর নির্ভর ক'রে সীমান্ত গান্ধি ও তাঁর অনুগামী খুদা-ই-খিদ্মতগাররা দশকের পর দশক ধরে দেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সাধারণ মানুষকে জড়ো করছিলেন। অন্যান্য অঞ্চলে ও প্রদেশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, মুসলিম লীগের সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবিলায় চূড়ান্ত ব্যর্থ, মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্তরা কাতারে-কাতারে লীগের ছত্রছায়ায় জড়ো হচ্ছেন প্রতিদিন, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দিশেহারা, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। একমাত্র একটি অঞ্চলে মুসলিম লীগের পরিকল্পনা ব্যর্থ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পাঠানকুলতিলক খাঁ আব্দুল গফ্ফর খাঁ ও তাঁর সত্যানুসন্ধানী খুদা-ই-খিদ্মতগার সম্প্রদায় জাতীয় অখণ্ডতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মন্ত্র সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অন্তঃস্থলে অনুপ্রবেশ করাতে সফল, একটির পর আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সীমান্ত প্রদেশে, প্রতিটি নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাভূত, সীমান্ত গান্ধির নায়কত্বে জাতীয় কংগ্রেস বিজয়ী। লীগের তামসিকতার বিরুদ্ধে সীমান্ত গান্ধি ও তাঁর অনুগামীরা সর্বস্ব পণ ক'রে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তখন, তাঁদের বিশ্বাস অব্যাহত ছিল যে যেহেতু ইতিহাস তাঁদের পক্ষে, যেহেতু সর্বদা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মানুষের অভিযাত্রা, লীগের পতন ঘটবেই, এবং সীমান্ত প্রদেশে যেমন, ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও জাতীয় ঐক্যের অঙ্গীকারে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা দীক্ষিত হবেন, দেশের অখণ্ডতা রক্ষিত হবে।

সীমান্ত গান্ধি নিজে যে-দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়েছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতারাও সেই ধরনের অনমনীয় দৃঢ়তা দেখাবেন, দেশকে ভাগ হ'তে দেবেন না। তিনি অপাত্রে ভরসা রেখেছিলেন। ইংরেজরা সেই মুহূর্তে

লোভনীয় চুষনকাঠি দেখাচ্ছে, তাদের হাতের ব্যাটন তারা জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের হাতে স'পে দিতে প্রস্তুত, এই অবস্থায় মহাত্মা গান্ধি বা সীমান্ত গান্ধির মতো অবুঝ গুরুজনদের প্রলাপোক্তিতে কান পাততে নেই। কান পাতেননি কংগ্রেস নেতারা, যে যা বলুক ভাই, তাঁদের সোনার হরিণ চাই। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যে-কথা-বার্তা হচ্ছিল, তাতেও কিন্তু কোনো ইঙ্গিত ছিল না যে দেশটা ভাগ হবেই, বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছিল, একটি অখণ্ড মহাযুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে মতৈক্যের সূত্রও প্রায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল। অথচ জাতীয় কংগ্রেসেব নেতারা অস্থির, তাঁরা বরঞ্চ আদর্শ বিসর্জন দিতে সম্মত, তাঁরা বরঞ্চ দেশের একটা-দু'টো অংশ পুরোপুরি মুসলিম লীগকে ছেড়ে দিতে রাজি, কিন্তু অন্যান্য অংশের উপর তাঁদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চাই। অতএব ভারতমাতা ত্রিখণ্ডিতা হলেন, কংগ্রেসের নেতারা রাজধানী দিল্লিতে মন্ত্রী হয়ে বসলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস কর্মীদের কথা, খুদা-ই-খিদ্‌মতগারদের অতুলনীয় আদর্শনিষ্ঠার কথা, সীমান্ত গান্ধির সকাতর আবেদনের কথা ভুলেও ভাবলেন না। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে সীমান্ত গান্ধির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, এরকম চরম বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ ইতিহাসে খুব বেশি নেই।

পাশাপাশি সংগ্রাম করেছেন যাঁদের সঙ্গে, তাঁদের কলঙ্কজনক আচরণে সীমান্ত গান্ধি বিচলিত নিশ্চয়ই হয়েছিলেন, কিন্তু তা ব'লে ভেঙে পড়েননি। দিল্লিতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা পরম তৃপ্তির সঙ্গে রাজ্যশাসন করেছেন, দণ্ডমুণ্ডেব কর্তা বনেছেন, বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন, অন্য দিকে পাকিস্তানে খাঁ আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন, পুরোনো দিনের মতোই পুলিসের লাঠি-গুলি-অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছেন, দফায়-দফায় কারাবরণ করেছেন, তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে, তাঁব পবিবাববর্গকে চূড়ান্ত সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু আদর্শে অবিচল থেকেছেন সীমান্ত গান্ধি, আপস করেননি কোনোদিন তাঁর একদা-সহযোগী কংগ্রেস নেতাদের মতো।

যেহেতু শাসককুলের ইচ্ছানুযায়ী ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে, আমাদের দেশে গত চল্লিশ বছর ধ'রে যে-ইতিহাসচর্চা চলেছে, তাতে সীমান্ত গান্ধি তথা খুদা-ই-খিদ্‌মতগারদের প্রতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ন্যক্কারউদ্রেককারী বিশ্বাসঘাতকতার অবশ্যই কোনো উল্লেখ থাকে না। আদর্শ থেকে সুবিধাবাদে উত্তরণের অধ্যায়টি কবরচাপা দেওয়া আছে। শাসককুলের আশঙ্কা, তেমন জানাজানি হয়ে গেলে

যে-সব গালভরা বুলি লালকেল্লার সানুদেশে দাঁড়িয়ে প্রতি বছর বিশেষ একটি দিনে নিষ্ঠাসহকারে বলা হয়ে থাকে, তাদের কপটতা তথা অন্তঃসারশূন্যতা সাধারণ মানুষের কাছে অচিরেই ধরা পড়বে।

সীমান্ত গান্ধি মুখ খুললে আমাদের শাসকবৃন্দ ঘোর বিপদে পড়তেন। খাঁ আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ আমৃত্যু সৌজন্য দেখিয়ে গেছেন, ক্ষমা ক'রে গেছেন বিশ্বাস-ঘাতকদের। কিন্তু অতিবৃদ্ধদের বিশ্বাস নেই, জড়বুদ্ধিবশত তাঁরা কখন কী অকথা-কুকথা ব'লে ফেলেন, সীমান্ত গান্ধির দেহাবসানে দিল্লির কর্তাব্যক্তিদের মস্ত ফাঁড়া কাটলো।

তবে যথার্থ ইতিহাস তো একদিন লেখা হবেই। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মুহূর্তে আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নগদ প্রাপ্তির লোভে আরো কী-কী অপকীর্তির সঙ্গে জাতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের জড়িত করেছিলেন, তার কিছু আভাস সম্ভবত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মজীবনীর অপ্রকাশিত অংশে উল্লেখিত। মৌলানা আজাদ জীবদ্দশায় কাউকে অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলে বেদনাবিদ্ধ করতে চাননি, তাই নাকি নির্দেশ দিয়ে-ছিলেন আত্মজীবনের এই অংশটি জাতীয় মহাফেজখানায় গচ্ছিত থাকবে, তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পরে যেন তা সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয়। আগামী মাসে মৌলানা আজাদের মৃত্যুর পর তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হবে, কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নেই, শাসককুল কোনো-না-কোনো ছুতো ধ'রে মৌলানালিখিত আত্মজীবনীর ভগ্নাংশটি প্রকাশে সম্ভবত বাধা দেবেন। যেহেতু জোর যার, আপাতত মুলুক তার, শাসককুল হয়তো সফলও হবেন। কিন্তু কতদিন আর আসল ইতিহাসকে গলা টিপে বাকরুদ্ধ রাখতে পারবেন তাঁরা? অতীত তার কথা কইবেই, যা আসল সত্য, শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও অনন্তকালের জন্য মাটিচাপা থাকবে না তা।

## আমরা মারা পড়ছি, কিন্তু কেন

কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ তো এখনো বাকি, কিন্তু এরই মধ্যে, গত এক মাসে, পেট্রোলের দাম ঝটকা বাড়ানো থেকে শুরু ক'রে খাম-পোস্টকার্ড-টেলিফোনের ভাড়া-রেলের মাশুলের সর্বাত্মক বৃদ্ধি ঘটিয়ে তিন হাজার-সাড়ে তিন হাজার কোটি বাৎসরিক অতিরিক্ত বোঝা নতুন দিল্লির কর্তাব্যক্তিরা জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিশপত্রের দাম দিনের পর দিন বর্ধমান, এবং তার কারণ প্রাকৃতিক দুর্বিপাক নয়, পরম দয়ালু কেন্দ্রীয় সরকার নিজে থেকে ফতোয়া জারি ক'রে জিনিশপত্রের দাম চড়াচ্ছেন বলেই জিনিশপত্রের দাম চড়ছে। দাম বাড়িয়ে সরকার টাকা জোগাড় করছেন নিজের খরচ মেটানোর জন্য। উচ্চবিত্তদের উপর কর চাপিয়ে সরকারের পক্ষে অবশ্য অর্থসংগ্রহ সম্ভব, কিন্তু বর্তমান সরকারের যা শ্রেণীচরিত্র, বড়োলোকদের বাড়তি ট্যাক্সো দিতে কখনোই বলা হবে না। সরকারের ব্যয় যেহেতু হু-হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে প্রতি বছর, সাধারণ মানুষের উপর বোঝার ভারও অতএব দুর্বিষহ থেকে দুর্বিষহতর হচ্ছে।

দিল্লির সরকার এটা বলতে পারবেন না যে যেহেতু অভূতপূর্ব খরা-বন্যার জন্য এ বছর অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হয়েছে, জিনিশপত্রের দাম বাড়িয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে বাড়তি সম্পদ সংগ্রহ না ক'রে উপায় ছিল না। খরা-বন্যার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়নির্বাহের অজুহাতে সরকার তো বাইরে থেকে প্রায় হাজার কোটি টাকা গত কয়েক মাসে ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, ত্রাণের নামে যে-পরিমাণ খরচ করা হয়েছে বছর ভ'রে ঋণ হিশেবে তার চেয়ে হয়তো বেশিই পেয়েছেন। সুতরাং দেশের মানুষকে শোষণ ক'রে যে-সমস্ত টাকা তোলা হয়েছে, খরাবন্যাত্রাণের ছুতো তাদের ক্ষেত্রে দেখানো চলবে না।

কিন্তু, ছলের তো অভাব হয় না, বলা হবে দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থে বাড়তি টাকার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, দেশকে তো টেঁকাতে হবে, দেশ টিঁকলে জাতি, আমরা শত্রু ও সম্ভাব্য শত্রু-পরিবেষ্টিত, দেশের অভ্যন্তরে পর্যন্ত শত্রু ঢুকে গেছে, তারা অন্তর্ঘাতের চেষ্টা করছে, তাই প্রতিরক্ষার খাতে খরচ না বাড়িয়ে উপায় নেই, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্যও ব্যয় বাড়াতেই হবে। প্রতি মুহূর্তে দেশের

মানুষকে শুনতে হচ্ছে যে দেশেরই স্বার্থে চাল-গম-চিনি-ভোজ্য তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে, পোস্টকার্ডের দাম-রেলের মাসুল বাড়াতে হচ্ছে একই কারণে, পেট্রোলের দামও বেড়েছে প্রতিরক্ষা-নিরাপত্তার স্বার্থে। প্রকারান্তরে বলা হচ্ছে, যাঁরা-যাঁরা সাধারণ মানুষের উপর ক্রমান্বয়ে এই বাড়তি বোঝা চাপানোর প্রতিবাদ জানান, তাঁরা আসলে দেশকে তেমন ভালোবাসেন না, অর্থাৎ তাঁরা সবাই দেশদ্রোহী। জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত ক'রে, সর্বস্তরে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে, প্রতিরক্ষা-নিরাপত্তা খাতে অঢেল টাকা খরচ করার অন্য নাম দেশপ্রেম, আর প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কমিয়ে টাকা বাঁচিয়ে সেই টাকা গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের প্রয়োজনে খরচ করার কথা বলা দেশদ্রোহিতার শামিল। দিল্লির সরকারের হাতে প্রচারযন্ত্র আছে, সুতরাং এধরনের দর্শন যদি এখন প্রচারিত হ'তে শুরু হয়, অবাক হবার কিছু নেই। অস্ত্রসম্ভার বিকনেওলা দেশী-বিদেশী ঠিকেদাররা যে-টাকাটা ঘুষ দেয়, তা-ও সরকারের টাকা, অর্থাৎ দেশের মানুষকে শোষণ ক'রে সংগৃহীত, কিন্তু প্রতিরক্ষা ব্যয় নিয়ে টুঁ শব্দটি করা চলবে না, যদি করতে যাই তা হ'লে আমার-আপনার দেশপ্রেম নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করা শুরু হয়ে যাবে।

এখানেই মুশকিল দেখা দেয়। আমরা বলি, দিল্লির সরকার চরম প্রতিক্রিয়াশীল, দেশের মানুষকে শোষণ ক'রে ঝাঁঝরা ক'রে দিচ্ছে, তবে এই সরকারের বৈদেশিক নীতি তেমন-কিছু খারাপ নয়। মাঝে-মাঝে সন্দেহ না হয়েই পারে না, ভাবের ঘরে হয়তো চুরি করছি আমরা। আশি কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে কোনো বিদেশী শক্তিই আমাদের বেশি ঘাঁটাতে সাহস পাবে না, আড়ালে-আবডালে একটু-আধটু চিমটি কাটবার চেষ্টা করবে মাত্র। দেশের অধিকাংশ মানুষ শান্তির স্বপক্ষে, তাঁরা স্বভাবতই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমূহের প্রতি অনুরাগ-আবদ্ধ। এই অবস্থায় দেশের সরকারের শ্রেণীচরিত্র যা-ই হোক্ না কেন, কিছুতেই সেই সরকারের সাহস হবে না চিরাচরিত সহ-অবস্থান ও সম-দূরত্বভিত্তিক বৈদেশিক নীতি প্রকাশ্যে বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে একাত্ম হবার। দেশের মানুষ সে-ধরনের কোনো ব্যভিচার আদৌ বরদাস্ত করবেন না। ইন্দিরা কংগ্রেস দলের সরকার এটা ভালোভাবেই জানেন, যেমন জানতেন ঐ ১৯৭৭-৭৯ সালের ক্ষণায়ু জনতা সরকারও। জনতা দলে কয়েকজন বাঘা-বাঘা পশ্চিমপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির বিন্দুতম পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হননি, বরঞ্চ উক্ত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী

চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে উদ্যমশীল হয়েছিলেন পর্যন্ত। বর্তমান কংগ্রেসী সরকারেরও সাহস নেই যে সমগ্র দেশবাসীর সংহত ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে প্রকাশ্যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে হাত মেলাবেন।

কিন্তু প্রকাশ্য ঘোষণা এক জিনিশ, প্রচ্ছন্ন প্রবণতা সম্পূর্ণ অন্য বস্তু। যাঁরা মার্কিন অর্থদর্শনে অগাধ আস্থা রাখেন, যাঁরা উঠতে-বসতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাদির নিন্দামুখর হন, যাঁরা বড়োলোকদের উপর কর চাপাতে রাজি নন, গরিব মানুষদের যাঁরা ঘৃণার চোখে দেখেন এবং মনে করেন ধনী সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করবার প্রয়োজনে দরিদ্রতর শ্রেণীর উপর উত্তরোত্তর অধিকতর আর্থিক বোঝা চাপানো অতি সুব্যবস্থা, তাঁরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের তাগিদেই লুকিয়ে-চুরিয়ে পশ্চিমী দেশগুলির দিকে ঝুঁকে পড়ার সুযোগ খুঁজবেন। দেশকে তাঁরা আস্তে-ধীরে বিদেশী পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন, সেই স্বপ্ন যদি সফল হয় তা হ'লে আমাদের বৈদেশিক নীতিও খোল-নল্চে পাল্টে যাবে, কারো পক্ষেই আর সেই সর্বনাশ ঠেকানো সম্ভব হবে না সম্ভবত। সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয়, বৈদেশিক নীতিতেও তা হ'লে, আজ না হ'লে আগামী কাল, তার ছায়া পড়তে বাধ্য।

এ বছর ইতিমধ্যেই কংগ্রেসী সরকার তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি জনসাধারণের উপর বাড়তি বোঝা চাপিয়েছেন। সেই সঙ্গে হয়তো হাজার দশেক কোটি টাকার অতিরিক্ত নোট ছেপে বাজারে ছেড়েছেন, গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষ তিলেতিলে যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছেন। এখন যুক্তি দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষকে এতটুকুন আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যেতেই হবে, নইলে দেশের প্রতিরক্ষা বিপন্ন হবে, আমাদের সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন মেটানো যাবে না, শ্রীলঙ্কায় যে আমাদের হাজার পঞ্চাশেক সৈন্য পাঠিয়েছি তাঁদের জন্য সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হবে না। আমাদের সৈন্যসামন্তরা জীবনপাত ক'রে শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করছেন, দেশে কোন্ পাতক আছে যে তাঁদের স্বার্থে সরকারকে বাড়তি একটা-দু'টো টাকা জোগাতে রাজি হবে না?

অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে আমাদের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এটাই স্বাভাবিক, এমন না হ'লেই বিস্মিত হ'তে হতো। যেহেতু বৈদেশিক নীতির স্বার্থে শ্রীলঙ্কায় আমাদের হাজার-হাজার সৈন্য পাঠাতে হয়েছে, এবং যেহেতু সরকারের বৈদেশিক নীতি, আমরা নিজেরাই স্বীকার করছি,

অত্যুত্তম, সুতরাং শ্রীলঙ্কায় পাঠানো সৈন্যদের খোরাকি মেটাবার প্রয়োজন কোনো যুক্তিতেই আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না, সুতরাং গরিব মানুষগুলিকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়ে সরকার যদি বাড়তি টাকা তোলেন, তার ন্যায্যতা কেন মেনে নেব না ?

এ ধরনের সংশয়ের হাত থেকে সত্যিই কি আমরা পালিয়ে বেড়াতে পারি অনন্তকাল ধ'রে ? শ্রীলঙ্কা নিয়ে নতুন ক'রে ভাববার সময় সত্যিই কি আসেনি ? শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলের সঙ্গে আমরাও শ্রীলঙ্কায় শান্তি ফিরে আসুক সর্বমুহূর্তে সেই কামনা ব্যক্ত করি, ঐ দ্বীপের সিংহলী ও তামিল সম্প্রদায়ের মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি নিটোল থাকুক তা আমাদেরও সাধনা। গত বছর যে-চুক্তি তাড়াহুড়ি সই করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে যদি শান্তি সংস্থাপিত হতো, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সাধুবাদ জানাতাম আমরা। কিন্তু ঘটনাবলী তো সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। তামিলদের প্রধান যে-দল, তাঁরা মনে করছেন না শ্রীলঙ্কার তামিল-ভাষীদের স্বার্থ চুক্তির শর্তাবলীতে আদৌ সুরক্ষিত হয়েছে। তাঁরা বলছেন চুক্তিটি জোর ক'রে তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ঠিক কথা বলছেন কি অন্যায় কথা বলছেন, তাঁরা তামিল সম্প্রদায়ের যথার্থ মঙ্গলকামী অথবা ঘোর দুরাত্মা, তা নিয়ে অবশ্য তর্ক উত্থাপন করা যেতে পারে, এবং সেই তর্ক অনেকদূর গড়াবে। কিন্তু প্রধান ঘটনা তো উপেক্ষা করার উপায় নেই, শ্রীলঙ্কাস্থ তামিল সম্প্রদায়ের বহুলাংশের উপর এই দলের প্রভাব অনস্বীকার্য, ছ'-সাত মাস অবিশ্রান্ত চেষ্টার পরেও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তামিলপ্রধান অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে অপারগ হয়েছে, প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর আয়তন বেড়ে-বেড়ে এখন পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কও ছড়িয়ে গেছে, এবং শ্রীলঙ্কার তামিলদের একটি বড়ো অংশের কাছে ভারতীয় বাহিনীর সংজ্ঞা এখন আর বন্ধু নয়, বৈরী।

অন্য যে-ক্ষতি হয়েছে তা আরো মারাত্মক। যে-কোনো দেশের চেতনাসম্পন্ন মানুষ এটা পছন্দ করবেন না যে অন্য-কোনো দেশের সেনাবাহিনী অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাঁদের দেশে উড়ে এসে জুড়ে বসবেন, দেশের সরকারের উদ্যোগে এবং সেই সরকারের সম্মতি নিয়েও যদি বিদেশী সৈন্যরা এসে থাকেন, তা হ'লেও দেশবাসীর অভিমত অন্যরকম হবার নয়। শ্রীলঙ্কার নিজস্ব সৈন্যবাহিনীতে সব-মিলিয়ে মাত্র বারো হাজার সেনা, ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো সৈন্যসংখ্যা তার চারগুণেরও বেশি, এই অবস্থায় শ্রীলঙ্কায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে আতঙ্ক ও বীতরাগ সংক্রামিত না হয়েই পারে না। হঠাৎ যদি আমাদের দেশে চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ

মার্কিন বা ইংরেজ বা ফরাসী বা চীনে সৈন্য, আমাদের সরকারের অনুমতি নিয়েই, হঠাৎ হাজির হতো, তা হ'লে সাধারণ ভারতবাসীর মনে যে-ধরনের ত্রাস ছড়াতো, ভারতীয় সৈন্যদের উপস্থিতিতে অনুরূপ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে গোটা শ্রীলঙ্কা জুড়ে, সিংহলভাষীদের ঘরে-ঘরে এখন ভারতবিদ্বেষ দ্রুতহারে ক্রমবর্ধমান। বিদ্বেষ, ক্ষোভ, অসহায়তাবোধ, সব-কিছু মিলিয়ে এখন এক বিস্ফোরণসম্ভব পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কার সর্বত্র। উত্তর ও পূর্ব প্রান্তে ভারতীয় সৈন্যদের ভূমিকা তামিলদের পছন্দ হচ্ছে না, এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিহেতু দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চলে ভারত-বর্ষের 'আগ্রাসী' 'সাম্রাজ্যবাদী' ভূমিকা নিয়ে সিংহলীভাষীদের পুঞ্জীভূত আবেগ, সে-আবেগকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে স্বভাবতই কিছু-কিছু চক্রান্তকারী কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন।

মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, ঠিক এই মুহূর্তে, আমাদের বৈদেশিক নীতির বিশেষ বিন্যাসের প্রত্যক্ষ পরিণামে, শ্রীলঙ্কা দ্বীপের জনসাধারণের প্রধান অংশ ভারতবর্ষকে বন্ধু অথবা শুভানুধ্যায়ী হিশেবে আর মানতে রাজি নন, আমাদের সেনাবাহিনী যত বেশিদিন ঐ দেশে অবস্থান করবে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে বীতরাগ তত বেশি ছড়াবে। এক দিক থেকে বিচার করলে সন্দেহ না হয়েই পারে না, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি শ্রীলঙ্কায় শান্তি পুনর্স্থাপনে শুধু ব্যর্থই হয়নি, আমাদের সৈন্যদের উপস্থিতি দেশটিকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এবং কেউ-ই বুকে হাত ঠেকিয়ে আগে থেকে বলতে পারবেন না যে এই গৃহযুদ্ধের শেষে প্রগতিপন্থীরা শ্রীলঙ্কায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, শুভবুদ্ধিসম্পন্নরা নিজেদের বিজয় কেতন ওড়াতে সফল হবেন।

আভ্যন্তরীণ নীতির ছায়া যেমন বৈদেশিক নীতিতে পড়ে, বৈদেশিক নীতির ছায়াও আভ্যন্তরীণ নীতিতে পড়তে বাধ্য। শ্রীলঙ্কায় আমাদের সৈন্যরা গিজগিজ করছে, আমাদের বেতার-দূরদর্শন সেখানে ইতিমধ্যে প্রবিষ্ট, প্রশাসকরা পর্যন্ত কিছু সংখ্যায় এদেশ থেকে হাজির হয়েছেন ওদেশে। গুণাগার দিতে হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষকে, পরম মহৎ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করলেও সরকারের শ্রেণীচরিত্র তো পাল্টাবার নয়, সুতরাং শ্রীলঙ্কা অভিযানের খরচ তোলবার জন্য বড়োলোকদের উপর করের বোঝা তো আর বাড়ানো হবে না, পুরো টাকাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাবতীয় গরিব মানুষদের আরেক দফা পীড়ন ক'রে। এই উৎপীড়িত মানুষগুলির নিশ্চয়ই প্রশ্ন করার অধিকার আছে, কীসের স্বার্থে আমাদের এভাবে আরো জর্জরিত করা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কায় আমাদের কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে,

ঐ দ্বীপে আমরা শান্তি সংস্থাপিত করছি না শত্রুবৃদ্ধি ঘটাচ্ছি, কোনো বিশেষ পুরুষের ব্যক্তিগত অহংবোধ আর দেশের তথা জাতির স্বার্থ, দু'টোকে কি আমরা এক ক'রে দেখছি না ?

কাদের বাঁচাতে গিয়ে আমরা এখানে ধুঁকে-পুকে মরছি. খুব বেশিদিন তো প্রশ্নটি এড়ানো আর সম্ভব নয়। যুক্তিবোধ ও পুনর্বিবেচনার নাকি মড়ক লেগেছে এদেশ-ওদেশ-সেদেশ জুড়ে। যদি তা-ই হয়, অভিজ্ঞতার আগুনে পুরোনো প্রত্যয়-গুলিকে কেন আরেক বার ঝল্সে নেবো না আমরাও ? বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আমাদের যে সব দিতে হবে তা তো আমরা জানি, কিন্তু মোহমুক্ত হবার অধ্যবসায় থেকে কেন সরিয়ে আনবো নিজেদের ? আমরা মারা পড়ছি, কিন্তু কেন মারা পড়ছি তা জানার অধিকারটুকুও থাকবে না আমাদের ?

# শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে

মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে রবীন্দ্রনাথ মানুষের জয়যাত্রার অভিযানকে বন্দনা ক'রে গান রচনা ক'রে গিয়েছিলেন, অনুষ্ঠানাদিতে সেই গান নিয়ম ক'রে গাওয়া হয় এখন, 'ঐ মহামানব আসে/দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে···/ জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়, মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে'। যদি বলি, নিছক অনুষ্ঠানের ব্যাকরণচর্চা নয়, রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে-মানব অভ্যুদয়, তার সম্পূর্ণতম রূপ আমরা দেখতে পেলাম পশ্চিম বঙ্গের প্রতিটি গ্রামে গত রবিবার, আদৌ কি বাড়িয়ে বলা হবে? গ্রামের লক্ষ-কোটি মানুষ, এই মানুষগুলির বড়ো অংশ এখনো অক্ষর পরিচয়ের বাইরে। আবহমান কাল ধ'রে এই মানুষগুলিকে সুযোগ-সুবিধার বাইরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই মানুষগুলি এখন নতুন একটি উপলব্ধির স্তরে পৌঁছুবার সমীপবর্তী হচ্ছেন, এই দেশটা তাঁদের, দেশের সম্পদে তাঁদের জন্ম-গত অধিকার, সেই অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে, গোটা দেশের আপাতত সামাজিক পরিস্থিতি তথা সামগ্রিক শ্রেণীবিন্যাস, এমন যে এই মুহূর্তে কোনো দুরন্ত ভোজবাজি সম্ভব হবে না, গরিবদের অবস্থা এক পলকে খোল-নল্‌চে পালটাবে না, কিন্তু পঞ্চায়েতী পরীক্ষা তাঁদের সামনে একটি সুযোগ এনে দিয়েছে, সুযোগটিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে হবে। এই সুব্যবহারের মধ্য দিয়েই শ্রেণী-সংগঠন দৃঢ়তর হবে, সমাজচেতনা ব্যাপ্তি পাবে, সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন আরো-একটু বাস্তবের কাছাকাছি আসবে।

পশ্চিম বঙ্গের নিভৃততম, দুর্গমতম গ্রামের মানুষ পর্যন্ত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করবার সার্থকতা, শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও একটু-একটু ক'রে বুঝতে শিখেছেন। বুঝতে শিখেছেন ব'লেই গত রবিবার তাঁরা নিজেদের অভিপ্রায়কে উজাড় ক'রে ব্যক্ত করেছেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের শাদা-মাটা প্রতিবিম্ব নয়, নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের নির্ভরে, নিজেদের স্তরান্তরিত করবার প্রতিজ্ঞার প্রতি-ফলন, যা প্রতিটি গ্রামে উৎসবের রূপ গ্রহণ করেছে। সরকারিভাবে ভোট দেওয়ার সময় নির্ধারিত ছিল বিকেল তিনটে পর্যন্ত, কিন্তু লক্ষ-কোটি মানুষ মিছিল ক'রে, মাদল বাজিয়ে, ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে ভোটের জায়গায় জড়ো হয়েছেন, কাতারে-

কাতারে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে পড়েছেন তাঁরা, তাঁরা তো তাঁদের অধিকার প্রয়োগ না ক'রে ফিরে যাবেন না, বিকেল তিনটের আগে থেকেই তো জড়ো হয়েছেন তাঁরা, তাঁরা ধৈর্য ধ'রে প্রতীক্ষমান, সুতরাং কোনো-কোনো জায়গায় হয়তো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অব্যাহত থেকেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে উৎসারিত গণআলোড়ন এমনকি সাধারণ নির্বাচন-কালীন উৎসাহকে পর্যন্ত ছাপিয়ে গেছে। এটা কল্পনা নয়, ঘটনা। অথচ এখনো কিছু-কিছু, প্রধানত নগরবাসী, টীকাকার এই ঘটনার তাৎপর্য বুঝে উঠতে অক্ষম। গ্রামের মানুষরা অধিকারের স্বাদ পেয়েছেন, অধিকারকে নিজেদের অবস্থার মোড় ফেরাতে কী ক'রে ব্যবহার করা যেতে পারে তা শিখতে শুরু করেছেন, পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা, বিগত দশ বছরে, সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে আস্ত-একটি নতুন দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়েছেন তাঁরা। ভুলচুক যে হয়নি তা তো নয়, এখানে-ওখানে কখনো-সখনো এক মণ দুধের মধ্যে আধ ফোঁটা চোনার মিশ্রণ ঘটেনি তা-ও তো নয়, অভিজ্ঞতার নিরিখে ভুলত্রুটিবিচ্যুতিগুলি শুধরে নেওয়ার অধ্যবসায় অবিরাম চলবে, কিন্তু আগামী দিনেও কিছু-কিছু ভুলচুক ঘটবে, তা শোধরানোর চেষ্টাও চলবে পাশাপাশি। তবে সব-মিলিয়ে যা ঘটেছে, প্রচলিত কাঠামোর সংস্থানে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে অন্যত্র কোথাও তা এর আগে ঘটেনি, প্রচলিত কাঠামোর সমস্ত অসুবিধা-অপূর্ণতার বাধা মেনে নিয়েও একটি মহাপ্রলয় সংগঠিত হচ্ছে পশ্চিম বঙ্গের গ্রামে-গ্রামে, রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত মর্ত্য-ধূলির ঘাসে-ঘাসে সেই রোমাঞ্চের ছোঁওয়া লেগেছে, গত রবিবারের নির্বাচন যার সাক্ষ্য বহন করেছে।

কিন্তু নাগরিক টীকাকাররা আছেন, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বিপুল আসর জাঁকিয়ে থাকবেনও তাঁরা। তাঁরা যদি স্বভাবনাস্তিক হতেন, অর্থাৎ নাস্তিকতা তাঁদের অখণ্ড জীবনদর্শন হতো, তা হ'লেও হয়তো তাঁদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করা যেত। কিন্তু তা তো নয়, এঁদের মধ্যে অধিকাংশই পেশাদার, মাইনে-করা নাস্তিক। এঁরা দেখেও দেখেন না, শুনেও শোনেন না, বুঝেও বোঝেন না, কারণ এই না-দেখা না-শোনা না-বোঝার ভাণ করার জন্যই তাঁদের টাকা দিয়ে পোষা হয়। সাধারণ মানুষের জয়যাত্রার মহান্ কাহিনী তাঁরা নিজেদের কাছেও স্বীকার করবেন না, কারণ তা হ'লে, তাঁদের আশঙ্কা, তাঁদের বৃত্তি চ'লে যাবে। তাই তাঁরা দিনের পর দিন, পরম যত্নভরে, পশ্চিম বঙ্গের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল জুড়ে সন্ত্রাসের কল্প-কাহিনী লিখে যান, একই কাহিনী নানা বিভঙ্গে, কখনো বীররসসহ, কখনো

করুণরসসহ। তাঁদের লেখাটেখাগুলি গ্রামের মানুষেরা আদৌ পড়েন না, কিন্তু শহরের মানুষেরা পড়েন, শহরের মানুষদের মধ্যে অন্তত কেউ-কেউ যা পড়েন তা হয়তো খানিকটা বিশ্বাসও করেন, চুনের ঘরে দাঁড়িয়ে কেউ কি মিথ্যে কথা বলে, ছাপার অক্ষরে যখন লিখেছে, নিশ্চয়ই খাঁটি কথাই লিখেছে।

অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে। থাকে না, কিন্তু এই পেশাদার টাকাকাররা তো অন্ধও নন, তাঁরা জ্ঞানপাপী, বুঝেও না বোঝার ভাণ করছেন। কিংবা যা লিখছেন তা তাঁদের শ্রেণীচেতনার প্রকাশ। তাঁরা, এবং তাঁদের মালিকেরা, পশ্চিম বঙ্গের গণঅভ্যুত্থানের সামগ্রিক চেহারা দেখে নিদারুণ ভয় পেয়েছেন। তাঁরা ত্রস্ত, তাঁদের মনে শ্রেণীস্বার্থভিত্তিক আতঙ্কের উদয় হয়েছে। এই ত্রাস কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যুগ-যুগ ধ'রে যাঁরা শোষিত-বঞ্চিত-অত্যাচারিত হয়ে এসেছেন, তাঁরা যখন মাথা তুলে দাঁড়ান, যেহেতু তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশি, তাঁদের সংগঠিত শক্তির সম্ভবপরতা বহুদূরপ্রসারী, চিরাচরিত শোষকশ্রেণীর প্রতি-নিধিবর্গ একটু ভয় পাবেন বৈকি, অবশ্যই তাঁদের মনে ত্রাস ঘনিয়ে আসবে, কারণ তাঁদের মৌরসী পাট্টায় এবার তো টান পড়বার আশঙ্কা।

অথচ তাঁরা, ঠিক এই জায়গায়, প্রচণ্ড অসাধুতার আশ্রয় নিচ্ছেন, তাঁদের ত্রাসের আসল কারণ চেপে যাচ্ছেন তাঁরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁরা পায়ের তলায় ঠাঁই খুঁজে পাননি, কারণ গ্রামের সাধারণ মানুষ জোট বেঁধে নিজেদের পছন্দের লোককে ভোট দিয়েছেন, খড়কুটোর মতো ভেসে গেছেন মালিক-মহাজন-জোতদার-জমিদারদের বাছাই-করা প্রার্থীরা। পশ্চিম বঙ্গের প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি মহকুমায়, প্রতিটি থানায়, প্রতিটি গ্রামে একই জিনিশ ঘটেছে, একদা যাঁরা প্রজা ছিলেন, তাঁরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্যবর্তিতায় নিজেদের রাজাসনে বসিয়েছেন, একদা যাঁরা রাজা ছিলেন, ব্যাকুল বাদলসাঁঝে তাঁদের দিন ফুরিয়েছে। এই একদা-রাজাদের সম্প্রদায় তাই ত্রস্ত। কিন্তু তাঁদের ত্রাসের হেতু এটা নয় যে জনগণ তাঁদের উপর চড়াও হয়েছেন, ভয় দেখিয়ে তাঁদের ভোট করতে দেননি, সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন: ইতিহাস এগোচ্ছে, এগোচ্ছে ব'লেই তাঁরা ভয়গ্রস্ত, তবে তা ব'লে তো ত্রাসের সঙ্গে সন্ত্রাসের সমীকরণ করা চলে না।

আমাদের পেশাদাররা ঠিক তা-ই করছেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বিরাট তাৎপর্য তাঁরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, গত রবিবারের সুবিশাল গণ-অভ্যুদয় তাঁদের বিজ্ঞাপিত বিচারে কোনো ঘটনাই নয়। মস্ত ভুল করছেন তাঁরা, নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারছেন। কারণ পশ্চিম বঙ্গের গ্রামের-গঞ্জের

মানুষদের চূড়ান্ত অপমান করছেন তাঁরা, এই যে লক্ষ-কোটি মানুষ মাদল বাজিয়ে উৎসব ক'রে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধতায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করলেন ভোটের বাক্সের মধ্য দিয়ে, তাঁরা ফতোয়া জারি ক'রে দিচ্ছেন, তা মূল্যহীন, তা সন্ত্রাসের প্রতিফলন। একটি ভয়ংকর অসত্যকে সত্য ব'লে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছেন শহুরে টীকাকাররা, নিজেরা না বোঝার ভাণ করছেন, কিছু-কিছু নাগরিক মানুষকে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিচ্ছেন। তাঁরা শহরে ব'সে কী বলছেন, বিভিন্ন সূত্রে গ্রামের মানুষ তা জানতে পারছেন। শহুরে টীকাকাররা বিশ্বাস করুন না-করুন, গ্রামের অভাবগ্রস্ত দীনদরিদ্র বিত্তহীন মানুষদেরও হৃদয় আছে, অনুভূতি আছে, চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে, তাঁরা মুখ বুঁজে সহ্য করতে পারেন যেমন, রাগেও ফুঁসে উঠতে পারেন তেমন। এই শহুরে টীকাকাররা তা হ'লে বলছেন আমাদের ভোটের কোনো দাম নেই, আমরা যে ভোট দিলাম তা নাকি গ্রাহ্য নয়, তা গ্রামবাসীদের সম্মিলিত ইচ্ছার নাকি প্রতিফলন নয়, তা নাকি সন্ত্রাসের প্রমাণ, গরিবগুরবোদের প্রতিনিধিরা ভোটে জিতলে সেটা সন্ত্রাস, আর বড়োলোকেরা কোনোক্রমে জিতলে তা নাকি গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা। এ ধরনের অদ্ভুতকিম্ভূত টীকা যত বেশি ক'রে গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছুবে, তাঁদের মানসিকতা তত বেশি তিক্ততায় আচ্ছন্ন হবে, তত বেশি তাঁরা প্রতিজ্ঞায় ফুঁসবেন।

জনৈক বাঙালি কবি, বেশ-কিছু বছর আগে, মন্তব্য প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন : শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে। তবে বাইরে থেকে কোনো কবি উপদেশ বর্ষণ করছেন ব'লেই সামাজিক মানুষের মনে ঘৃণার সঞ্চার হয় না, ঘৃণার একটি সামাজিক ভূমিকা আছে, সমাজের অভিজ্ঞতা থেকেই ঘৃণার সঞ্চার। যে-প্রলয়কে শহুরে ভাষ্যকাররা আটকাতে চান, নিজেদের মিথ্যাচারিতার পরিণামে তাকেই কিন্তু ত্বরান্বিত এবং অপ্রতিরোধ্য ক'রে তুলছেন তাঁরা, গ্রামের মানুষ, নিজস্ব অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়ে, ঘৃণার মন্ত্রে আরো বেশি ক'রে দীক্ষিত হবেন এখন, অপবাদ-অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক্রমশ দৃঢ়তর সংঘবদ্ধ হবেন তাঁরা, নিজেরা আওড়াবেন, প্রতিবেশীর কাছে জপবেন : শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে।

প্রসঙ্গক্রমে ঐ বিদূষকদের কথাও এসে পড়ে, ঐ আজকে-যদি-থাকতো-মামা-পিটিয়ে-তোমায়-করতো-ঝামার দলের কথা। পশ্চিম বঙ্গের গ্রামের-গঞ্জের মানুষের কাছ থেকে তাঁরা অনেক দূরে স'রে গেছেন, গ্রামের-গঞ্জের সাধারণ মানুষ অবহেলাভরে তাঁদের পাশে ফেলে দিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু এই

প্রত্যাখ্যানের সারাৎসার মেনে নিতে তাঁদের অহমিকায় বাধছে, তাঁরা কথায়-কথায় নতুন দিল্লি দেখাচ্ছেন, প্রধান মন্ত্রী-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দেখাচ্ছেন, রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার হুমকি দিচ্ছেন, ত্রিপুরার কায়দায় সেনা নামানোর খোয়াব দেখছেন। বিভিন্ন বিন্যাসে এটাই তাঁরা বলতে চাইছেন, গণতন্ত্রে তাঁদের আর আস্থা নেই, পশ্চিম বঙ্গের গণতান্ত্রিক মানুষ কোনোদিন আর তাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবেন না, অতএব পশ্চিম বঙ্গে গণতন্ত্র শিকেয় তুলে রাখা হোক, রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হোক, পাকিস্তান-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার মতো সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হোক পশ্চিম বঙ্গের প্রশাসনকে, পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের অপরাধের পরিসীমা নেই, ঐ ভাঁড়ের দলের প্রতি তাঁরা বার-বার অনাস্থা জ্ঞাপন ক'রে যাচ্ছেন, সুতরাং তাঁদের শাস্তি পেতেই হবে, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে, ফৌজ নামিয়ে ঢিট করা হবে তাঁদের।

শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে। সমাজশুদ্ধির প্রয়োজনেই ঘৃণা. ইতিহাসের প্রয়োজনেই ঘৃণা।

## খাল কেটে কুমির

বর্তমান প্রধান মন্ত্রী, মাত্র বছর চারেক আগে, তখনো তিনি প্রধান মন্ত্রী হননি, কিন্তু দলের সাধারণ সম্পাদক, পাঞ্জাব ভ্রমণে গিয়ে ভিন্দ্রানওয়ালেকে সাধুপুরুষ ব'লে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই সাধুকে দুশমন ব'লে ঘোষণা করা হলো, তারপর স্বর্ণমন্দির অভিযান, পরবর্তী আরো অনেক রক্তাক্ত কাহিনী, ইন্দিরা গান্ধির হত্যা, দিল্লিতে ও অন্যত্র হাজার-হাজার শিখ সম্প্রদায়-ভুক্তদের বীভৎস সংহারলীলা, কেন্দ্রীয় সরকারের হঠাৎ আকালি দলের এক অংশের সঙ্গে নিদারুণ সখ্যতা, লঙ্গোয়ালের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর, লঙ্গোয়ালের খুন-হয়ে-যাওয়া, পাঞ্জাবে নির্বাচন, আকালি দলের যে-অংশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল, তাদের রাজ্যে সরকার গঠন, অন্য শরিকের নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ। কিন্তু সব-কিছু ছাপিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের অপ্রতিহত পরাক্রম, পুলিশে-ফৌজে পাঞ্জাব একাকার ক'রে দেওয়া হয়েছে, একটির-পর-একটি সন্ত্রাসবিরোধী আইন চালু করা হয়েছে, ফৌজে-পুলিশে মিলে প্রতি-সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়েছে, রাজ্য সরকার, হয়তো তার জনসমর্থন ক্ষীয়মান ব'লেই, তেমন-কিছু সফলতা দেখাতে সক্ষম হয়নি। ইতিমধ্যে কিন্তু স্বর্ণমন্দিরে উগ্রপন্থীরা ফের মোতায়েন হয়েছে, অস্ত্রের পাহাড় জমিয়েছে সেখানে, গ্রামে-গঞ্জে-সড়কে-শহরে হত্যালীলা চলেছে, পুলিশ-ফৌজ চূড়ান্ত ব্যর্থ, অন্য-কোনো রাজনৈতিক দলের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায় নি, একমাত্র সংকল্পে-অটল অকুতোভয় বামপন্থী কর্মীরা মাটি কামড়ে প'ড়ে থেকেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য, আদর্শ সম্পর্কে চেতনা ব্যাপকতর করার কর্তব্য থেকে কেউ তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি, দিনের পর দিন ধ'রে তাঁদের মধ্যে অনেকে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন।

দিল্লির সরকার সন্ত্রাসের জবাবে প্রতি-সন্ত্রাসের আয়োজন করেছেন, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের ধারকাছ দিয়েও যান নি, ফৌজে-পুলিশে পাঞ্জাব ছেয়ে ফেলেছেন, পাঞ্জাবরাজ্যবাসীদের ন্যূনতম নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন, জরুরি অবস্থার যা-যা প্রকরণ, সরকারি উদ্যোগে তাদের সব-ক'টিই এখন পাঞ্জাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, বিনা-বিচারে আটক থেকে শুরু ক'রে বিনা প্ররোচনায়

সাধারণ গৃহস্থকে গুলি ক'রে মারা পর্যন্ত। কিন্তু অবস্থার হেরফের হয়নি, বরঞ্চ অশান্তি আরো ছড়িয়েছে, কারো মনেই যেন আর আশা নেই যে, অচির ভবিষ্যতে কোনো মীমাংসায় পৌঁছুনো যাবে। ইতিমধ্যে বারনালার-নেতৃত্বে-গঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার উপর নতুন দিল্লির আস্থা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়েছে ব'লেই হোক, কিংবা প্রধান মন্ত্রীর দলের কাছে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ব'লেই হোক, সেই মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হয়েছে, রাজ্যপাল ও পুলিশ কর্তার মধ্যবর্তিতায় কেন্দ্রীয় সরকার এখন পাঞ্জাবের প্রশাসনে সাক্ষাৎ হাল ধ'রে আছেন। মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার পরেও কিন্তু এতদিন পর্যন্ত বিধানসভাকে বাতিল করা হয়নি, কারণ প্রধান মন্ত্রীর দলভুক্তদের লোভের পরিসীমা নেই, কী জানি, যদি কিছু সদস্য ভাঙিয়ে-টাঙিয়ে কয়েকটা দিন বাদে খোদ একটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়! সীমাহীন লোভ, সেই সঙ্গে দুর্মদ আশা।

তবে যে-কোনো স্বৈরাচারী দলের যা চরিত্রলক্ষণ, নীতির বালাই নেই যেহেতু, সমস্ত বিষয়েই মতামত-আচরণ হঠাৎ-হঠাৎ পাল্‌টে যায়, নেতার মর্জি পাল্‌টে যায়, নেতার মর্জি পাল্‌টে গেলে সরকারের ক্রিয়াকর্মের রূপও তাই খোল-নল্‌চে বদলায়। স্বৈরতান্ত্রিক দল এবং অস্থিরমতি দলনায়ক, এই রসায়নের ভুক্তভোগী হ'তে হয় গোটা দেশকে। প্রধান মন্ত্রীর চিত্তের ডাল-পালা সহসা উতলা হয়েছে, গত কয়েক দিন ধ'রে, প্রায় রোজই পাঞ্জাব নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে। এক বছর-দু'বছর আগে যে-আকালিরা ছিল কাছের মানুষ, এখন তারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। সন্ত্রাসবাদীদের বাছা-বাছা চাঁইদের এতদিন বিনা বিচারে জেলে পুরে রাখা হয়েছিল, সেই সঙ্গে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল বহু নিরীহ সাধারণ নাগরিককে, এঁদের মধ্যে এখন অনেককে কিস্তিতে-কিস্তিতে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে, খোদ ভিন্দ্রানওয়ালের ভ্রাতুষ্পুত্র পর্যন্ত মুক্ত। মুক্তির সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে শিখ সম্প্রদায়ের সর্বাধিনায়ক হিশেবে বরণ ক'রে নেওয়া হয়েছে। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে নতুন উৎসাহে উগ্রপন্থী দাবির অহোরাত্র বিঘোষণা চলছে। তারই পাশাপাশি কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাব বিধান সভা তড়িঘড়ি ভেঙে দিয়েছেন, কারণ তা না হ'লে অত্যাসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে পাঞ্জাব থেকে বাঘা-বাঘা সন্ত্রাসবাদীরা প্রতিনিধি হয়ে সংসদে আসতেন, সেটা দিল্লির কর্তাব্যক্তিদের অহমিকায় বাধতো।

এই কর্তাব্যক্তিরা পাঞ্জাব নিয়ে এখন কী করবেন তা বোঝা দুষ্কর। যেটুকু আগে থেকে বলা চলে, জাতির সর্বোত্তম স্বার্থ কীভাবে সাধিত হ'তে পারে তা

নিয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবেন না, নিজেদের দলগত বা গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্য-পূরণ তাঁদের বিচারে অগ্রাধিকার পাবে। পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছিল, আগুন জ্ব'লে চলেছে, স্ত্রী-পুরুষ-শিশু প্রতিদিন খুন হচ্ছেন, ফৌজ-পুলিশ দিশেহারা, সাধারণ গৃহস্থ ভয়চকিত, নিছক প্রতি-অত্যাচার ক'রে বিপথগামীদের নিরস্ত করা সম্ভব নয়, প্রশাসনের যাঁরা হাল ধ'রে আছেন তাঁরা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না, পাঞ্জাবে আন্দোলনকারীদের কিছু-কিছু অতি-ন্যায্য রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক দাবি যদি প্রথম অবস্থায় মেনে নেওয়া হতো তা হ'লে পরিস্থিতি এতটা ঘোরালো কখনোই হয়ে উঠতে পারতো না, এখনো সে-সব দাবিদাওয়াগুলি অবিলম্বে মেনে নিলে হয়তো চরম সর্বনাশের হাত থেকে পাঞ্জাবকে বাঁচানো যায়, বামপন্থী কর্মীরা সেই উদ্দেশ্যে হতোদ্যম না হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, আত্মোৎসর্গ করছেন, কিন্তু স্বৈর-তান্ত্রিক সরকার কী ভাবছেন—কী মতলব আঁটছেন তা এই মুহূর্তে কিছুই বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে যেমন, যাদের সঙ্গে বছরের-পর-বছর ধ'রে গভীর সখ্যতা ছিল তাদের ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কলম্বোস্থ সরকারের সঙ্গে হঠাৎ গত বছর চুক্তি সই করা হলো, পাঞ্জাবেও হয়তো সেরকম যে-সন্ত্রাসবাদীদের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল, তাঁদের মহানায়ক বানিয়ে দেওয়া হবে ; প্রধান মন্ত্রী একদা ভিন্দ্রানওয়ালের বন্দনাগান করেছিলেন, এখন, বলা যায় না, হয়তো ভিন্দ্রানওয়ালের ভ্রাতুষ্পুত্রের পাদোদক মাথা পেতে গ্রহণ করবেন। স্বৈরাচারের মস্ত সুবিধা, স্মৃতি বা বিবেকের বোঝা বহন করতে হয় না, কার্য-কারণের যুক্তিসূত্র খুঁজে না পেলেও স্বৈরবৃত্তি তো দমিত হবার নয়।

তথাকথিত উগ্রপন্থীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো গোপন বোঝাপড়া ইতিমধ্যে হয়েছে কিনা বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। এমন হ'তে পারে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে ভরাডুবির পর প্রধান মন্ত্রী ব্যক্তিগত স্বার্থে, নিজের ইজ্জত ঈষৎ পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে পাঞ্জাবে কিছু সফলতা প্রদর্শন করতে উদ্‌গ্রীব, এবং সেই উদ্দেশ্যে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলাতেও তিনি পিছুপা হবেন না এখন। প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের সমার্থক নয়, যারা স্বভাববিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি না দিয়ে পাঞ্জাবে তাদের সঙ্গে কী বোঝাপড়ায় প্রধান মন্ত্রী পৌঁছুতে পারেন তা ভেবে নির্ণয় করা সত্যিই মুশকিল। অন্য পক্ষে এই প্রধান মন্ত্রীই মিজোরামে একদা-রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে মিতালি স্থাপন করেছেন, তাঁর দল ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যদি-হয়-সুজন-তেঁতুলপাতায়-ন'জন-গোছের ভাব জমিয়ে সরকার গঠন করেছে, তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্পষ্ট ক'রে বলছেন

না দার্জিলিঙে গোলমালসৃষ্টিকারীদের তিনি সংযত হ'তে বলছেন না, আরো বেশি গণ্ডগোল পাকাবার জন্য উৎসাহ দান করছেন। এটা বলতে গেলে সম্ভবত কর্কশ শোনায়, কিন্তু যাঁরা স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী, দেশ রইলো কি গেল তা তাঁদের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের কতটা ঘায়েল করা গেল সব অবস্থাতেই তা-ই তাঁদের প্রধান চিন্তা। সুতরাং এমনও হ'তে পারে, সমগ্র দেশে যখন শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংহত রূপ পাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের পদ-ত্যাগের দাবিতে দেশের প্রতিটি প্রান্তে কোটি-কোটি মানুষ সরব-সোচ্চার, ভীষণ-ভাবে কোণঠাসা প্রধান মন্ত্রী হয়তো পাঞ্জাবে নতুন-একটি চমক প্রদর্শন করতে দৃঢ়কল্প, সন্ত্রাসবাদীদের অনেক অন্যায় দাবিও যদি সেজন্য মেনে নেওয়া দরকার হয়ে পড়ে, তিনি হয়তো তাতেও রাজি, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা পেল কি পেল না তা তাঁর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

কিন্তু, এরই পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকার আকারে-ইঙ্গিতে, এবং কিছুটা প্রকাশ্যেও, অন্য কথাও বলছেন, সংবিধান সংশোধনের কথা, সংবিধান সংশোধন ক'রে জরুরি অবস্থাসংক্রান্ত নিধানগুলি নাকি পাল্‌টে না নিলেই নয়। পাঞ্জাবে কেন্দ্রীয় সরকার গত কয়েক বছর যেভাবে প্রশাসন চালিয়েছেন তা জরুরি অবস্থারও বাড়া, একে ধরেছেন-তাকে মেরেছেন, নিবর্তক আইনে বহু হাজার মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী ক'রে রেখেছেন, পুলিশে-ফৌজে গোটা রাজ্য ছয়লাপ, গোটা রাজ্যে সাধারণ জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে এসেছে। ঘোষণা না ক'রেও যা-যা করেছেন জরুরি অবস্থা ঘোষণা ক'রেও তার বেশি তেমন-কিছু করতে পারবেন ব'লে আদৌ বিশ্বাস হয় না। তা হ'লেও যদি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা প্রশাসনের স্বার্থে দরকার ব'লে বিবেচিত হয়, সংবিধানে ইতিমধ্যেই তো সেই ব্যবস্থা আছে, সরকার প্রয়োজন মনে হ'লে দেশের যে-কোনো অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। সংবিধান সংশোধনের প্রসঙ্গ তা হ'লে কোথা থেকে আসছে? এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট জবাব সরকার পক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমে তাঁরা বললেন, সংবিধানের বর্তমান নিধান অনুসারে এক বছরের বেশি কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু পাঞ্জাবে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা ঠিক এই মুহূর্তে অবাস্তব প্রস্তাব, অতএব সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার পরিবর্তন চাই। পরমুহূর্তে আবার অন্য কথা বলছেন, বহিরাক্রমণের ঘটনা ছাড়া, দেশের অভ্যন্তরে যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়, একমাত্র তা হ'লেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা সংবিধানের বর্তমান ধারা-অনুযায়ী বৈধ, কিন্তু পাঞ্জাবে যা ঘটছে তা ঠিক সশস্ত্র

বিদ্রোহ নয়, সুতরাং সংবিধান না সংশোধন ক'রে উপায় নেই, অন্যথা পাঞ্জাবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা সম্ভব হবে না, এবং তা হ'লে সর্বনাশ, যেন সর্বনাশের সত্যিই বাকি আছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো যুক্তিই বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়। রাষ্ট্রপতির শাসনে পাঞ্জাবে অবস্থার উন্নতি তো হয়ইনি, বরঞ্চ বহুগুণ অবনতি ঘটেছে, মন্ত্রিসভাকে সরিয়ে দেওয়ার মতো ঘোরতর অগণতান্ত্রিক কাজের কোনো জবাবদিহিই এমনকি অংশতও সন্তোষজনক নয়, নতুন ক'রে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ এতদিন ছিল, কারণ রাজ্য বিধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল না, কিন্তু নতুন দিল্লির কর্তারা দু'দিন আগে তড়িঘড়ি ক'রে বিধান সভাও ভেঙে দিলেন। সন্দেহ হয়, যেন ইচ্ছা ক'রেই দিলেন, এক সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সাধন করা হলো। প্রথমত, তাঁদের পছন্দের মানুষ নন এমনতরোদের মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হলো। সংবিধান কেন সংশোধন না করলেই নয় তার একটা অজুহাত তৈরি করা গেল সেই সঙ্গে।

সরকারের বিকল্প যুক্তিও সমান উদ্ভট। সংবিধানে সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা বলা আছে, গোলমাল-বিশৃঙ্খলার কথা নেই, পাঞ্জাবের গোলমাল-বিশৃঙ্খলা সশস্ত্র বিদ্রোহের পর্যায়ে পৌঁছেছে তা এখনো বলা যাবে না, সুতরাং সংবিধানের বর্তমান পাঠ অনুসরণ করলে পাঞ্জাবে জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে না, এ সমস্তই তো কথার উপর শুধুই কথা। যা একটু আগে বলা হয়েছে, জরুরি অবস্থা ঘোষণা ক'রে পাঞ্জাবে সরকার শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন আর কী বিধিব্যবস্থা নিতে পারেন যা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়নি তা স্পষ্ট ক'রে বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে না কারণ বলার মতো কিছু নেই। এই সরকার তো আইনের তোয়াক্কা করেন না, ইচ্ছামতো যেখানে যা খুশি তা ক'রেই যাচ্ছেন, আইন মানা হলো কি হলো না, সহবৎ মানা হলো কি হলো না, তা নিয়ে তো কোনো মাথাব্যথা দেখা যায়নি, যেমন যায়নি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া, পাঞ্জাবের ঘটনাবলীকে সশস্ত্র বিদ্রোহ বলতে অসুবিধা কোথায়? যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করছেন, তাঁরা অস্ত্র হাতে নিয়েই তো করছেন।

সন্দেহ না হয়েই পারে না, পাঞ্জাব উপলক্ষ্য মাত্র, শাসকদল সংবিধান সংশোধন ক'রে জরুরী অবস্থার বিধানাদি পাকাপোক্ত করতে চান অন্য কারণে। যদিও বলা হচ্ছে যে-সংশোধনটুকু করা হবে তা একমাত্র পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে না, কিন্তু এ ধরনের প্রতিশ্রুতির তো কোনো মূল্য নেই। স্বৈরতান্ত্রিক দলের পক্ষে সব-কিছুই সম্ভব। পাঞ্জাবের নাম

ক'রে জরুরি অবস্থার তূণ শাণিততর ক'রে নেওয়া হলো, অথচ পাঞ্জাবে তা প্রয়োগ করা না করা সমান, কারণ ঐ রাজ্যে, পুনরুচ্চারণ করছি, জরুরি অবস্থার ইতিমধ্যেই অনেক বাড়া। শাসকদলের আসল লক্ষ্য হয়তো সারা দেশের জাগ্রত জনতার সংঘবদ্ধ আন্দোলন, যে-আন্দোলন থেকে প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করা হচ্ছে, লোকসভার পুনর্নির্বাচনের দাবি করা হচ্ছে, সরকারের প্রচ্ছায়ায় থেকে যে-দুর্নীতিগ্রস্তরা উৎকোচ গ্রহণ ক'রে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে-দেশের টাকা বিদেশে পাচার করছে, তাদের শাস্তিবিধানের দাবিও উচ্চারিত হচ্ছে সেই সঙ্গে, সারা দেশে ধর্মঘট, সারা দেশে আন্দোলন, যা-কিনা শাসকদল ব্যাখ্যা দেবেন আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা। তারপর হঠাৎ এক দিন রাতের অন্ধকারে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির স্মৃতিলাঞ্ছিত পথনির্দেশ অনুসরণ ক'রে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যে-সংশোধনী পাঞ্জাবের সীমিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা দেশের অন্য সমগ্র অঞ্চলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন, কারণ দেশের সর্বত্রই তো বিশৃঙ্খলা, এবং সংবিধানের চতুর্দশ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী আইনের চোখে সব রাজ্যের মানুষই সমান, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য পাঞ্জাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা গেলে অন্যত্রও তা ঘোষণা না-করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

মানুষ তো ঠেকে শেখে, দেখে শেখে। শাসকদলের বিড়ালতপস্বী ভাবে মজলে পরে নিজেদেরই দুয়ো দেবো আমরা। পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মিতালি করছেন যাঁরা, তাঁদের ঐ রাজ্যের জন্য জরুরি অবস্থা প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই আর। তাঁদের দৃষ্টি অন্যত্র, গোটা ভারতবর্ষের জনসাধারণকে কী ক'রে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যায়, সেই দিকে। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কাছে তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ, আগে চিন্তা ক'রে পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর চিন্তা ক'রে লাভ নেই, শাসকদলের ফাঁদে পা দেবেন না, খাল কেটে কুমির ডাকবেন না।

## সংকট, টোটকা, বৃন্দা করাতের হাতে লাঠির বাড়ি

যারা জেগে থেকে ঘুমোয়, তাদের জাগানো যায় না। আর যারা জেনে-শুনে বুজরুকি করে, সেই বুজরুকি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও তাদের ভ্রূক্ষেপ হয় না। তারা মিথ্যার পাহাড় রচনা ক'রে চলে। তাদের হাতে প্রচারযন্ত্র, তাদের হাতে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা, পয়সাকড়ি, ফৌজ-বরকন্দাজ, তারা ধ'রে নেয় কার ঘাড়ে ক'টা মাথা তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হবে। একটু-আধটু হয়তো বাড়িতে ব'সে গালমন্দ পাড়বে লোকজনেরা, কিন্তু ক্ষমতা থেকে তো তাদের খসাতে পারবে না। অতএব বুজরুকি অব্যাহত রাখতে বাধা কোথায়।

ঢাক-ঢোল বাজিয়ে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল গত সপ্তাহে। প্রধান মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিপরিষদ পরিবৃত্ত হয়ে বসলেন, মুখ্য মন্ত্রীদের নানা অমৃতবচন শোনালেন, এবং সেই সঙ্গে সাধারণ দেশবাসীকেও শোনালেন। দেশের মানুষ সরল বোকাসোকা, ধ'রেই নেওয়া হয়েছে যা-ই বোঝানো যায় তা-ই তারা বুঝবে। গত চল্লিশ বছরের হিশেব আমরা জানি, দেশে খাদ্যশস্যের সামগ্রিক উৎপাদন যে বাড়েনি তা নয়, বেড়েছে, কিন্তু অত্যন্ত ঢিমেতালে, শতকরা ২'৫ বাৎসরিক হারে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সামান্য-একটু বেশি। অবশ্য শস্যোৎপাদন যেহেতু এখনো আমাদের দেশে অনেকটাই বৃষ্টির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল, কোনো-কোনো বছর ফসলবৃদ্ধির হার এই গড় হার ছাপিয়ে গেছে, অন্য পক্ষে খরার বছরগুলিতে উৎপাদন বাড়েইনি, বরং অনেকটাই ক'মে এসেছে, যেমন এ-বছর ঘটেছে। তা হ'লেও, কেন্দ্রীয় সরকারের নানা ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও, যোজনা কমিশনের ছয়-সাতটি পাঁচসালা পরিকল্পনা সত্ত্বেও, খাদ্যশস্যের ফলন এই চার দশক ধ'রে বাৎসরিক ২'৫ শতাংশ গড় হার অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ গত সপ্তাহে প্রধান মন্ত্রী সবিক্রমে ঘোষণা করলেন, আর ভাবনার কিছু নেই, তাঁরা নতুন ছক কেটে ফেলেছেন, অতি সুচারু পরিকল্পনা প্রস্তুত, এ-বছর খাদ্যশস্যের উৎপাদন মাত্র তেরো কোটি টন তাতে কী, আগামী বছর তা বাড়িয়ে সতেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টনে তুলে দেবেন, অর্থাৎ খাদ্যশস্যের ফলন বাড়বে শতকরা ৩৫ ভাগ। তাঁদের জাদুকাঠির ছোঁয়ায় মাত্র এক বছরে।

এটা কাণ্ডজ্ঞানের প্রশ্ন। গত চল্লিশ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ আট কোটি টন বেড়েছে ; ওঁরা বলেছেন, এটা আগামী এক বছরেই আরো সাড়ে চারকোটি টন বাড়িয়ে দেবেন। প্রধান মন্ত্রী এই পাটিগণিতটি বুঝেছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না, হয়তো তাঁকে বলতে বলা হয়েছে, তিনি ব'লে দিয়েছেন। কিংবা হয়তো তিনি অতটা নিরেট নন, জ্ঞানপাপী, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সাধারণ নির্বাচন ডাকতে হ'তে পারে, প্রজাকুলকে তাই আশার কথা শোনাতে হয়, কৃতকার্যতার কথা শোনাতে হয়, সরকার কত কর্মদক্ষ ইনিয়ে-বিনিয়ে সেই বাণী প্রচার করতে হয়। দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ চরম দারিদ্র্যের জ্বালায় ধুঁকছে, আধপেটা খাচ্ছে অথবা অভুক্ত থাকছে, এ-বছর ভয়াবহ খাদ্যাভাব, মার্কিন দেশের কাছে ফের হাত পাতা শুরু হয়েছে, কিন্তু মুখেনং মারিতং জগৎ, প্রধান মন্ত্রী স-পারিষদ চাষাবাদ করতে নেমে সাড়ে চার কোটি টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের ফলন ফলিয়ে দেবেন।

এই ভোজবাজি কী ক'রে সম্ভব হবে ? কেন্দ্রীয় সরকার এমন কী নতুন ব্যবস্থা নিয়েছেন যার ফলে শস্যোৎপাদন এমন চমৎকার বাড়বে ? সারা দেশ জুড়ে রাতা-রাতি ভূমিসংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছেন ? কৃষিব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে লক্ষ-লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে বাড়তি উৎপাদনের নিখুঁত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ? দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মতো, ভারতবর্ষের অন্য সর্বত্র সেচব্যবস্থা ঢেলে সাজাচ্ছেন ? অতীতের বছরগুলির তুলনায় আরো অনেক বেশি টাকা সেচ-কৃষি-গ্রামোন্নয়ন-বন্যা প্রতিরোধের জন্য ব্যয় করছেন ? এর কোনো-কিছুই নয়। কেন্দ্রের কর্তাব্যক্তিরা কদাচ ভুলেও ভূমিসংস্কারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন না, এখনো করেননি। পূর্ব বা দক্ষিণ-ভারতে সেচ সম্প্রসারণের জন্য উল্লেখযোগ্য নতুন-কোনো বিনিয়োগের প্রস্তাব নেই। এ-বছর বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচব্যবস্থা, গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি খাতে সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৩,০৭৫ কোটি টাকা। সেই বরাদ্দ প্রকৃতপক্ষে একটু ক'মে গিয়ে আগামী বছরে দাঁড়াচ্ছে ৩,০৫৭ কোটি টাকায়। অথচ সরকার বলছেন সাড়ে চার কোটি টন খাদ্যশস্যের ফসল বাড়িয়ে দেবেন। বুকের ছাতির জোরেই যেন জাদু ঘটিয়ে দেবেন।

কেন্দ্রের কর্তারা জেনে-শুনে দেশের মানুষদের সঙ্গে তঞ্চকতা করছেন। যখন এক বছর বাদে ফসলের পরিমাণের হিশেব কষা হবে, তখন তাঁরা আরেক দফা প্রকৃতির দোহাই দেবেন, তাঁদের কোনো কসুর নেই, তাঁরা তো ফসল বাড়াতেই চেয়েছিলেন, কৃপণ বিধাতাপুরুষ বাদ সাধলেন। মানুষ যে তাঁদের কথা ঠিক বিশ্বাস করবে না তা-ও তাঁরা জানেন, কিন্তু তাঁরা ভ্রূক্ষেপহীন।

এই ভ্রূক্ষেপহীনতা আসলে দেশবাসীদের প্রতি অপার শ্রদ্ধাহীনতার নিদর্শন মাত্র। কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবার সময় অর্থমন্ত্রী অম্লানবদনে হিশেব দিলেন, কই, তেমন-কিছু তো মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি, গত বছরে মাত্র ৯·৮ শতাংশ। অথচ তিনি যে-হিশেবটা দিলেন তা দশ মাসে দাম বাড়ার হিশেব, বাৎসরিক গড় কষলে যা প্রায় ১২ শতাংশে দাঁড়ায়। এবং এই হিশেবও, পাইকারি বাজারে মূল্যবৃদ্ধির। মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থ কিংবা কারখানার শ্রমিক অথবা গ্রামের কৃষক যে-যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশপত্র কিনতে বাধ্য হন, এবং যে-দামে কিনতে বাধ্য হন, সেই হিশেব আলাদা ক'রে কষলে দেখা যাবে গত এক বছরে মূল্যবৃদ্ধির হার শত-করা কুড়ি ভাগ ছাড়িয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নিজেও তা জানেন, কিন্তু তাঁদের কাছে এই সমস্ত-কিছুই খেলাবিশেষ, সাধারণ মানুষকে কত বিভিন্ন কায়দায় ঠকানো যায় তার নেশায় তাঁরা মেতে আছেন।

তাঁদের বাজেটে বিরাট ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, গত কয়েক বছর ধ'রে তাঁরা আট-দশ হাজার কোটি টাকার নোট ছাপিয়ে ঘাটতি মেটাচ্ছেন, এই বিশাল পরিমাণ নোট বাজারে ছড়িয়ে পড়ার ফলে দাম ভয়ংকর না বেড়ে উপায় নেই। নোট ছাপানো হ'লে জিনিশপত্রের দাম চড়বেই, অথচ নোট না ছাপালে বড়ো-লোকদের উপর ট্যাক্সো চাপাতে হয়। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থ, বড়োলোকদের উপর ট্যাক্সো চাপানো কেন্দ্রীয় সরকারের ধর্মীয় অনুশাসনে বাধবে, অতএব নোট ছাপাতেই হবে, সবার উপরে নোট-ছাপানো ভালো, তার উপরে নেই। বুজরুকি, পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানে নোট ছাপালে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু, দিল্লির কর্তাব্যক্তিরা বলবেন, ভারতবর্ষ ব্যতিক্রম, নোট ছাপালে ভারতবর্ষে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে না, কারণ তাঁরা যে এখানে শাসনের দায়িত্বে আছেন। যা ঘটে তা সত্য নয়, তাঁরা যা বলেন, তা-ই সত্য ; তাঁরা বলেন, জল উঁচু, অতএব জল উঁচু ; তাঁরা বলেন, জল নিচু, অতএব জল নিচু। তাঁরা যেহেতু বলছেন, আমাদের মেনে নিতে হবে, দেশে জিনিশপত্রের দাম আদৌ বাড়ছে না, এই যে মূল্যবৃদ্ধির ফলে আমাদের নাভিশ্বাস উঠছে তা নিছক বিভ্রম।

অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্রের লক্ষণগুলি একটু-একটু ক'রে ফের স্পষ্ট হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের রেল ধর্মঘটের সময় কৌতূহলী শ্রোতারা আকাশবাণী ভবনের সামনে জড়ো হতেন দেখতে আকাশবাণী, স্রেফ কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর ক'রে, কেমন ট্রেন চালাচ্ছে। সে-সমস্ত দিন মনে হয় পুনরাগত, এবং আরো অনেক বেশি বীভৎস রূপ নিয়ে। এখন আর ঢাকাঢুকির ব্যাপার নেই, দূরদর্শন-আকাশবাণী দু'টি

সংস্থাকেই প্রত্যক্ষ শাসকদলের প্রচারে বেপরোয়া ব্যবহার করা হবে, যেমন করা হয়েছে ভারত বন্ধ্‌, বানচালের প্রয়াসে, এবং গলা ফুলিয়ে প্রচার হবে দেশের স্বার্থে এটা প্রয়োজন, কারণ যারা বন্ধ্‌ ডেকেছে তারা তো রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশদ্রোহী। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা চলে, ছায়া পূর্বগামিনী। পাঞ্জাবের ছুতো ক'রে যে-সংবিধান সংশোধনী সংসদে পড়ি-কি-মরি ক'রে মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তার ফলে এখন দক্ষিণ দুয়ার উন্মুক্ততর হবে। সারা দেশে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হবে, অন্যান্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা খর্ব হবে। চাই কি, ইন্দিরা গান্ধি যেমন করে-ছিলেন, নির্বাচন স্থগিত রেখে সংসদের মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য হয়তো-বা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। লিখিত-পড়িত ভাবে জরুরি অবস্থা জারি করা হবে এক-মাত্র পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে, কিন্তু সারা দেশ জুড়ে অনাচারের বন্যা নামবে।

আমরা আশঙ্কার ঋতুতে আবার উত্তীর্ণ। শাসকদলের মাঝারি নেতারা নিজেরাই পোষ-না-মানা রাজ্য সরকারগুলিকে উৎখাত করার জন্য সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের কথা উচ্চারণ করছেন, ত্রিপুরার কায়দায় অন্যত্রও ফৌজ নামাবার স্বপ্নে লোলুপ হচ্ছেন। তাঁদের দল যে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে স্বৈরতান্ত্রিক, তার প্রমাণ দিনের পর দিন হাওয়াতে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সংকট যত বাড়বে এই প্রবণতাও তত বাড়বে। কারণ শাসকদল গভীর আবর্তের মধ্যে ক্রমশ আরো বেশি ক'রে ডুবছেন। লম্বা-চওড়া যতই বক্তৃতা দেওয়া হোক, কৃষিউৎপাদন গত পাঁচ বছর ধ'রে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমূল ভূমিসংস্কার ছাড়া ফসল বাড়ানো আর সম্ভব নয়, কিন্তু সংগোপনেও এই কথা কবুলতি করতে রাজি নন কর্তাব্যক্তিরা, তাই শেষ পর্যন্ত টোটকার অবলম্বন নিতে হয় তাঁদের। কাঠামোগত পরিবর্তন না ঘটলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দেশে বাড়তে পারবে না। এখানেও টোটকার আশ্রয় : ব্যাপক আভ্যন্তরীণ বাজারে কাজ কী, উপরতলার বিত্তবানরা আছেন, তাঁরা কেনাকাটা করবেন, আর বিদেশে ঢালাও জিনিশ রপ্তানি হবে, তা হ'লে ভারতবর্ষে শিল্পবিপ্লব আর ঠেকায় কে। অথচ কৃতকর্মের স্ববিরোধিতায় ধরা প'ড়ে যেতে হয়, প্রতি বছর দশ হাজার কোটি টাকা পরিমাণ নোট ছাপালে মুদ্রাস্ফীতি হয়, মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, শিল্পোৎপাদনের গড় ব্যয় বৃদ্ধি পায়, বিদেশে রপ্তানি দুরূহ হয়ে পড়ে, টাকার মূল্যমান কমিয়ে এনেও কোনো লাভ হয় না, কারণ নোট-ছাপানোতে তো আর বিরতি নেই। তা ছাড়া, দেশের বড়োলোকরা আর কত শৌখিন জামাকাপড় ও রঙিন টেলিভিশন কিনবে, চাহিদা তাই কিছুতেই ঊর্ধ্বগতি হ'তে চায় না, চাহিদা না বাড়লে কোন্‌ শিল্পপতি উৎপাদন বাড়াবার কথা ভাববেন? এই

অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারকে গোঁজামিলের শরণাপন্ন হ'তে হয়, আমলাদের দিয়ে বলাতে হয় শিল্পোৎপাদনের হিশেবের পদ্ধতিতে ভুল, আমরা নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে পুরোনো হিশেবগুলি পাল্‌টে দিচ্ছি, এবার থেকে প্রমাণ করা যাবে কলে-কারখানায় উৎপাদনের হার কমছে না, বাড়ছে।

সরকার হিশেবের কারচুপিতে আত্মপ্রসাদ খোঁজেন, কিন্তু সংকট তো তাতে অন্তর্হিত হবার নয়, দেশের অধিকাংশ মানুষ অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকবে, গ্রামে-শহরে কোটি-কোটি বেকার, মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপে ক্রমবর্ধমান সর্বব্যাপী অসন্তোষ। ইতিহাসের নিয়মগুলি এই অবস্থায় প্রকট হ'তে শুরু করে। শাসকদলের ফৌজ-পুলিশভক্তি হঠাৎ বেড়ে যায়, বিবিধ দমনমূলক আইন চালু হয়, ভিন্দ্রানওয়ালে-ঘিসিঙ গোছের ভুঁইফোঁড় অবতারদের সরকারের তরফ থেকে মদত দেওয়া শুরু এই আশায় যে, হয়, যদি এদের দিয়ে তিতিবিরক্ত জনগণের সংঘবদ্ধ প্রতিজ্ঞাকে একটু এলোমেলো ক'রে দেওয়া সম্ভব হয়; পাশাপাশি একই কারণে সমাজ-বিরোধীদের পরাক্রম বাড়ে, তাদের মধ্যে অনেককেই সরকারের তরফ থেকে মাসোহারা-দানের ব্যবস্থা করা হয়, এই আশায় যদি স্রেফ মারপিট ক'রে গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়া যায়।

যা-যা ঘটছে, আমাদের ঘিরে ঘটছে, ইতিহাসের নির্দেশিকা মেনেই ঘটছে। ভারত বন্‌ধের দিন রাজধানীতে ডাণ্ডা মেরে মহিলা কমরেডের হাত গুঁড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ, কিন্তু এমনটা না হ'লেই অবাক হ'তে হতো। একটি-দু'টি রাজ্য সরকার জনগণের দখলে, কিন্তু সমাজবিন্যাস তো তাতে অন্যরকম হয়ে যায়নি সংকট যত গভীরতর হবে, শাসকশ্রেণীর আচারে-আচরণে বিচারে-ব্যবহারে তত বেশি কদর্যতা প্রকটতর হবে। এরই মধ্যে যাঁরা বালিশে মাথা রেখে ঘুমোতে চান, সেই সব শয্যাবিলাসীরা হেনস্থা এড়াতে পারবেন না।

## তাতে কী তাতে কী কাহিনী

তাতে কী, তাতে কী। যখন যেমন তখন তেমন। নীতিহীনতাই নীতি। কারণ তা না হ'লে দলীয় স্বার্থ-গোষ্ঠীস্বার্থ-শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা যায় না।

মেঘালয়ে মাত্র ছ'মাস আগেকার ঘটনাবলী। নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস দল কুপোকাৎ। বিধান সভার সদস্যসংখ্যা একুনে ষাট, কংগ্রেস দল তার মধ্যে মাত্র একুশটি আসনে জয়ী হ'তে পেরেছে। অন্য দিকে হিল পিপল্‌স্ ডিম্যাণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশন কাউন্সিল নামক দলটি পেয়েছে উনিশটা আসন, এই দলের সহযোগী হিল পিপল্‌স্ ইউনিয়ন পাঁচটি, এবং তাদের সঙ্গে রয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিশেবে নির্বাচিত আরো আট-ন'জন। এঁরা সবাই মিলে একটি সম্মিলিত মোর্চা গঠন করলেন, বিধান সভায় সামগ্রিক সদস্যসংখ্যা ষাট, মোর্চার সদস্যসংখ্যা তেত্রিশ, রাজ্যপালের কাছে মোর্চার নেতা গিয়ে দাবি জানালেন মেঘালয়ে তাঁদের এবার মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেওয়া হোক, কারণ বিধান সভায় তাঁদের সুস্পষ্ট সংখ্যাধিক্য আছে। কিন্তু রাজ্যপাল বহুদিনের-পোড়-খাওয়া কংগ্রেসী, ইন্দিরা গান্ধির জমানায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, তিনি হিল পিপল্‌স্ ডিম্যাণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশন কাউন্সিলের নেতৃত্বে গঠিত মোর্চার দিকে ফিরেও তাকালেন না। তড়িঘড়ি রাতের অন্ধকারে তিনি ইন্দিরা কংগ্রেস দলের নেতাকে ডেকে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথবাক্য পাঠ করিয়ে নিয়ে গদিতে বসিয়ে দিলেন। বিধান সভায় তো ইন্দিরা কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, কিন্তু তাতে কী, তাতে কী। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীকে আট-দশ-বারো দিন সময় দেওয়া হলো। তিনি হিল পিপল্‌স্ ডিম্যাণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশন কমিটি থেকে মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে কয়েকজনকে ভাঙিয়ে নিয়ে এলেন, ভাঙিয়ে নিয়ে এলেন আরো গুটিকয় স্বতন্ত্র হিশেবে নির্বাচিত সদস্যকে, মেঘালয়ের মানুষেরা নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করলে কী হবে, শেষ পর্যন্ত রাজ্যপালের ভানুমতীর খেলেরই জয়জয়াকার, ইন্দিরা কংগ্রেস দল ফের মেঘালয়ের প্রশাসনে সমাসীন।

একটা মুশকিল যদিও ছিল। ১৯৮৫ সালে যে-দলত্যাগবিরোধী আইন পাশ করা হয়েছিল, তাতে নির্দেশ আছে সংসদে বা বিধান সভায় কোনো দলের মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম সদস্য যদি কখনো দলত্যাগ করেন, তাঁদের

দল-পাল্টানো গ্রাহ্য হবে না, এবং তাঁদের সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে। ছিল পিপল্‌স্ ডিম্যাণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশন কাউন্সিলের বিধানসভায় মোট সদস্যসংখ্যা ছিল উনিশ, যাঁরা দলত্যাগ ক'রে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে ভিড়লেন তাঁদের সংখ্যা ছয়, যেহেতু গণিতের হিশেবে ছয় উনিশের এক-তৃতীয়াংশের কম, এই ছ'জনের দলত্যাগ তো আইনত গ্রাহ্য নয়, তাঁদের সদস্যপদ তো খারিজ হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তাতে কী, তাতে কী। মহামহোদয় রাজ্যপাল, ইন্দিরা কংগ্রেসী, নীতিনিয়ম মানলে কি ঐ দলের সেবাদাস হওয়া যায়, আইন যা বলে বলুক, সবার উপরে দলীয় স্বার্থ তার উপরে নেই, সুতরাং ঐ ছ'জনের দলত্যাগ অতীব বৈধ ব'লে রাজ্যপাল বিবেচনা করলেন, আমাদের কথাটি আপাতত ফুরোলো, মেঘালয়ের মানুষদের ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার নটে গাছটি আপাতত মুড়োলো।

এবার মেঘালয় পেরিয়ে নাগাল্যাণ্ড, কাছাকাছি রাজ্য। নাগাল্যাণ্ডে, গত বছর নভেম্বর মাসের নির্বাচনের পর, ইন্দিরা কংগ্রেস মন্ত্রিসভা, অধিষ্ঠিত, বিধান সভার মোট সদস্যসংখ্যা এখানেও ষাট, যার মধ্যে কংগ্রেস দলে আছেন চৌত্রিশ জন। হঠাৎ এ মাসের গোড়ায় চঞ্চলতা দেখা দিল, কংগ্রেস দল থেকে তেরোজন সদস্য পদত্যাগ ক'রে বিরোধী পক্ষে যোগ দিলেন, প্রধান বিরোধী দল নাগাল্যাণ্ড ন্যাশানাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে তাঁরা সম্মিলিত মোর্চা গঠন করলেন, বিধান-সভায় এই মোর্চার অবিসংবাদী সংখ্যাধিক্য, কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধূল্যবলুণ্ঠিত। যে-তেরোজন কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে এলেন, বিধান সভার অধ্যক্ষ তাঁদের দলত্যাগ বৈধ ব'লে ঘোষণা করলেন, না ক'রে তাঁর উপায় ছিল না, কারণ অঙ্কের হিশেবে কংগ্রেস দলের সদস্যসংখ্যা চৌত্রিশ, যাঁরা দলত্যাগ করলেন তাঁদের সংখ্যা তেরো, তেরো চৌত্রিশের এক-তৃতীয়াংশের বেশি। কংগ্রেস-বিরোধী মোর্চা নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানালেন, কংগ্রেস মন্ত্রিসভা বিধান সভায় যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে, তাকে বরখাস্ত করা হোক, এবং অবিলম্বে সম্মিলিত বিরোধী মোর্চাকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হোক।

এবার কিন্তু অন্য ভানুমতীর খেল। নাগাল্যাণ্ড বিধান সভায় কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, তাতে কী তাতে কী। কংগ্রেস দল ছেড়ে এসেছেন যে-সব বিধানসভা সদস্য, তাঁদের সংখ্যা তেরো, তেরো চৌত্রিশের এক-তৃতীয়াংশের বেশি, সুতরাং এই দলত্যাগ বৈধ, কিন্তু তাতে কী, তাতে কী, আইনের উপরেও

কাহ্নন আছে, সেই কান্থনের নাম যখন যেমন তখন তেমন। মেঘালয়ে ছিল পিপল্‌স্ ডিম্যাণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশন কাউন্সিল থেকে বেরিয়ে এসে বিধান সভার ছ'জন সদস্য কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছিলেন, সেই দলছুটরা নমস্য, কারণ তাঁরা কংগ্রেসের স্থবিধা ক'রে দিয়েছিলেন। তবে নাগাল্যাণ্ডে যে-তেরোজন সদস্য দলছুট হলেন তাঁরা অতীব নিন্দনীয়, কারণ তাঁরা ইন্দিরা কংগ্রেস দলের অস্থবিধা ঘটালেন। দলত্যাগে কংগ্রেস দলের স্থবিধা হ'লে তা ভালো, কংগ্রেস দলের মুশকিল হ'লে তা ভীষণ খারাপ।

কান্থন ব'লে কথা। এই কান্থনের আশ্চর্য প্রয়োগ দেখালেন নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে, কংগ্রেস দল থেকে তেরো জন সদস্য বেরিয়ে এসেছেন, আইন-মোতাবেক তাঁদের দলত্যাগ বৈধ, সেই বৈধতা বিধান সভার অধ্যক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে, তাঁরা প্রধান বিরোধী দলের সঙ্গে সম্মিলিত মোর্চা গঠন করেছেন, এই মোর্চা বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি জানাচ্ছে, নাগাল্যাণ্ড তোলপাড়, অথচ রাজ্যপাল নির্বিকার। আসলে প্রথম কয়েক দিন রাজ্যপালকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল আবার মণিপুরের রাজ্যপাল—ত্রিপুরারও— ; নাগাল্যাণ্ডে অনিশ্চয়তা, রাজ্যপাল কিন্তু মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে ঘাপ্‌টি মেরে ব'সে রইলেন। ইম্ফল থেকে নাগা-ল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমায় বিমানযোগে পৌঁছুতে সময় লাগে বড়ো জোর পনেরো মিনিট, কিন্তু রাজ্যপালের সময়ের বড়ো অভাব, প্রথম চার-পাঁচদিন তিনি এলেনই না। কেন তিনি এলেন না তার কারণটি অবশ্য প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে স্পষ্ট হলো। ইম্ফল থেকে পনেরো মিনিটের পথ, রাজ্যপাল এলেন না, কিন্তু দেশের রাজধানী খোদ নতুন দিল্লি থেকে ছুটে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আরো-কিছু কেষ্ট-বিষ্টু। তাঁরা প্রথমে বিধান সভার অধ্যক্ষের উপর রাগ ঝাড়লেন, তিনি অতীব গর্দভ, কেন তিনি নতুন দিল্লির সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই ঐ তেরো জন সদস্যের দলত্যাগ বৈধ ব'লে ঘোষণা করেছেন, আইনমাফিক হ'লেই সব-কিছু মেনে নিতে হয় নাকি, দলীয় স্বার্থ ব'লে ব্যাপারটা আছে না? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও অন্যান্য কেষ্টবিষ্টুরা তেরো জন দলত্যাগীর সঙ্গে একত্র হয়ে এবং আলাদা-আলাদা ক'রে দেখা করলেন। মিষ্টি কথায় দলে ফিরে আসার জন্য কাকুতিমিনতি করলেন, সবাইকে মন্ত্রী ক'রে দেওয়ার প্রলোভন দেখালেন, অন্য নানা উপ-ঢৌকনের প্রলোভন দেখালেন, কোনো-কিছুতে কাজ হলো না ব'লে চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখালেন। কিন্তু তেরো জনের একজনকেও দলে ফিরিয়ে আনতে সফল

হলেন না। ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁরা নতুন দিল্লি ফিরে গেলেন, কেউই তাঁদের যাওয়ার বেলা পিছু ডাকলো না।

এবার রাজ্যপালের পালা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর সাধ্য-সাধনা ক'রে গেছেন, হুকুমবরদার রাজ্যপাল অতঃপর আসরে নামলেন। তিনি ইম্ফল থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। দু'দিন বাদে তাঁর ঘোষণা বেরোলো। অস্থিরতা, অস্থিরতা, নাগাল্যাণ্ডে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, এই অস্থিরতা রাজ্যের পক্ষে, দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে সর্বনাশসূচক। যাঁরা কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁরা অতিশয় নিচমনা ব্যক্তি, তাঁরা মন্ত্রিত্বের লোভে দলছুট, তাঁদের মানসিকতা নিন্দার্হ, ক্ষমার অযোগ্য, তাঁদের প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাতক হবে, তা নৈতিকতাবিরোধী হবে। তা ছাড়া, দু'দিন বাদে হয়তো এই বিধান সভায় সদস্যরা ফের মত বা দল পাল্টাবেন, তার ঝুঁকি নিতে রাজ্যপাল রাজি নন। সেই সঙ্গে রাজ্যপাল এটাও বলতে বাধ্য হচ্ছেন, দলত্যাগবিরোধী আইনে অনেক স্খলনপতন আছে, ঐরকম একটি যাচ্ছেতাই আইনের নির্দেশ-অনুযায়ী কাজ করতে তাঁর বিবেক কখনোই সায় দেবে না। অতএব বিরোধীরা নাগল্যাণ্ডে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ পাবেন না, বিধান সভা বাতিল ক'রে দেওয়া হলো, এবং নাগাল্যাণ্ডে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা করা হলো, যার মানে কিনা বকলমে ইন্দিরা কংগ্রেসী শাসন, সবকো সম্মতি দে ভগবান।

মেঘালয়ের ক্ষেত্রে এক বিধান, নাগাল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্য। যখন যেমন তখন তেমন, ইন্দিরা কংগ্রেস দলের স্বার্থরক্ষা করার খাতিরে কখনো বৈধ আইনকে কলা দেখানো, ঐ একই স্বার্থে অন্য-কখনো ঐ আইনের নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। রাজ্যপালেরা কেন্দ্রের আজ্ঞাবাহী প্রভু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নির্দেশে তাঁরা চলেন-বলেন-নৈতিকতার বুলি আওড়ান-রাতকে দিন ব'লে অভিহিত করেন, দিনকে রাত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যদি বলেন জল উঁচু, তাঁরাও বলেন জল উঁচু, তিনি যদি বলেন জল নিচু, তাঁরাও বলেন জল নিচু।

তা হ'লেও নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল, যিনি ভণ্ডামির এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রাখলেন এ মাসে, তাঁর সম্বন্ধে আলাদা ক'রে কিছু বলা প্রয়োজন। রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার আগে এই ভদ্রলোক আমাদের সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। সংগ্রামে-সংকটে যিনি জাতির সেনাবাহিনীর নায়কত্ব দেবেন, তাঁর সম্পর্কে দেশবাসীর প্রত্যক্ষ বা সংগোপন কিছু ধ্যান-ধারণা থাকে: তিনি বিচারে অবিচল হবেন, ন্যায়নিষ্ঠ হবেন, শঠতা-কপটতার কলুষ তাঁকে কখনো স্পর্শ করবে না। চোখ কচলাতে

হয়, নাগাল্যাণ্ডের এই রাজ্যপাল, এ মাসের গোড়ার দিকে যিনি মেরুদণ্ডহীনতা ও কাপট্যের চরম নিদর্শন দেখালেন তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে, এই ভদ্রলোক আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন, আমাদের সেনানীদের কাছে আদর্শস্বরূপ ছিলেন, তাঁদের প্রেরণাপুরুষ ছিলেন ? আমাদের সেনানায়কেরা তা হ'লে এই ধাতুতে গড়া, চাকরি বজায় রাখার জন্য যে-কোনো অসাধুতার আশ্রয় নিতে তাঁরা প্রস্তুত, কাপুরুষতা তাঁদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সঞ্চারিত ? ধরণী দ্বিধা হও, আমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব এ-ধরনের ন ংসক সম্প্রদায়ের হস্তে সমর্পিত ?

পাশাপাশি, সাম্প্রতিক অন্য-একটি ঘটনা নিয়েও সামান্য বিস্তৃত হ'তে হয়। পাঞ্জাব রাজ্যের পুলিশের ডিরেক্টব জেনারেল, তাঁর নাকি শৌর্যের শেষ নেই, তিনি নাকি তিন মাস আগে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে উগ্রপন্থীদের ঢিট করে দিয়েছেন। পাঞ্জাবে সদর্পে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছেন তিনি, অপরাধদমনের অভিযানে তাঁর তুলনা একমাত্র তিনিই। এ হেন বীরপুরুষটি জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে চণ্ডীগড়ে এক নৈশ ভোজসভায় এক মহাকেলেঙ্কারি বাঁধিয়ে বসলেন; মদোন্মত্ত অবস্থায় এক মহিলা আই এ এস কর্মচারীর সঙ্গে অতি অশালীন ব্যবহার করলেন, সেই মহিলার শ্লীলতাহানি ঘটালেন। মহাঘৃণ্য অপরাধ, ফৌজদারি অপরাধ। ঐ একই অপরাধে মাত্র গত সপ্তাহে দিল্লি পরিবহণের কয়েকজন ড্রাইভার-কণ্ডাক-টরকে গ্রেপ্তার তথা বরখাস্ত করা হয়েছে; তারা চলন্ত বাসে ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজের একটি ছাত্রীর সঙ্গে অসংযত ব্যবহার কবেছিল। কিন্তু একই অপরাধে পৃথক ফল, পাঞ্জাব পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ আনা হয়েছে. তার সত্যতা নিয়ে কেউই সন্দেহ প্রকাশ করেননি, পুলিসের এই বড়ো সাহেবের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করা হয়েছে, কিন্তু তিনি স্বপদে বহাল আছেন, পাঞ্জাবের মহামান্য রাজ্যপাল ঘোষণা করেছেন এই ডিরেক্টর জেনারেলকে বাদ দিয়ে উগ্রপন্থী-দমন অসম্ভব, সুতরাং তিনি মাঝে-মধ্যে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করলেও তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই; পুলিশের বড়ো সাহেবটি ফৌজদারি অপরাধে অপরাধী হ'তে পারেন, রাজ্যে অপরাধদমনের দায়িত্বে তথাচ তিনিই বহাল থাকবেন। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সম্মতি আছে।

প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিবর্গ প্রায়ই আর্তনাদ করেন. জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন, ষড়যন্ত্রকারীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, অতএব প্রতিরক্ষা বাহিনী-পুলিশ বাহিনী আরো জোরদার করতে হবে, প্রতিরক্ষা খাতে-পুলিশি খাতে জলের মতো আরো টাকা খরচ করতে হবে, বিদেশ থেকে আরো হাজার-হাজার কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র

আমদানি করতে হবে, এই যেমন গত বছর সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার অস্ত্রাদি আমদানি করা হয়েছে। অবশ্য অস্ত্র আমদানির ছুতোয় কত টাকা ঘুষ হিশেবে এর-ওর পকেটে গেছে তা সাধারণ মানুষের জানা নেই, কিন্তু দেশবাসীদের মনে অন্য বড়ো প্রশ্ন থেকেই যাবে : অস্ত্রশস্ত্রই কি সব-কিছু, বছরের-পর-বছর প্রতিরক্ষা খাতে-পুলিশি খাতে খরচ বাড়িয়ে গেলেই কি দেশের নিরাপত্তা সংরক্ষিত হবে, যেখানে দেশের সেনাবাহিনীর দায়িত্বে নাগাল্যাণ্ডের বর্তমান রাজ্যপালের মতো মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তি, পুলিশের সর্বোচ্চ পদে পাঞ্জাবের বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেলের মতো চরিত্রহীন পুরুষ, সেখানে জনসাধারণ কতটুকু ভরসা রাখবেন, কতটুকু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন তাঁরা, কী ব'লে নিজেদের বোঝাবেন জাতীয় নিরাপত্তা-দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবার বিন্দুতম আশঙ্কা নেই ? রক্ষকরা যদি ভক্ষক হয়, কে বাঁচাবে দেশকে-জাতিকে ?

গণতন্ত্র বিপন্ন, নিরাপত্তা বিঘ্নিত, দেশরক্ষার দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত, সেই কেন্দ্রীয় সরকারের পারিষদবর্গ ও অনুচরবৃন্দের অনাচার-অত্যাচারেই জাতি বিপন্ন, জাতির নিরাপত্তা বিঘ্নিত। তথাকথিত রক্ষকরাই ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

দেশের মানুষ বোকা নয়, তাঁরা দেখছেন-বুঝছেন সব-কিছু। ত্রিপুরায় কংগ্রেস কী ক'রে নির্বাচনে জেতে, নাগাল্যাণ্ডে কোন্ নিয়মে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়, পাঞ্জাবের পুলিশ কর্তা মহিলা ধর্ষণ ক'রেও কী ক'রে পার পেয়ে যান, দুই অন্তঃপুরবর্তিনী মাতাকন্যা কোনো জাপানি কোম্পানি থেকে কেন সাড়ে-ছ'কোটি টাকা উপহার পান, বোফর্সের চৌষট্টি কোটি টাকা কোন্ গোপন চড়ায় গিয়ে ঠেকে, দেশের মানুষ তা সমস্ত জানছেন-বুঝছেন। হঠাৎ একদিন বিস্ফোরণে ফেটে পড়বেন তাঁরা।

# আমার যৌবন-বাগানে হাওয়া লেগেছে ফুল-জাগানে

সময়ের বিচারে যে-ব্যবস্থার দিন ফুরিয়েছে, তাতে ঘুণ ধরবে, তা পচবে, ইতিহাসের নিয়মে তার পর তা একদিন বিলুপ্ত হবে। কিন্তু কোন্ হারে, কতটা দ্রুততার সঙ্গে এই পচনপ্রক্রিয়া পরিসমাপ্ত হবে তা আগে থেকে বলা মুশকিল, আকস্মিক ঘটনাসম্পাতের উপর তা হয়তো নির্ভর করবে। আমাদের দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর কতদিন টি`কবে, কিংবা টি`কবে কি আদৌ ? কয়েক বছর আগেও এ ধরনের প্রশ্ন করতে বাধো-বাধো ঠেকতো, এখন আর ঠেকবে না, বিশেষ ক'রে গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলীর পর আর ঠেকবে না। তামিলনাদ রাজ্যের বিধান সভায় এক অদ্ভুতকিম্ভূত নাটক অভিনীত হ'লো। দুই পরম পরাক্রমশালিনী, পরস্পরের-সঙ্গে-যুযুধান মহিলার অনুগতবর্গের কীর্তিকলাপ দেখে জনৈক পৌরাণিক মহিলার আকৃতি মনে পড়লো আমাদের : ধরণী, দ্বিধা হও। পুরাণে অনেক জাদু, তেমন-তেমন প্রার্থনা জানালেই ধরণী নিজেকে দ্বিধাগ্রস্ত করতেন। বাস্তব পৃথিবীতে এখন তো তা হবার উপায় নেই, ইতিহাসের বিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় আমাদের, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সেই বিবর্তনের প্রবণতাকে আমরা সাহায্য করতে পারি শুধু আমাদের সামাজিক ভূমিকাপালনের মধ্য দিয়ে।

তাই, যে-মুহূর্তে তামিলনাদের অঙ্কে সাময়িক যবনিকা পড়ে, কান পেতে আমাদের শুনতে হয় ত্রিপুরাউপাখ্যান, তারপর ত্রিপুরা পেরিয়ে মেঘালয়কাহিনী। এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে, সংসদীয় গণতন্ত্র অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে চলেছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, একটি সূক্ষ্ম হিশেব কাজ করছে। গত এক বছর প্রধান মন্ত্রীর বড়ো দুঃসময় গেছে, হরিয়ানা-কেরল-পশ্চিম বঙ্গে, রাজ্যে-রাজ্যে তিনি নির্বাচনে হেরেছেন, তাঁর ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, যে-অভিযোগ দেশের বেশির ভাগ মানুষের মনে সন্দেহের ছায়া বিস্তার করেছে, তাঁর অন্তরঙ্গ একজন-দু'জন সুহৃদের দুর্নীতি পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে, দাক্ষিণাত্যে তাঁর দলের প্রভাব বহু দিন ধ'রেই প্রায় নিশ্চিহ্ন, এখন এমন কি খোদ আর্যাবর্তেও তিনি আর হালে পানি পাচ্ছেন না, বিহার-উত্তর প্রদেশের দেহাতিদের ভাষায়, লেড়কা 'ফেল' হো গয়া। তাঁর দলে মস্ত ভাঙন ধরেছে, কিছু-কিছু পাল্লাভারি

মানুষ ইতিমধ্যেই দল থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আরো অনেকে দলের ভিতরে থেকেই লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছেন, প্রধান মন্ত্রীকে বিপদে ফেলবার সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। দলের মধ্যে হাজার বিক্ষোভ, যে-যে রাজ্যে কংগ্রেসি সরকার আছে, মুখ্য মন্ত্রীরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ব'সে আছেন, আভ্যন্তরীণ নানা কোঁদল, কোনো-কোনো মুখ্য মন্ত্রীকে যে-কোনো দিন যে-কোনো মুহূর্তে বরখাস্ত করা হ'তে পারে, এমন ধ্যানধারণা, সুতরাং প্রশাসন স্তব্ধ। কংগ্রেস দলে বিবেক-নীতির বালাই বহু দিন ঘুচে গেছে, জনসেবার ঐতিহ্যবাহী কর্মীরা অপসৃত, এখন ব্যবসাদার-ঠিকেদাররা দলের মধ্যে প্রবিষ্ট, আগামী কাল কী ঘটবে তা নিয়ে যেহেতু কেউই নিশ্চিন্ত নয়, তারা তাই পড়ি-কি-মরি ক'রে সরকারি প্রসাদের সুযোগ গ্রহণ ক'রে লুটে-চেঁছে নিচ্ছে সব-কিছু। ফলে দলের এবং প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা আরো কমছে। সেই সঙ্গে এই বিশ্বাসও বদ্ধমূল হচ্ছে যে ১৯১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ একটি উটকো ঘটনা, ইন্দিরা গান্ধির শবদেহের ছবি দেখে ব্যাকুল হয়ে দেশের মানুষ তাঁর ছেলেকে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু, তার পর তো এতগুলি রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, কোনো কেরামতিই দেখাতে পারলেন না ভদ্রলোক, আসলে প্রধান মন্ত্রীটি, বাংলা ভাষায় আমরা যাকে বলি, 'হেরো'।

সারা দেশ জুড়ে এখন তাঁর পদত্যাগের দাবি উঠেছে, সেই সঙ্গে নতুন ক'রে লোকসভা নির্বাচনের। পিঠে কুলো বেঁধে আর কানে তুলো দিয়ে প্রধান মন্ত্রী যদি সেই দাবি উপেক্ষাও করেন, তা হ'লেও, সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মনীতি যদি মানতেই হয়, ১৯১৯ সালের শেষার্ধে নির্বাচনের ব্যবস্থা না ক'রে তাঁর উপায় নেই। হাতে সময় বড়ো কম, নিজের ভাবমূর্তি একটু উজ্জ্বল না করলেই নয়, যে ক'রেই হোক নিজের 'হেরো' প্রখ্যাতিটি পাল্টানো প্রয়োজন। বিদেশ থেকে, বিশেষ ক'রে পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে, অবশ্য ভুরি-ভুরি প্রশংসাপত্র আসছে প্রতিদিন; তাঁদের বিবেচনায়, আমাদের প্রধান মন্ত্রী সর্ব গুণের আধার, তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁদের নাকি বিস্ময়ের সীমা নেই। মুশকিল হলো সংসদীয় গণতন্ত্রের অদ্ভুত নিয়মকানুন, যাঁরা প্রধান মন্ত্রীর প্রশংসায় সহস্রমুখ, সেই বিদেশীদের নির্বাচনে ভোটের অধিকার নেই। তা ছাড়া, বিদেশীদের কথায় দিশী চিঁড়ে ভেজার দিন শেষ হয়েছে। তাই দেশবাসীদের কাছে ভাবমূর্তি শোধরানোর তাগিদ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। তার জন্য দরকার পর-পর কয়েকটি নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর অন্তত একটি-দু'টি নির্বাচনী সাফল্য। আর্যাবর্তের মানুষদের আপাতত ঘাঁটানো নিরাপদ নয়, দুর্নীতি ও দুর্নীতিপরায়ণদের আশ্রয়দানের কলঙ্ক প্রধান মন্ত্রীর ভাবমূর্তিকে ওখানে

এতটা কলুষিত করেছে যে এই মুহূর্তে ভোট করতে গেলে ভরাডুবির আশঙ্কা। অতএব উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ছোটো-খাটো রাজ্যগুলি বেছে নেওয়া যাক। যেমন নাগাল্যাণ্ড, মাত্র বারো লক্ষ ভোটদাতা। যেমন ত্রিপুরা, তেরো লক্ষ ভোটদাতা। অথবা মেঘালয়, একুনে মাত্র ছয় লক্ষ ভোটদাতা। যেন-তেন-প্রকারেণ যদি এই-ক'টি রাজ্যে নির্বাচনে আংশিক সফলতাও দেখানো যায়, সাধারণ মানুষের ধারণা পাল্টাতে শুরু করবে, প্রধান মন্ত্রী হেরো নন, তিনি জিততে পারেন-জেতাতে পারেন এ ধরনের কথা ছড়িয়ে দেওয়ার মস্ত সুযোগ দেখা দেবে তা হ'লে।

বিগত কয়েক মাস ধ'রে পরিকল্পনামাফিক কাজ হয়েছে। মেঘালয়ের বিধান সভা নির্বাচনে দলের পক্ষ থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে, সরকারি খাতেও বেপরোয়া টাকা ঢালা হয়েছে নির্বাচনের আগে, এমনকি যদিও ঐ রাজ্যে দিব্যি বছর ভ'রে সুপরিমিত বৃষ্টিপাত হয়েছে, খরাত্রাণের নামেও দশ-বিশ কোটি টাকা বিলোনো হয়েছে, এক ধাক্কায় নাগাল্যাণ্ডবাসীদের জীবনযাত্রার মান অনেকটা উপরে উঠে গেছে। তপস্যা সার্থক. প্রধান মন্ত্রীর দল নাগাল্যাণ্ডে ষাটটি আসনের মধ্যে চৌত্রিশটি দখল করতে সক্ষম হয়েছে, সাবধানের মার নেই, এই চৌত্রিশ জনের মধ্যে জনাকুড়িকে মন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, একজনকে বিধান সভার অধ্যক্ষ, অন্য আরেকজনকে বিধান সভার উপাধ্যক্ষ, আর বাকি যে-বারো জন রইলেন তাঁদের প্রত্যেককে কোনো-না-কোনো রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রধানের পদে বসানো হয়েছে, সুতরাং মনের দুঃখে বনে যাওয়ার মতো একজনও আর বাকি থাকেননি।

রক্তাক্ত ত্রিপুরার প্রসঙ্গে, ধ'রেই নেওয়া যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে দেশের মানুষকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ঐ সীমান্ত রাজ্যে, কোনো সন্দেহ নেই, প্রধান মন্ত্রী ইতিহাস রচনা করেছেন। এমনকি ভোটের সরকারি হিশেবেও ধরা পড়ছে, যাঁরা জোর ক'রে ক্ষমতা দখল করলেন গোটা রাজ্যে তাঁরা ভোট পেয়েছেন যাঁদের গলাধাক্কা দিয়ে প্রশাসন থেকে বিদায় করা হলো তাঁদের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু এটা যুদ্ধ, শ্রেণীযুদ্ধ, শ্রেণীস্বার্থরক্ষার যুদ্ধ, এই যুদ্ধের সঙ্গে ১৯৮৯ সালের শেষার্ধের সর্বভারতব্যাপী আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্মের ব্যাপার নেই এখানে, ছলে-বলে-কৌশলে জিততেই হবে। প্রধান মন্ত্রী তিনটি অস্ত্রই প্রয়োগ করেছেন, তাতেও কাজ না হওয়াতে অন্তত একটি কেন্দ্রে ভোটের গণনায় পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও নির্বাচনী কমিশনারকে বাধ্য করিয়েছেন সরকারিভাবে তাঁর দলকে জয়ী ঘোষণা করতে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে ফ্যাসিবাদী কায়দার এই

পরম সংমিশ্রণ উদাহরণ হিশেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দীপ্তি ছড়িয়ে যাবে আবহমান কাল ধ'রে।

এবার মেঘালয়ের পালা। ওখানে বিরোধী দলগুলি নির্বাচনের আগে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় পৌঁছুতে পারেননি, তা হ'লেও ভোট গোণা যখন শেষ হলো, বিধান সভার ষাটটি আসনের মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর দলের ঝুলিতে মাত্র বাইশটি। তাতে কী, তাতে কী, সততবিবেকতাড়িত রাজ্যপাল মহোদয় এক পলও বিলম্ব করলেন না, ঝড়ের বেগে প্রধান মন্ত্রীর দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য নিমন্ত্রণ পাঠানো হলো, ঝড়ের বেগে তিনি রাজভবনে চ'লে এলেন, ঝড়ের বেগে তিনি মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করলেন। বিধান সভায় এই মুহূর্তে প্রধান মন্ত্রীর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, তাতে কী, মানুষের সব চেয়ে বড়ো পরিচয় সে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, প্রধান মন্ত্রীর দল মেঘালয়ে আপাতত সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার দুর্দান্ত খেলায় মগ্ন। দলীয় প্রতীকে যে-বাইশ সদস্য জিতেছেন, তাঁদের অর্ধেকজনকে মন্ত্রী ক'রে দেওয়া হয়েছে, বাকিদেরও মন্ত্রীদের সমান মর্যাদার পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে কোনো-না-কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে। বাইরেকার তিনজন বিধান সভা সদস্যকে, যাঁরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিশেবে জয়লাভ করেছেন, তাঁদের আপ্যায়ন ক'রে এনে পূর্ণমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কিন্তু, তাতেও হচ্ছে না, আরো অন্তত পাঁচজনকে ভাঙিয়ে আনা চাই, নইলে বিধান সভায় সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। রাখা-ঢাকার কোনো ব্যাপার নেই এখানে, প্রধান মন্ত্রীর দলের পক্ষ থেকে অতি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা ক'রে দেওয়া হয়েছে, কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল, আমার যৌবন-বাগানে হাওয়া লেগেছে ফুল-জাগানে, ওগো ফুটেছে এত ফুল ফুলমালি কই, সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে উদারচরিত্রের সাযুজ্য ঘটেছে, যিনি আসবেন তাঁকেই মন্ত্রীপদে বরণ ক'রে নেওয়া হবে, মানের লড়াই এটা, বাজারে তো রটবে প্রধান মন্ত্রীর দল নির্বাচনান্তে সরকার গঠন করেছে মেঘালয়ে, সুতরাং এই অপবাদ কেউ দিতে পারবে না যে প্রধান মন্ত্রী হেরো।

মেঘালয়ের রাজ্যপালের সংবিধানগত প্রাণ, তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো বিধান সভায় দৃশ্যত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও কেন প্রধান মন্ত্রীর দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানানো হলো, তিনি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে সংবিধানের দোহাই পাড়লেন, বিধান সভায় যে-দলের সবচেয়ে বেশি সদস্য, তাদেরই সংবিধানের নির্দেশ-অনুযায়ী মন্ত্রি সভা গঠনের সুযোগ সর্বাগ্রে দিতে হয়,

তিনি ঠিক তা-ই করেছেন। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যে কেন সেই বিধি প্রয়োগ করা হলো না, কেন সবচেয়ে-বেশি-আসনে-জেতা সি পি আই (এম) দলের নেতাকে প্রশাসনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হলো না, তার জবাব দেওয়ার দায় তো মেঘালয়ের রাজ্যপালের নেই। সংসদীয় গণতন্ত্র এটা, কিছু-কিছু লোক-লজ্জার ব্যাপার তো আছে, এখন এটা তো আর প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রে বলা যায় না, নির্বাচনী ফলাফল যা-ই হোক না কেন, রাজ্যপাল মহোদয়গণ সর্বরাজ্যে সর্ব-অবস্থাতে প্রধান মন্ত্রীর দলকেই সরকার গড়তে ডাকবেন, তাঁদের বিবেকের দায় এটা, নুন খান যার, তাঁরা গুণ গাইবেন তার, কারচুপি করবেন তার হয়ে, রাজ্যপালরা করবেন, নির্বাচনী কমিশনার করবেন।

কে বা কারা বলে আমাদের প্রধান মন্ত্রী হেরো? যারা বলে, তারা সংসদীয় গণতন্ত্রকে মর্যাদা দিতে শেখেনি, জনগণের রায়ের প্রতি তাদের বিন্দুতম শ্রদ্ধা নেই, গণতন্ত্রের যোগ্যই নয় তারা। আইন ক'রে তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যেতে পারে কিনা সেই প্রশ্নটি বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে।

# মহাভারত একটু অশুদ্ধ হোক

পৃথিবীর সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষ বঞ্চনার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে ; পৃথিবীর সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন অবিচ্ছেদ্য ; শোষণের বিরুদ্ধে কোনো-এক বিশেষ দেশে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামবিশেষ অন্যত্র, আরো হাজারটি দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শ্রমিকশ্রেণীকে প্রেরণা জোগায়, রাষ্ট্রীয় সীমা-রেখা অতিক্রম ক'রে তাই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধ : এই কথাগুলি যে-কোনো নিষ্ঠাবান, সমাজতন্ত্রে প্রত্যয়শীল বামপন্থীর চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোত মেশানো। ইতিহাসে একই কাহিনী পুনঃপৌনিকতার সঙ্গে ঘটেছে, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ, রাজাদের স্বার্থে যুদ্ধ, অথচ কোতল হয়েছে সাধারণ মানুষ, গরিব নিঃসম্বল খেটে-খাওয়া মানুষ। হয় তাদের জোর ক'রে সৈন্যবাহিনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, নয় তো তাদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম তৈরি করা হয়েছে, অথবা তাদের আপ্রাণ পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসল গায়ের জোরে তুলে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চালান করা হয়েছে। কখনো-কখনো যুদ্ধের পরিণামে দেশে ঘোর অরাজকতা দেখা দিয়েছে, দুর্ভিক্ষ কিংবা খরার পরাক্রম, বিত্তবান গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ ঠিকই সামলে নিয়েছেন, চিরাচরিত প্রথায় মারা পড়েছেন এদেশ-ওদেশ-দুই দেশেরই গরিবরা। শ্রমজীবী মানুষের হয়ে লড়াই করেন সমাজতান্ত্রিক বোধে দীক্ষিত যে-বিবেকবান ব্যক্তিরা, তাঁরা তাই যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সর্বদা সতর্ক থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছেন-করছেন। রাজপথে যখন লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, 'যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই, হামলা চাই না, মৈত্রী চাই,' বহু প্রজন্মের অভিজ্ঞতায় সেই উচ্চারণ অবগাহিত। খুব কম যুদ্ধের কথাই ইতিহাসের পাতায় পড়তে পাওয়া যায় যে-যুদ্ধ থেকে শ্রমজীবী মানুষ লাভবান হয়েছেন, তাঁদের শক্তি প্রসারিত হয়েছে, যুদ্ধান্তে তাঁদের মজুরি-উপার্জন বেড়েছে, জিনিশপত্রের দাম কমেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধ। হিটলারের সোভিয়েট আক্রমণ, নাৎসী নেতাদের বিভিন্ন ঘোষণা থেকে যা স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছিল, সংঘবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত সংগ্রাম। সেই যুদ্ধ তাই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বাঁচার লড়াই, ফ্যাসীবাদকে পর্যুদস্ত না করতে পারলে মানুষের জয়যাত্রা বহু যুগ

ধ'রে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। শ্রমজীবী মানুষ শান্তির সপক্ষে যেহেতু তাঁরা জীবনের সপক্ষে, তাই তাঁরা সর্বস্ব পণ ক'রে হিটলারের নারকীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এখন উল্লেখ করলে চট্ করে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রায় তিন কোটি সোভিয়েট নাগরিককে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছিল।

ধনতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলিতে যুদ্ধোন্মাদনা, তাদের প্রতিরক্ষা খাতে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা অবিরাম খরচ ক'রে যাওয়া, তা কিন্তু সমস্ত আদর্শ শিকেয় তুলে রেখে। হয়তো ভুল বলা হলো, একটি বিশেষ আদর্শ অবশ্যই কাজ করছে. সামন্ত-তান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে কায়েম রাখবার জন্যই হয়তো প্রতি বছর ধাপে-ধাপে সামরিক খাতে খরচ বাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। অসম বণ্টন-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের উপার্জন রুদ্ধগতি, বাজারে চাহিদায় তাই ঘাটতির আশঙ্কা দেখা দেয়, মুনাফায় ছেদ পড়ে, আর্থিক সংকটের সম্ভাবনা বাড়ে। এই অবস্থায় সামরিক ব্যয় কৃত্রিম উপায়ে ধ'রে রাখতে পারলে পুঁজিপতিদের মুনাফার মাত্রাকেও ধ'রে রাখা সম্ভব হয়। ঐ একই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে পুঁজিবাদী দেশ-গুলি থেকে মহা উৎসাহে গরিব অনুন্নত দেশগুলিতে অস্ত্র রপ্তানির সমারোহ শুরু হয় ; যত বেশি অস্ত্র গছানো যাবে, পুঁজিওলাদের লাভের বহর তত বাড়বে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে স্থিত যে-ব্যক্তি, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধে যাঁর অগাধ আস্থা, তিনি বিবেকগত কারণেই প্রতিরক্ষা ব্যয় অযথা অহরহ বাড়িয়ে যাওয়ার বিপক্ষে সোচ্চার হবেন। যখন স্পষ্ট দেখা যায় প্রতিরক্ষার নামে প্রতি বছর বিদেশ থেকে, প্রায় কোনোরকম বাছবিচার না ক'রেই, অঢেল যুদ্ধের সরঞ্জাম কেনা হচ্ছে, যা থেকে লাভবান হচ্ছে একমাত্র ধনতান্ত্রিক দেশের পুঁজিপতিরা, আপত্তির সমর্থনে তাঁর যুক্তি আরো জোরদার হয়। তা হ'লেও, প্রতি-রক্ষার নাম ক'রে যে-অপব্যয় হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনে এই শ্রেণীর মানুষদের প্রচুর অসুবিধার মুখোমুখি হ'তে হয়। রেডিও-টেলিভিশন শাসকদলের কুক্ষিগত, অধিকাংশ সংবাদপত্র পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন, আদর্শনিষ্ঠরা নিজেদের কথা যথাযথ প্রচার করার তেমন সুযোগ সাধারণত আদৌ পেয়ে থাকেন না। বরঞ্চ, তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। 'ওরা বামপন্থী, ওদের দেশপ্রেম নেই, ওরা আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের কথা বলে. ওরা দেশের স্বার্থ কখনোই ভাবে না, ওদের কী-সব আন্তর্জাতিক সংগঠন আছে, তাদের নির্দেশেই ওরা পরিচালিত হয়, সুতরাং ওরা তো প্রতিরক্ষার খরচ কমাবার কথা বলবেই, দেশের

জন্য কোন মায়া আছে নাকি ওদের ?' মোটামুটি এই কায়দায় অপপ্রচার চালানো হয়।

অন্তত গত পঁচিশ বছর ধ'রে এই বিভঙ্গে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কুৎসা গাওয়া হয়েছে। সরল সাধারণ মানুষের কাছে দেশরক্ষার প্রসঙ্গ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়, দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হোক তাঁরা কেউই চাইবেন না সেটা। এই মানুষগুলির মধ্যে গিয়ে মহাবিক্রমে চেঁচিয়ে বলা হয়েছে : মায়েরা-বোনেরা-ভাইয়েরা, শুনুন আপনারা, আমরা বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে চাই, বিদেশী হামলাবাজরা যাতে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে কোনো গোলমাল বাঁধাতে না পারে সে-বিষয়ে আমরা দৃঢ়কল্প, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা প্রতি বছর প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছি, বিদেশী শত্রু দূর হটো, অথচ দেখুন, এই বামপন্থীদের আচরণ দেখুন, ওদের তো দেশ সম্পর্কে কোনো মায়ামমতা নেই, ওরা সব সময় অন্য-অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা আওড়ায়, নিজেদের দেশ নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই, দেশ রইলো কি গেল তাতে ওদের কিছু যায় আসে না, এই হতচ্ছাড়া বামপন্থীরা বলছে প্রতিরক্ষার ব্যয় সংযত করতে হবে, বুঝে-সুঝে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেনা উচিত ; বামপন্থীরা কেন এ-সব বলছে তা বুঝতে তো আপনাদের কোন অসুবিধা হবার কথা নয়, ওরা দেশকে দুর্বল করতে চায়, তাই আমরা আপনাদের কাছে এসেছি, আপনারাই বলুন, প্রতিরক্ষাব্যয়ে কার্পণ্য না ক'রে আমরা ঠিক করেছি না ভুল করেছি ; আপনারা তো জানেন, নানা বিদেশী গুপ্তচর সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের লক্ষ ভিতর থেকে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি ক'রে জাতীয় সংহতি, জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, অতএব আমরা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে চাইছি গুপ্তচরদের যাতে নির্মূল করতে পারি, এখানেও দেখুন বামপন্থীরা আপত্তি তুলছে, বলছে বড্ড বেশি খরচ করছি, এখন আপনারাই বলুন কী করবো আমরা, ঐ দেশপ্রেমহীন বামপন্থীদের কথা শুনে প্রতিরক্ষা তথা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার খাতে খরচপাতি বন্ধ ক'রে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকবো, না দেশ-রক্ষার জন্য ন্যূনতম যা-যা করণীয়, সেই অনুযায়ী প্রতিরক্ষাব্যয় যথাবিহিত বাড়িয়ে-বাড়িয়ে যাবো। এ ধরনের প্রচারের তোড়ে বামপন্থীদের বিবেকগত আপত্তি কুটোর মত ভেসে গেছে, দেশের নিরাপত্তা নিয়ে তো ছেলেখেলা চলে না।

সুতরাং আদর্শবাদী বামপন্থীদেরও ঠেকে শিখতে হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নেমে গিয়ে কাজ করতে হবে, তাঁদের বোঝাতে হবে শ্রেণীসমস্যার কথা,

ইতিহাসধারার কথা, সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্রের উত্থান-অবক্ষয়ের কথা, পুঁজিবাদীদের লালসার কথা, জোটবাঁধা শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অমিত বিক্রমের কথা, কিন্তু গোড়াতেই যদি সাধারণ মানুষ তাঁদের ভুল বুঝে বসেন, সন্দেহ করেন তাঁদের দেশপ্রেমে খাদ আছে, সেই সন্দেহ থেকে তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখেন, তা হ'লে সর্বনাশ। জনসাধারণের মানসিকতার প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বামপন্থী কর্মীর পক্ষে অকর্তব্য, এই বিবেচনাবশত তাই আদর্শবাদীদেরও নিজেদের উক্তি-আচরণ কিছুটা সংশোধন ক'রে নিতে হয়েছে, হিশেব ক'রে বক্তব্য রাখতে হয়েছে, নিজেদের মনের সংশয় ঘুরিয়ে ব্যক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, অনেক সময় ডাঁহা-ডাঁহা অনাচার প্রতিরক্ষার নামে হচ্ছে জেনেও মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়েছে।

তবে ধর্মের কল বোধ হয় বাতাসে নড়ে। এই এ-বছরই, মাত্র মাস পাঁচেক আগে, আমাদের নবীন প্রধান মন্ত্রী রাজ্যসভায় প্রতিরক্ষা বাজেটের উপরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, প্রচুর পিঠ-চাপড়ানো বক্তৃতা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-ঠাসা। খবরদার, কেউ প্রতিরক্ষার খরচ কমাবার প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করবেন না, কিংবা বলবেন না কোন্ খাতে কত খরচ হচ্ছে তা একটু বিশদ ক'রে আলোচিত হোক; মাননীয় সদৃস্যবৃন্দ, প্রতিরক্ষা অত্যন্ত সংবেদনশীল ব্যাপার, গোপনীয়তরক্ষা প্রতিরক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ; বহিঃশত্রুরা আমাদের ঘিরে রয়েছে, এই পরিস্থিতিতে আপনাদের মধ্যে যদি কেউ থেকে থাকেন যিনি আবদার ধরবেন প্রতিরক্ষার খরচ কমানো হোক কিংবা তাঁকে সে-সব খরচের বিশদ বিবরণ জানানো হোক, তা হ'লে আমি বলতে বাধ্য হবো তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমের লেশমাত্র নেই, এমনকি বলতে বাধ্য হবো তিনি শত্রুপক্ষের অনুচরের মতো আচরণ করছেন।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। মাত্র মাস পাঁচেক আগে প্রধান মন্ত্রীর এই বজ্রগর্ভ বিবৃতি। ইতিমধ্যে বোফর্সের বোমা ফেটেছে, জার্মান সাবমেরিনের কেলেঙ্কারিও প্রকাশ পেয়েছে। গাঁয়ে-গঞ্জের অতি সাধারণ মানুষও হঠাৎ বুঝতে পেরেছেন, অনেক কাল ধ'রে তাদের ধোঁকা দেওয়া হয়েছে, যা বলা হয় অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক তা নয়, প্রতিরক্ষার ছুতোয় যে-বাড়তি টাকা প্রতি বছর দিল্লির সরকার খরচ করেন, তা দেশের নিরাপত্তা আদৌ হয়তো দৃঢ়তর করে না, তা আসলে শাসকদলের প্রিয়ভাজন কোন দালালের উপার্জন বৃদ্ধি করে, এবং সেই উপার্জন জমা হয় কোন বিদেশী ব্যাংকের গোপন দু'নম্বরী খাতায়। তাঁদেরই টাকা, তাঁরা ট্যাক্সো দিয়েছেন সেই ট্যাক্সোর টাকা, এভাবে নয়-ছয় হচ্ছে, অথচ বক-

ধার্মিকের দল এই এতগুলি বছর ধ'রে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে দেশ বিপন্ন, প্রতিরক্ষাব্যয় না বাড়িয়ে উপায় নেই।

গাঁয়ে-গঞ্জের মানুষ হয়তো নিরক্ষর, কিন্তু দেশের ভালো-মন্দ তাঁরা এরকম অবস্থায় চট্ ক'রে বুঝে নিতে পারেন। তাঁদের যে ঠকানো হয়েছে তা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। জাতির এই মস্ত নৈতিক বিপর্যয়ের সংকট ঠিক কীভাবে আমরা অতিক্রম করবো তা এখনো অস্পষ্ট, এত কেলেঙ্কারির পরেও প্রধান মন্ত্রীর গদি টি'কবে না টি'কবে না তা-ও এই মুহূর্তে বলা মুশকিল, দেশের জমিদারশ্রেণী-পুঁজিপতি-ব্যবসাদার সম্প্রদায় বর্তমান অবস্থায় কী কৌশল অবলম্বন করবেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু অন্তত একটি ইতিবাচক পরিণতি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই নিশ্চয় ক'রে বলা চলে। শুভফল, এখন থেকে আর আদর্শবাদীদের শান্তির সপক্ষে লড়তে নেমে বিপন্ন বোধ করতে হবে না, তাঁরা উচ্চগ্রামে দাবি তুলতে পারবেন প্রতিরক্ষাব্যয় আর দেশপ্রেম সমার্থক নয়, নিরাপত্তা তথা প্রতিরক্ষার নামে যে-খরচ হচ্ছে তা স্বচ্ছন্দে এক-দশমাংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ ছাঁটাই করলে তেমন-কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, যে-টাকা বাঁচবে তা দিয়ে ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হোক, প্রতিটি বর্গক্ষেত্রে সেচের জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক, প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের সাংবিধানিক অঙ্গীকাররক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হোক, অভুক্তদের দুই বেলা অন্ন পৌঁছে দেওয়া হোক, দেশের নিরাপত্তা তাতে বাড়বে বই কমবে না।

এখন থেকে, মস্ত বাঁচোয়া, ঐ উদ্ধত-বাচাল প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে দেশপ্রেম কাকে বলে তার তালিম নিতে হবে না।

# আমাদের লড়াই, আমাদেরই লড়াই

খানিকদূর পর্যন্ত আমাদের বিবেক দৌড়োয়, তার পর তাকে আমরা নিরস্ত হ'তে বলি। তেমন অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে অনেক ক্ষেত্রে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু বর্ণবিদ্বেষী সরকার তার নৃশংসতা-অমানুষিকতা নিয়ে বছরের পর বছর ধ'রে বিরাজ করছে, পৃথিবীর অন্যত্র, দেড়শো-দু'শো দেশে ছিটিয়ে-থাকা, আমাদের মতো কোটি-কোটি মানুষ অথচ নির্বাক, এবং প্রায় নির্বিকার। আমরা ভীরু, আমাদের হাতে ভুবনের ভার নেই। একটি স্তর পর্যন্ত অন্যের ব্যথায়-দুঃখে-দুর্দশায় কাতর হ'তে পারি আমরা, যাঁরা অত্যাচারিত বা শোষিত হচ্ছেন পৃথিবীর এখানে-ওখানে, একটা স্তর পর্যন্ত তাঁদের হয়ে আমরা লড়াই করতেও হয়তো কখনো-সখনো রাজি হ'তে পারি, কিন্তু সেই স্তরে ঈষৎ দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে যাই আমরা। দক্ষিণ আফ্রিকায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধ'রে দরিদ্র সহায়সম্বলহীন কৃষ্ণকায় সম্প্রদায় জবাই হচ্ছেন, মুখে আমরা মামুলি সমবেদনা জানাই, বছরে একদিন ফাঁসিতে-লটকে-দেওয়া কবি মোলায়েজের স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই; আমাদের বিবেক ক্রমে যেন ঘুমের কোলে ঢ'লে পড়ছে। ক্রমশ, আমাদের মধ্যে এমনকি যাঁরা বহির্পৃথিবী নিয়ে একটু বেশি সচেতনতার দাবি করেন, তাঁদেরও উৎসাহ তথা আবেগ হ্রস্বের দিকে। 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম' সেই ভাবনাবিবেচনাহিশেব-ডোবানো উন্মাদনা এখন স্মৃতিতে পর্যবসিত। মার্কিন বোম্বেটে বাহিনী কয়েক বছর আগে যখন গ্রেনাডা গ্রাস ক'রে নিল, বিশ্বের অন্যত্র সামান্য ধিক্কার জানানোর বাইরে আর আদৌ কিছু করা হলো না, দস্যুদের বর্বর উল্লাসকে প্রতিহত করার জন্য কোনো প্রতি-উদ্যোগই নেওয়া হলো না। একদা যাঁরা বিবেকবান ছিলেন, ধীরে-ধীরে তাঁদের অধিকাংশ এখন হিশেবরক্ষকে পর্যবসিত হচ্ছেন। এমন কি নিকারাগুয়ার মানুষগুলি মরণপণ ক'রে গত কয়েক বছর ধ'রে তাঁদের বিপ্লবকে রক্ষা কববার জন্য যে-বেপরোয়া লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা প্রধানত নিজেদের শক্তি, নিজেদের সাহস, নিজেদের বিশ্বাসের সংস্থানে দাঁড়িয়েই সেই লড়াই চালাচ্ছেন, আমরা বাইরে থেকে

সৌজন্যসূচক শুভেচ্ছা পাঠিয়েছি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মামুলি ধিক্কার জ্ঞাপন করেছি, কিন্তু ব্যাকরণের মান বাঁচাতেই আমাদের যতটুকু নড়াচড়া। ব্যাকরণের বাইরে গিয়ে আমাদের বিবেককে সর্বত্রব্যাপী মানবিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার ধর্মযুদ্ধে, নিযুক্ত করবার প্রসঙ্গ থেকে আমরা পাশ ফিরিয়ে থেকেছি, থাকছি। আমরা ক্রমশ চতুর হয়েছি, নিজেদের স্বার্থের কথা সবচেয়ে আগে চিন্তা করতে শিখেছি, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের পোশাকি বুলি শুনতে ভালো, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি, বুঝে গেছি এই মস্ত পৃথিবীতে কেউ কারো নয়।

হয়তো, তা হ'লেও নিজেদের বিবেকের কাছে লজ্জা পাওয়ার আশঙ্কা থাকে আমাদের, বিবেককে তাই আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। কিন্তু এখন থেকে হয়তো তারও আব দরকার পড়বে না। নতুন তত্ত্বের কথা শুনতে পাচ্ছি আমরা, নতুন নীতির কথাও সেই সঙ্গে। গোটা পৃথিবী পারমাণবিক অস্ত্রে ছেয়ে যাচ্ছে। এই অস্ত্রাদি সর্বধ্বংসী, একবার নিক্ষিপ্ত হ'তে শুরু হলে পরিপূর্ণ প্রলয়, শত্রু-মিত্রের মধ্যে ভেদাভেদ করবে না এই ধ্বংসলীলা, স্বদেশ-বিদেশ সবই বিলুপ্ত হবে, নিশ্চিহ্ন হবো আমরা এদেশে-ওদেশে সবাই, জলবে-পুড়বে-ছাই হয়ে যাবে একই সঙ্গে আমাদের-আমাদের বৈরীদের ঘরবাড়ি-কলকারখানা-খেতখামার-আরোগ্যশালা-প্রমোদকুঞ্জ। পারমাণবিক যুদ্ধ, যে-পক্ষই শুরু করুক না কেন, যে-অছিলাতেই শুরু হোক না কেন, কাউকেই ছেড়ে কথা বলবে না, সমগ্র মানব-সভ্যতা বিলুপ্ত হবে, ভস্মীভূত পৃথিবীতে কোনো প্রাণী আর বিচরণ করবে না। এই ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা মনে রেখে এখন নানা নবজল্পনার সূত্রপাত হয়েছে। পারমাণবিক যুদ্ধে কোনো জয়ী নেই, কোনো পরাজিত নেই, এই যুদ্ধ মনুষ্যজাতির চরম সর্বনাশ। অতএব যে ক'রেই হোক এই যুদ্ধের আশঙ্কা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে। মুশকিল হলো পারমাণবিক শক্তির রহস্য এখন আর গোপন নেই, দেশে-দেশে তা ছড়িয়ে পড়েছে, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের সরকার তাঁদের পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভারের বড়াই করছেন, আরো বেশ কয়েকটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্রোৎপাদনে কৃতকার্যতার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, অচির ভবিষ্যতে আরো অনেক দেশে পারমাণবিক অস্ত্রের আস্ফালন বিস্তার লাভ করবে। আরো মুশকিল হলো এই মারণাস্ত্র যেমন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির কুক্ষি-গত, পুঁজিবাদী দেশগুলিও পিছিয়ে নেই। কার ভাণ্ডারে কত বেশি পরিমাণে এই মারণাস্ত্র জমা পড়েছে, কাদের অস্ত্র তুলনাগতভাবে অধিকতর উৎকৃষ্ট, এ-সমস্ত প্রশ্নও তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কারণ একটি অতি সাধারণ মানের পারমাণবিক

বোমাই পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে সক্ষম। অনবধানতাবশতই হোক, এক পক্ষ অস্ত্র নিক্ষেপ করলে অন্য পক্ষ থেকেও সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যুত্তরে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হবে, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী-জোড়া প্রলয়।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রাগ্রসরতায় আমরা এতদিন বিশ্বাস আরোপ ক'রে এসেছি, আমাদের চেতনার সঙ্গে এই প্রতীতি জড়ানো যে অত্যাচারই শেষ কথা বলে না, পৃথিবীর উত্তরণ ঘটে, ঘটবে, মানবসভ্যতার উত্তরণ ঘটে, ঘটবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ পেরিয়ে গোটা পৃথিবীতে একদিন সমাজতন্ত্রের ঢল বন্যার মতো নামবে, ইতিহাসের নিয়মে ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠবে, দেশে-দেশে শৃঙ্খলমুক্ত জনগণ বিজয়কেতন উর্ধ্বে তুলে ধরবে। এখানে-ওখানে শ্রেণীযুদ্ধ ঘটতে থাকবে, এদেশে-ওদেশে। কিন্তু দুনিয়ার মজদুর যেহেতু ঐক্যবদ্ধ, একই স্বপ্নের অঞ্জন তাদের চোখে, যে-দেশে শ্রমজীবী মানুষ ইতিমধ্যেই জয়ী, সমাজতন্ত্রের পারিজাতভূমিতে পৌঁছে গেছেন তাঁরা, তাঁরা হাত বাড়াবেন যাঁরা এখনো মুক্তির জন্য যুদ্ধ লড়ছেন, পুঁজিবাদের শোষণের সাঁড়াশিতে এখনো পিষ্ট হচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের দিকে, এগিয়ে আসবেন সাহায্য ও বরাভয়ের ডালি সাজিয়ে। এ-ই তো আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র-বোধ, আমরা যখন আমাদের ভাষায় লা ইণ্টারন্যাশনাল সংগীত সমস্বরে গাই, বলি, এসো, মিলি একসাথ, এই ভ্রাতৃত্ববোধের কথাই তো বলি।

এখন কিন্তু শোনা যাচ্ছে, আমাদের নতুন নীতিতে প্রবেশ করতে হবে। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জাহেতু আন্তর্জাতিক শ্রেণীযুদ্ধের প্রসঙ্গ এখন থেকে নাকি পরিত্যজ্য, ধর্মযুদ্ধ আর সম্ভব নয়। কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে মানুষের অবমাননা অনবচ্ছিন্ন চলছে, শোষণ তুঙ্গে, গোটা দেশ ধ্বংসের কারাগার, সেই দেশের মানুষ এরই মধ্যে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের আশা প্রতিবেশী সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন, সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ সমরে আহ্বান করবে এই দেশের পুঁজিবাদী শাসকদের, ন্যায়ের জয় ঘোষিত হবে, অধর্মের পরাজয়। কিন্তু এখন থেকে সেই আশা আর ফলবতী হবে না। নতুন নীতির কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি, তত্ত্বের ভিত্তিকে রচিত নতুন নীতি। যেহেতু যে-কোনোযুদ্ধই এখন খানিক সময়ের ব্যবধানে পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নেবে, এবং পারমাণবিক যুদ্ধ মানেই সর্বসংহার, শত্রু-মিত্র সবাই পুড়ে মরবে, অতএব প্রথাগত আন্তর্জাতিক শ্রেণীযুদ্ধও আর সম্ভব নয়। আমাদের নিজেদের সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তো টিকিয়ে রাখতে হবে, পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হ'লে তো তা টিকবে না, এবং যেহেতু যে-কোনো যুদ্ধই শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত

হবে, আমাদের বুক ফেটে গেলেও পুঁজিবাদী অত্যাচারের হাত থেকে পড়শীদের উদ্ধার করবার জন্য শ্রেণীযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া আর সম্ভব নয়। আমাদের সংবৃত থাকতে হবে, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতি তার নিজের নিয়ম মেনে এগোক, আমাদের পক্ষে তাকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না, সেই দ্বান্দ্বিক গতির রথচক্র কোথাও যদি কাদায়ও ব'সে যায়, কাদা থেকে টেনে তোলবার জন্যও আমাদের এগিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে না। আদর্শের নিয়মকলা বদলাতে হবে এখন থেকে, পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার নাকি আমাদের নতুন ক'রে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে, হয় শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নয় পারমাণবিক সহ-বিনাশ। সুতরাং সর্ববাদীসম্মত অত্যাচারীর সঙ্গেও নাকি সহ-অবস্থান করতে হবে, সেই অত্যাচারী যদি আমার ভাইকে জবাই করে, আমার বোনকে ধর্ষণ করে, তা হ'লেও।

বিবেকপ্রক্ষালনের সুযোগের দিক থেকে বিচার করলে এই তত্ত্বের অবশ্য তুলনা নেই, সবাই তাহ'লে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে বাঁচার অবলম্বন খুঁজে পাবেন। কিন্তু তত্ত্বটির আরেক দিকও তো আছে। আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধ ধ্রুব সত্য। কিন্তু তা হ'লেও আমাদের আভ্যন্তরীণ সমাজশত্রুর সঙ্গে যখন আমরা মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ, কোনো—যে-কোনো—সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে সাহায্যের আশা পোষণ অবাস্তব হবে। এখন থেকে আমাদের মেনে নিতে হবে, সেরকম কোনো সাহায্য, তা প্রত্যক্ষ হোক কি পরোক্ষই হোক, সম্ভব নয়, কারণ তা পারমাণবিক পৃথিবীর শাস্ত্রবিরোধী। নিজেদের লড়াই নিজেদেরই করতে হবে আমাদের। একান্ত নিজেদের সামর্থ্যের ভিত্তিতে, সাহসের ভিত্তিতে, আদর্শবোধের ভিত্তিতে, বিবেচনার ভিত্তিতে। এমন নয় যে কথাটা আমাদের পুরোপুরি অজানা ছিল। আমাদের প্রজ্ঞায় এই বোধ বরাবরই জাগ্রত ছিল, বিপ্লব রপ্তানিও করা যায় না, আমদানিও করা যায় না, প্রতিটি দেশের সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের উপর সেই দেশের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা নির্ভরশীল। কিন্তু তা হ'লেও তো এতকাল ধ'রে পূর্বসূরী যাঁরা, যাঁরা নিজেদের সমাজব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটাতে সফল হয়েছেন, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিধারাকে মূর্ত রূপ দিয়েছেন, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সুপ্রোথিত করেছেন, তাঁদের কাছে আমরা প্রেরণার জন্য গেছি, উপদেশের জন্য গেছি, অনুশীলনের জন্য গেছি। যে-নব্যনীতির কথা শোনা যাচ্ছে, মনে হয় সে ধরনের সীমিত বিনিময়-প্রতিবিনিময়ের ঋতুরও অবসান ঘটবে এখন থেকে, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রবোধের নতুন পরিভাষা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হবে।

তা-ই যদি হয়, আমাদের যদি পরিপূর্ণ স্বাবলম্বী হ'তেই হয়, তা হ'লে চিন্তা ও

যুক্তির ক্ষেত্রেও তো সেই স্বাবলম্বনকে প্রশ্রয় দিতে হবে। আমাদের লড়াই, আমাদেরই লড়াই, আমাদের একার লড়াই, বাইরে থেকে কেউ ভরসা দিতে আসবেন না। এই লড়াই তাই আমাদের পরিচালনা করতে হবে নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, নিজেদের বিচার-বুদ্ধির সংস্থানে দাঁড়িয়ে। শ্রেণীসম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি-নন্দিত বিশ্ববীক্ষার ক্ষেত্রে, অগ্রাধিকার মীমাংসার ক্ষেত্রে, আমরা তো তা হ'লে মেনে নেবো আমাদের পরিবেশের ইশারা, আমাদের চেতনার ইঙ্গিত। আমাদের স্ব-নির্ভরতার অর্থ চিন্তার ক্ষেত্রেও স্ব-নির্ভরতা, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও তাই, অপরের বিচার অথবা অপরের স্বার্থবিস্তার সেই চিন্তা বা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে না।

আমাদের এতদিনের অভ্যস্ত অবলম্বনগুলি খ'সে পড়ছে। বহির্বিশ্বে নতুন ভাবনার ভিড়, যা আমাদের চিন্তাকে পীড়িত করে। এই পীড়াক্রান্ত অবস্থায়ই হয়তো আরো কিছু দিন কাটবে। তারপর আশা করা যায় স্বচ্ছতায়, সরলতায় ফিরে আসবো আমরা। আশাকে বাদ দিয়ে তো ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়।

## দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে

অযুত কোটি বিন্দু মিলিয়ে সিন্ধু। আন্দোলনও তো তাই। একটি বিশেষ আদর্শের প্রেরণায় কাতারে-কাতারে মানুষ জড়ো হন, এ-গ্রামে ও-গ্রামে এই শহরে ঐ শহরে, শহরের এই পাড়ায়-পাশের পাড়ায়-দূরের পাড়ায়, এই জেলায়-ঐ জেলায়-সব জেলায়। সংগঠনই শক্তি, বিন্দু থেকে সিন্ধু। পরস্পরের প্রতি অনুকম্পায়ী মানুষ, নানা বয়সের মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ-তরুণ-বৃদ্ধ-কিশোর-মধ্যবয়স্ক, তাঁরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসেছেন, অথচ আসলে একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসেছেন, কিংবা তাঁদের আলাদা-আলাদা অভিজ্ঞতাগুলি একটি স্থির সিদ্ধান্তে তাঁদের পৌঁছে দিয়েছে: আমরা সবাই ন্যায়ের প্রান্তরে পৌঁছুতে চাই, সত্যের প্রান্তরে, ঔচিত্যের প্রান্তরে। আমরা প্রত্যেকে লড়তে চাই অবিচার-শোষণ-অসাম্যের বিরুদ্ধে, যারা সমাজে থেকেও সমাজ-শত্রু, পরস্বাপহরণে নিযুক্ত, আমাদের যুদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে। আমরা আলাদা হয়ে যুদ্ধ করলে এই সংগ্রামে কোনোদিন জয়ী হ'তে পারবো না, অতএব আমাদের সংঘবদ্ধ হ'তে হবে, সংগঠনের শৃঙ্খলা মানতে হবে, আদর্শে স্থিত থেকে আদর্শের স্বার্থেই যূথবদ্ধতার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে।

লক্ষ-লক্ষ কর্মী, আদর্শের প্রেরণা যত ছড়িয়ে পড়ে, কর্মীসংখ্যা বাড়ে, মানুষের মনের প্রতিজ্ঞা সংগঠনের রূপ নেয়। সংগঠন যত বড়ো হয়, আন্দোলন যত ছড়ায়, সংগঠনকে সুশৃঙ্খলায় বাঁধার প্রয়োজনও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আদর্শের আনুগত্যের প্রয়োজনেই শৃঙ্খলা, তাই পরস্পরকে, পরস্পরের আদর্শানুরাগকে সম্মান জানানোর প্রতীক শৃঙ্খলাপরায়ণতা। এই শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেকে বিলীন ক'রে দেওয়ার আনন্দ পরিমাপের বাইরে। শৃঙ্খলার মধ্যে আছি, আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছি আমরা প্রত্যেকে, কারণ নিয়মের নিগড় ছাড়া সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি অসম্ভব, এবং সংগঠনই ইতিহাসের নিয়ামক; ইতিহাসকে আমাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে, আমাদের যূথবদ্ধতা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসছি আমরা।

এই গ্রামে-ঐ গ্রামে, এই পাড়ায়-ঐ পাড়ায়, এই শহরে-ঐ শহরে, সংগঠন বাড়ে, রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ মহত্তর পর্যায়ে পৌঁছয়। লক্ষ-লক্ষ কর্মী, সর্বত্র ছড়ানো-ছিটোনো, কেউ কাউকে চেনেন না, কোনোদিন এরা একেঅপরকে চোখে দেখবেন না পর্যন্ত। কচিৎ-কখনো যখন বড়ো জমায়েতের ডাক দেওয়া হবে, এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ পায়ে হেঁটে-ট্রেনে চেপে-নৌকো বেয়ে-বাসের ছাদে চ'ড়ে জড়ো হবেন মহানগরে, কয়েক ঘণ্টার জন্য মিছিলের সমারোহে রাজপথ কাঁপবে,

তাঁরা ময়দানে নিশান উঁচিয়ে নয় তো নিশান গুটিয়ে, দাঁড়িয়ে বা ব'সে, প্রিয় নেতাদের কথা শুনবেন, সভাশেষে সংঘবদ্ধ প্রতিজ্ঞার প্রতীক হিশেবে কাগজের মশাল জ্বেলে, ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য হ'লেও, আকাশের গোত্রান্তর ঘটাবেন, তার পর অনুরূপ শৃঙ্খলায় পায়ে হেঁটে অথবা ট্রেনে চেপে কিংবা নৌকো ক'রে অথবা ট্রাকে-বাসে ঝুলে ফিরে যাবেন নিজেদের গ্রামে-পাড়ায়-শহরে। ঐটুকু অভিজ্ঞতাই মাত্র তাঁদের পারস্পরিক পরিচয়ের অভিজ্ঞান বহন করবে। তা-ও সকলের না, যাঁরা মহানগরের জমায়েতে জড়ো হ'তে এসেছিলেন, মাত্র তাঁদের কয়েকজনের।

কিছু যায় আসে না তাতে। বিন্দুতে সিন্ধু, বিন্দুগুলি পরস্পর থেকে অপরিচয়ের আড়ালে থেকে যায়, কিন্তু সমুদ্রসম্ভাবনা তাতে আদৌ ব্যাহত হয় না। আদর্শে-জড়ো-হওয়া মানুষগুলি, ছড়ানো-ছিটোনো দূর-দূর গ্রাম-শহর-পাড়ায়, পরস্পরকে চিনবেন না-জানবেন না কোনো দিন, কিন্তু তবু তাঁরা সংহত-সম্মিলিত এক অক্ষৌহিণী বাহিনী। আদর্শের বেলাভূমিতে তাঁরা জড়ো হয়েছেন, সুতরাং এই লক্ষ-লক্ষ মানুষগুলি যতই ছড়ানো-ছিটোনো হোন না কেন, একই সঙ্গে আছেন, তাঁদের আপাত-অপরিচয় ছাপিয়ে তাঁদের আদর্শের অভিন্নতা।

খবরকাগজে ছাপা হয় না অনেক নাম, হাজার-হাজার নাম। এই নামের মানুষগুলি আদর্শে তদ্‌গত, আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিয়েছেন। পাড়ায়-পাড়ায় তাঁরা আন্দোলনের সংগঠন অটুট রাখেন, পত্রিকা-পুস্তিকা বিলি করেন, ঘরোয়া সভার বিতর্ক-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন, স্বেচ্ছা-সেবকদের শিক্ষাশিবিরে কর্তব্যাদি বুঝিয়ে বলেন, পড়শীদের অভাব-অভিযোগ কান পেতে শোনেন, যথাসাধ্য প্রতিবিধানের প্রয়াস করেন, জ্যেষ্ঠদের নির্দেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেন, কনিষ্ঠদের প্রতিনিয়ত উৎসাহদান করেন। এই মানুষগুলিকে কেন্দ্র ক'রেই পাড়ায়-পাড়ায় আন্দোলন ব্যাপ্তি পেয়েছে, সংগঠন ছড়িয়েছে। খবরকাগজে ছাপা হয় না, হবে না এই সব লক্ষ-লক্ষ কর্মীদের নাম, কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই তাতে। একটি নাম থেকে আরেকটি নাম অবশ্যই আলাদা, কিন্তু আলাদাও নয়। কারণ, সব কথার সার কথা যেটা, প্রত্যেকটি নামই একই আদর্শে উৎসর্গীকৃত। লক্ষ-লক্ষ স্বাক্ষরহীন নামগুলি জড়ো ক'রেই আন্দোলনের মহাসমুদ্র। এই নামগুলিই সংগঠন, এই নামগুলিই আন্দোলন; আদর্শের সংগ্রাম বিজয়ী বীরের মতো অপ্রতিহত বেগবান, সেই বেগের কেন্দ্রশক্তি এই নামহীন নামের মিছিল।

ইতিহাস এগোয়, কখনো দ্রুত, কখনো ঢিমে তালে। আন্দোলনে নতুন চিন্তার ছায়া পড়ে, পরিস্থিতি পাল্‌টায়, সুতরাং সংগ্রামের পদ্ধতি-প্রকরণেরও পরিশোধন-পরিমার্জনের মাঝে-মাঝে প্রয়োজন দেখা দেয়। গ্রামে-গঞ্জে-পাড়ায় যাঁরা ব্যূহ পরিচালনার হাল ধ'রে আছেন, তাঁরা একই সঙ্গে প্রহরী ও পথপ্রদর্শক, পাড়ার-গঞ্জের-গ্রামের আকূতি-প্রার্থনা-আবেদন-প্রশ্ন ইত্যাদি পর্যায়ে-পর্যায়ে স্তরে

স্তরে যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে থাকেন, আবার আন্দোলনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে কোনো অনুরোধ বা সিদ্ধান্ত পৌঁছুলে নিজ-নিজ অঞ্চলে তার প্রচারের দায়িত্বও তাঁরাই তুলে নেন। তাঁরা নিজেরা বোঝেন, অন্যদের বোঝান, অন্যদের সংশয়ের জবাব দেন। আন্দোলনে কখনো-কখনো উজ্জ্বল সফলতা, কখনো কিছু পিছিয়ে-পড়া, কখনো রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন, কখনো মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়। কিন্তু ইতিহাস এগোয়, আন্দোলন এগোয়, সংগঠন আরো পরিণত হয়, যে-নামগুলি কোনো দিন ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে না, সেই নামের মানুষগুলি নিঃশব্দে, আদর্শের প্রতি অবিচল, বছরের পর বছর ধ'রে স্ব-স্ব কর্তব্য পালন ক'রে চলেন।

কিন্তু ইতিহাস যদিও অপ্রতিরোধ্য, মাঝে-মাঝে জীবনে মৃত্যুর ছায়া পড়ে। পাড়ার বা গঞ্জের কোনো প্রিয় কর্মী প্রয়াত হন। সংগঠন মানে তো ভালোবাসার সংসার, স্নেহের-আদর্শের নিগড়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। প্রিয় কর্মী যখন রোগাক্রান্ত হন, সহকর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রত্যেকের সাধ্যমতো, চিকিৎসার আয়োজন করেন, শুশ্রূষার ব্যবস্থা, প্রিয় কর্মীর সংসারনির্বাহের দিকেও দৃষ্টিদান করা হয়। কিন্তু প্রিয়জনকে বাঁচানো যায় না, আন্দোলনের স্বার্থে তিরিশ-চল্লিশ বছর ধ'রে, নিঃশব্দ এই প্রিয় কর্মী নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন, শরীর বা স্বাস্থ্যের কথা ভাবেননি, নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি আলাদা নজর দেওয়ার মতো সংস্থান বা সামর্থ্যই হয়তো তাঁর ছিল না অতীতে সে-সব বছরে, এখন একটু দেরি হয়ে গেছে, সহযোদ্ধাকে বিদায় দিতেই হয়। তিনি জড়িয়ে ছিলেন সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে, আদর্শে-স্বপ্নে, আন্দোলন-সংগঠনের স্থানীয় ইতিহাস যাকে বাদ দিয়ে ভাবা অসম্ভব, তিনি নিষ্ক্রমণ করেন। এই প্রয়াণের কথা খবরকাগজে এসে পৌঁছয় না, অন্য পল্লীতে বা অন্য গঞ্জেও আন্দোলনের শরিক যে-অগণিত মানুষগুলি আছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরাও জানতে পারেন না একজন সহ-সৈনিক বিদায় নিয়েছেন এই পল্লীতে বা গঞ্জে, তাই সীমানাবদ্ধ শোক।

কারো-কারো মনে অভিমানের উদ্রেক হওয়া হয়তো স্বাভাবিক, ইতিহাস কেন এত ভারসাম্যহীন হবে, তিল-তিল ক'রে যাঁরা সংগঠন গ'ড়ে তুললেন পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে, যাঁদের ত্যাগের-তিতিক্ষার তুলনা নেই, কেন তাঁদের স্মৃতি এরকম ধুয়ে-মুছে যাবে, ইতিহাসের কেন এই নিষ্করুণ বিচার, বিন্দুগুলি তাদের অপরিচয়ের আবরণের আড়ালে কেন বরাবরই থেকে যাবে?

এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে নেই, তা নিহিত জীবনচর্চার সারাৎসারে। আমার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে আলাদা ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বিরাজ করবে, এই চিন্তায় অতি সংকীর্ণমনা এক অহমিকার ভূমিকা অপ্রচ্ছন্ন। অন্যদিকে, যে-কর্মী ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অভিলাষের বৃত্ত অতিক্রম ক'রে জনতার দিকে মুখ ঘুরিয়েছেন, আত্মোৎসর্গের গহনে আনন্দ আবিষ্কার করেছেন, আত্মপরিচয় লোপ ক'রে দিয়ে মিছিলের ভিড়ে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁর তো কোনো-দিনই তৃপ্তিতে খামতি পড়বার কথা

নয়। নামহীন-গোত্রহীন-পঙ্‌ক্তিহীন সংগ্রামী মানুষের শোভাযাত্রায় আনন্দ তাঁর নিজস্ব আনন্দ, ইতিহাসের চরিতার্থতাই তাঁর ব্যক্তিগত চরিতার্থতা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কাতারে-কাতারে জড়ো হওয়া কর্মীদের নাম লিপিবদ্ধ হবে না, কিন্তু ইতিহাস প্রতিটি ক্রান্তিলগ্ন পেরিয়ে যে-নতুন আদল পাচ্ছে, এই সংগ্রামারক্ত মানুষগুলিই সেই নতুন ইতিহাস লিখছে, তার চেয়ে বড়ো গৌরবের পরিচয় আর কী হ'তে পারে?

সম্মান-কীর্তির শীর্ষদেশে বিহার করা সত্ত্বেও এমনকি রবীন্দ্রনাথও জীবনের প্রান্তমুহূর্তে প্রায় হুবহু এক উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন : 'মোর নাম এই ব'লে খ্যাত হোক : / আমি তোমাদেরই লোক। / আর-কিছু নয়, / এই হোক শেষ পরিচয়।' সম্মানের শীর্ষদেশে পৌঁছেও মনে হয় একটি অপরিপূর্ণতাবোধ থেকে যায়, আসল মানুষগুলির কাছাকাছি কি আসতে পেরেছি: তাঁদের ভাষা-কান্না-আনন্দ-অভিমানের সংজ্ঞা কি বুঝতে পেরেছি, খবরকাগজে প্রতিদিন নাম ছাপা হয় আমার, ইতিহাসের বইতে উল্লেখ থাকবে আমার কীর্তি-কাহিনীর, কিন্তু সাধারণ মানুষকে কি বুঝতে পেরেছি, বোঝাতে পেরেছি? এই দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে কিন্তু লক্ষ-লক্ষ আদর্শযুক্ত কর্মীবাহিনী মুক্ত, জনতার সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছেন তাঁরা, যখন মৃত্যুর ঘণ্টা বাজবে, ইতিহাসের পাতায় নাম অক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে না তাঁদের, তাঁদের তৃপ্তির হেতু অন্য, ইতিহাসকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তাঁরা, ইতিহাস জনতার যে-অখণ্ড অধিকারের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে, সেই অধিকারকে দুই কদম আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন হাতে ধ'রে, জীবনধারণের, জীবনযাপনের এর চেয়ে বড়ো চরিতার্থতা আর কী হ'তে পারে।

জীবনের নিয়ম, পাড়ায়-গঞ্জে-শহরে বহুদিন ধ'রে একসঙ্গে-সংগ্রামে-ব্রতী সহযোদ্ধা গত হবেন, খবরকাগজে ছাপা হবে না সেই খবর, কিংবা হ'লেও অতি ছোটো ক'রে ভিতরের পৃষ্ঠায় নিচের দিকে, কিন্তু সীমাবদ্ধ শোকের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের সারমর্ম উজ্জ্বল ফুটে উঠবে, সনম্র উচ্চারণে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাওয়া হবে, আমরা নতুন ক'রে অনুভব করবো, আমাদের সহযোদ্ধা প্রয়াত, কিন্তু তা হ'লেও তিনি আছেন, আমাদের মধ্যে আছেন, আমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে, আমাদের আদর্শের হৃৎবিন্দুতে। তারায়-তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে, সেই অগ্নির শরীরে আমাদের প্রয়াত সহযোদ্ধার উপস্থিতির স্বাক্ষর।